বিরস রসনা

ইবনে সাজ্জাদ

বিরস রচনা

প্রথম ভাগ

ইবনে সাজ্জাদ

BCBS

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

www.pathagar.com

বিরস রচনা

প্রথম ভাগ

ইবনে সাজ্জাদ

❖ প্রকাশক ❖

মুহাম্মদ নূর উল্লাহ

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোনঃ ৬৩৭৫২৩

❖ ঢাকা অফিস ❖

১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

❖ বিক্রয় কেন্দ্র ❖

১৫০/১৫২ নিউ মার্কেট, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৭৯, জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স (১ম তলা), চট্টগ্রাম।

❖ মুদ্রণ বিভাগ ❖

৯৪৬, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৩৪৬৯১৫

❖ প্রকাশ কাল ❖

এপ্রিল, ১৯৯৮

❖ কভার ডিজাইন ❖

দ্বীপক দত্ত

❖ মুদ্রণেঃ ❖

নিঝুম এ্যাড

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬২১৭৭৬

মূল্যঃ একশত টাকা

BIRASH RACHANA by IBNE SAZZAD Published by
Md. Nurullah, Director (Publications) B.C.B.S. Ltd.
Chittagong, Dhaka, Bangladesh.

Price: 100.00

$ 3.00

ISBN 984-493-028-6

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও যে চারটি
বিকল্প বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অন্ধত্ব
উন্মোচন, সেই-----
হুজুর মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
আল্লামা আবুল হাশিম
জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও
আবুল মনসুর আহমদ কে

www.pathagar.com

প্রকাশকের নিবন্ধ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

খুশী হওয়া, খুশী করা দুটি আলাদা কথা। ছোট হলেও ব্যাপারটা গভীর তাৎপর্য রাখে। কথার ফুলঝুরিতে পূজারীরা মুগ্ধ হবেন না জানি, কিন্তু রসিকরা, বোদ্ধারা হবেন। ক্ষুদ্র ফুলের পশ্চাতে থাকে যেমন বিরাট বৃক্ষের অবদান, এই খুশী হওয়া/খুশী করাকে সার্থক করে তোলার জন্যও দরকার তেমনি বিপুল জীবনায়োজনের। মানবিক শক্তির পূর্ণ উদঘাটন ও তার সার্থক নিয়ন্ত্রণ না হলে, মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যায় না বলে আমার ধারণা। মানবজীবনের সুন্দরতম কমল হাসি, সেই হাসিরই চাষ আমাদের করা উচিত। মানবতাকে বিকশিত করার জন্য বিদ্বেষকে তাই দূরীভূত করা প্রয়োজন। অহমিকাকেও। আমার মনে হয় এ দুটির মত শত্রু হাসির আর নেই। হাসির কথা বলতে গিয়ে মরহুম মোতাহার হোসেন চৌধুরীও উপরোক্ত মতবাদ পেশ করেছিলেন।

এই পুস্তকটি যদিও বিরস রচনার সঙ্কলন–আসলে রস রচনাই। বুদ্ধি প্রদীপ্তি মিশিয়ে সমাজ সমস্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৌতুক পরিবেশনা–আমার আশৈশব আকর্ষণ। আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক তাই সৈয়দ মুজতবা আলী। ১৯৫০ সনে মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তাঁর সাথে আমার পরিচয় 'দেশে বিদেশে'র মাধ্যমে। সেই থেকে তাঁর প্রতিটি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে স্থান পেয়েছে। এ ধরনের রচনা আমায় নিয়ত আকর্ষণ করে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাই আমি পড়তাম দৈনিক বাংলায় খোন্দকার আলী আশরাফের "দুর্জ্জন উবাচ" কলাম।

www.pathagar.com

গ্রন্থকার আমার বাল্যবন্ধু। আত্ম পরিচয় প্রচ্ছন্ন রেখে কলমী শ্রম দিয়ে তাঁর বিরস রচনা। দেশী বিদেশী উপাখ্যান, হাসির গল্প, প্রবাদ-প্রবচন, চিরায়ত বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক সম-সাময়িক ঘটনাবলী ও সংবাদের কখনো করেছেন বিশ্লেষণ, কখনো কেটেছেন টিপ্পনী। শঠামী, বুজরুকী ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি মিছরীর ছুরি চালিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। কখনো গুরু গম্ভীর, কখনো চটুল হাল্কা চালে, শব্দের সাথে শব্দের নাচন ধরিয়ে লেখক বক্রোক্তির এক চমৎকার আবহ সৃষ্টি করেছেন। দলীয় বা বিশেষ কোন মতবাদের মঞ্চে আরোহন না করে 'যুক্তিমঞ্চে' দাঁড়িয়ে মিথ্যাকে মিথ্যা বলার প্রয়াস পেয়েছেন। বিদগ্ধ পাঠককুলকে বহু তত্ত্ব ও তথ্যের নির্যাস প্রদান করতে চেষ্টা করেছেন। রচনাগুলি সমকালীন ঘটনা নিয়ে কটাক্ষ করে লেখা হলেও এগুলি মহাকালের দলিল হয়ে থাকবে বলে আমার ধারণা।

আমাদের সমাজে ঘুষ, দুর্নীতি, ভণ্ডামি ঋতুচক্রের মত বার বার ঘুরে এসে সুশীল সমাজ গঠনে বাধা দেয়। লেখক সে অনুভূতির চেতনায় তাঁর বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন সময়ে ঘুরে ঘুরে তাই পুনরুক্তি করেছেন এ সবের; কলমের খোঁচা দিয়েছেন প্রতারিত প্রবঞ্চিত মানুষের পক্ষ হয়ে। মনের ভিতর কান্নার অশ্রুকে চেপে রেখে লেখক হাসতে ও হাসাতে চেয়েছেন। যে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা তিনি করেছেন, সে সম্পর্কে বলতে গেলে প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় বলতে হয়, "সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি।" এই হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের আক্ষেপ উক্তি।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রকাশনা ও শিক্ষা বিস্তার মানসে নূতন নূতন প্রকল্পে হাত দিতে যাচ্ছে। এ রচনা সংকলন এর প্রকাশনা তারই একটা অংশ। পাঠককুলে এই গ্রন্থ সমাদৃত হবে বলে আমার ধারণা।

মুনাওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

এপ্রিল-'৯৮

www.pathagar.com

সাতকাহন

অধম অসময়ে অতিরিক্ত প্রাণী হিসাবে ধরাধামে আগমন হেতু দুর্জন, দুর্ভোগ দুর্যোগের ঘেরাটোপে পতিত হইতে বাধ্য হইয়াছি। অধমের অনিদ্রা রোগ না থাকিলেও নিন্দা রোগ রহিয়াছে। পরচর্চা ও পরনিন্দার মতো সহজলভ্য পদার্থ ইহজীবনে খুঁজিয়া পাইলাম না। 'দুশ্চরিত্র সময়ে' ইতিহাস ভাঙ্গা ঢোলে, দর্শন ভেংচানিতে, নীতিকথা ভাঁড়ামিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে যেন। আমাদের খাদ্যে-বাদ্যে-আসনে-ভূষণে-সম্ভাষণে-ব্যঞ্জনে-রন্ধনে-নয়নে-রঞ্জনে নতুনত্ব আসিয়াছে। ..... কিন্তু মেধা ও মননে, কর্মে ও আচরণে ধরিয়াছে পচন। উদার অর্থনীতির নামে উদর অর্থনীতি, মুক্তির পরিবর্তে কু-যুক্তি, সংস্কৃতির পরিবর্তে বাঁদরামিপূর্ণ ইতরামি যোগ হইয়াছে। দয়া, মায়া, প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, শ্রেয়বোধ, শ্রদ্ধাবোধ,

www.pathagar.com

সততা, মানবতা, পরার্থপরতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি শব্দাবলী আজ জীবন হইতে উবিয়া গিয়া অভিধানে মমি হইয়া রহিয়াছে। লাভ ও লোভ, শঠতা ও প্রতারণা, ঘুষ-দুর্নীতি, প্রবঞ্চনা-হঠকারিতা আমাদের নিত্য কর্ম হইয়া উঠিয়াছে। এই মজ্জাগত প্রবণতাকে রুখিয়া দাঁড়াইবার শক্তি এই অধমের নাই। সত্য ও সুন্দর পশুবিষ্ঠার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ভুতুড়ে সমাজের জন্য রহিয়াছে হাতুড়ে বুদ্ধিজীবী।

বাংলা সাহিত্যে স্যাটায়ারের ইতিহাস দীর্ঘদিনের নহে। অতীতে আমাদের সাহিত্যে স্যাটায়ারের পরিবর্তে অশ্লীলতা, নোংরামি প্রধান ছিল। সম্প্রতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'ব্যঙ্গ' একটি পাঠক উদ্দীপক বিষয় হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছে। আলোচ্য রচনাসমূহকে প্রকৃত স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ রচনা হিসাবে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মনে করি না। ইহাকে ঠ্যাঙ্গানি কথন হিসাবে আখ্যায়িত করা যাইতে পারে। পাঠক অন্য নাম আখ্যা দিলেও হরষিত হইব। আমাদের দেশে অন্ন-আনন্দ-নিদান-নিবাসহারা-নিরক্ষর মানুষের শরীরে নকশিকাঁথা না থাকিলেও নকশি কথা ও নকশি গল্প রহিয়াছে। এই মানুষদের পুষ্পিত সৌরভ আমার রচনায় খুশবু ছড়াইয়া দিয়াছে। চিরায়ত বিশ্বসাহিত্য ও ভুবনজয়ী সাহিত্যিকদের অমর বচন নানাভাবে চয়নের কসরত করিয়াছি।

একদা আমাদের দেশে যে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হইত উহাতে বাহারি রৌশন ছুটিত না। কিন্তু তাহা শ্রবণে মন রৌশনিতে ভরিয়া যাইত। হুজুর মোখতারবৃন্দ মসনবী শরীফ, গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁর গল্প শুনাইয়া, ফার্সি শ্লোক গাহিয়া উপমার উপর উপমা সাজাইয়া শ্রোতাদের মুগ্ধ করিতেন। এই অধম অনেক ক্ষেত্রে সেই হুজুরদের চিত্তাকর্ষক বয়ানের অনুকরণ করিয়াছে মুগ্ধ হৃদয়ে।

চলমান সময়ের প্রেক্ষিতে এ রচনাসমূহ রচিত হইয়াছে। রচিত নিবন্ধ সমূহে পাণ্ডিত্য নাই আদতে। ইহা অধমের অক্ষম প্রয়াস। ব্যঙ্গ রচনাগুরু আবুল মনসুর আহমদ যে সাহস নিয়া লিখিতেন সেই সাহস এই অধমের নাই। 'অমুকের চামড়া তুলে নেব আমরা' এই ভয়ে অধম বিলক্ষণ শংকিত। কোথাও বেফাঁস হইয়া পড়িলে শরীরের পৈতৃক চামড়া তুলিয়া না নিবার জন্য করজোড়ে মিনতি করিতেছি।

এ রচনায় 'রচনা শৈলীর' পরিবর্তে শেল ও শৈল রহিয়াছে। পুনকথন, অতিকথন সিটি কর্পোরেশনের মশার মতো দ্রুত আসিয়া ত্যক্ত-বিরক্ত ঘটাইতে দ্বিধাবোধ করিবে না। অধম চাপাবাজিতে আর নিন্দা ভাজিয়া কাসুন্দি ঘাটিতে

www.pathagar.com

পারঙ্গম হইলেও কলমবাজিতে পুরাদস্তুর ব-কলম। দৈনিক আজাদীর পরিচালনা সম্পাদক চাটগাঁর লেখক তৈরির সুজনসখা মুহতরম এম. এ. মালেক তারই পত্রিকায় এই রচনা লেখিবার প্রেরণাদাতা। ১৯৯১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে দৈনিক আজাদীতে 'বিরস রচনা' নামে অধমের কলাম লেখা শুরু। মান্যবর সম্পাদক খালেদ সাহেব ও কবি অরুণ দাশগুপ্তের প্রাজ্ঞ হাতের স্পর্শে রচনাগুলো পাঠকের দোরগোড়ায় হাজির হইবার মওকা পাইয়াছে। বহু রচনার জঞ্জাল স্তূপ হইতে কিছু রচনার এই গ্রন্থবদ্ধ প্রয়াস এইখানে। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ ও পরিচালক মোহাম্মদ নূর উল্লাহ এই রচনা সমূহকে সোসাইটির বিশাল প্রকাশনাভাণ্ডারে স্থান দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন; তাহাদের প্রাজ্ঞ উপদেশ এ প্রকাশনাকে খামিয়া করিয়া তুলিয়াছে। এ গ্রন্থ প্রকাশের পেছনে পুত্রতুল্য তরুণ সাংবাদিক শাহ নেওয়াজ রিটনের অক্লান্ত শ্রম আমাকে প্রতিমুহূর্তে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। প্রাজ্ঞ কলামিস্ট ফজলুল হক, ছড়াকার অধ্যাপক নূ. ক. ম. আকবর হোসেন সহ আরো যারা 'বিরস রচনা' লেখায় রস ও রসদ যুগাইয়াছেন তাহাদের সবাইকে মুঠো মুঠো কৃতজ্ঞতা। এছাড়া মাসিক আল মুবীনের যুগ্ম সম্পাদক স্নেহের আ. ব. ম. খোরশিদ আলম খান, অনুপম ও আমার বংশদ্বয় আশরাফ হোসেন খান সুজন, মোবারক হোসেন খান রুমন পাণ্ডুলিপি সংকলনে আমাকে যে সহায়তা করিয়াছে তাহা ভুলিবার নহে।

অধম বাঙ্গালি ও কাঙ্গালি ভীতু মগজপ্রসূত লেখায় ভুল বিচ্যুতি থাকিতেই পারে। এক্ষেত্রে 'ক্ষমাই মহত্বের লক্ষণ' এই সুমিষ্ট প্রবাদ আওড়াইতে চাহি নির্ভয়ে।

পাঠকের ভাল লাগিবার মধ্যেই আমার চরম তৃপ্তি ও পরম প্রাপ্তি। সুহৃদ পাঠকদের সুতীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া জানিবার আগ্রহ রহিল।

ইতি

চির বিনীত অধম খাকসার

ইবনে সাজ্জাদ

বৈশাখ, ১৪০৫ বাংলা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- বিরস রচনা ১৩
- জয় নারী জয় শাড়ী ১৬
- চামচাগিরির স্কুল চাই ২০
- সর্পরোগ ২৩
- দালাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাই ২৭
- ভাতের চাইতে জাত বড় ৩১
- যত দোষ নন্দ ঘোষ ৩৪
- অসিজীবী বনাম মসিজীবী ৩৭
- তুমি আমি না আমি তুমি ৪০
- সত্যবাদী মিথ্যুক ৪৩
- শেয়ার কী পেয়ার ৪৬
- তোফায়েল, গোফায়েল ও শালা সমাচার ৫২
- দৈত্য ও কুকুরের লেজ ৫৬
- মস্তান রপ্তানি ৬০
- হতাশা রোগের ঔষধ ৬৩
- টুপি ও সংবিধান ৬৭
- গরিবের খেতাব ৭১
- দুর্ভিক্ষের ব্যাসবাক্য ৭৫
- কোনটা বাংলা ৮০
- বিশুদ্ধ ভেজাল ও খাঁটি নকল ৮৫
- নন্দিত ও নিন্দিত ৮৯
- মিথ্যার ঠিকানা ৯৩
- বিলাতি গরুর জন্য শোক ৯৬
- ভুল ও ভূতের উত্তরাধিকার ১০০
- অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী ১০৪

www.pathagar.com

❒ এখন কবিরা মনে নয়, ভবনে ১০৮
❒ জল-পানি-ঝোল-সুরুয়া ১১২
❒ টেণ্ডলের ঈদ উদ্‌যাপন ১১৬
❒ মেঘ কেন সূর্য ঢাকে ১১৯
❒ লাথি সংঘ ১২২
❒ মেধা গাধার রুহে অনুপ্রবেশ ১২৭
❒ অমরত্বের দাওয়াই ১৩১
❒ চর্চা নহে : অনধিকার চর্চা চাই ১৩৪
❒ গরিবের তকমা ১৩৭
❒ ফাঁকিবাজী ধোঁকাবাজী = বুদ্ধিজীবী ১৪২
❒ থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে ১৪৬
❒ ভূতের মুখে রাম নাম ১৫০
❒ ঘুমে ঘুষ খাইয়া ফেলিয়াছে ১৫৪
❒ তুমি বুঝলা কৈ ১৫৮
❒ যে পড়ে সে মরে ১৬২
❒ আই সুগার ইউ ১৬৫
❒ ব্যাকরণ ও ব্রহ্ম দৈত্য ১৬৮
❒ তরুণেরা কি স্বপ্ন দেখে? ১৭৩
❒ দেবদাসের নসিহত ১৭৭
❒ প্রলাপ, সংলাপ ও ছাগলামী ১৮১
❒ গরীবজাদার সাম্রাজ্য ১৮৬
❒ ছাগল ও মস্তান ১৯০
❒ জিন্নাহ্‌, গান্ধী বনাম সালমানশাহ্‌ ১৯৪
❒ চোরের মার বড় গলা ১৯৭
❒ শেষের সংলাপ ২০০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিরস রচনা

একদা এক গৃহস্থের বাটিতে এক ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিক্ষুক ভিক্ষা দানের প্রত্যাশায় বিনয়ের সহিত আবেদন করিতে লাগিল। ওই বাড়ীর বউ দরজার সম্মুখে আসিয়া কহিল, মাফ কর।

ভিক্ষুক প্রস্থান করিল।

এই দৃশ্য দর্শন করিয়া বাড়ীর আসল কত্রী অর্থাৎ বউয়ের শাশুড়ী রাগান্বিত হইলেন। শাশুড়ী বউকে কহিলেন,

ঃ ওহে বউ, তুমি ভিখারিকে বিতাড়িত করিলা কেন? শীঘ্রই উক্ত ভিখারীকে ডাকিয়া লইয়া আইস।

বউ বিতাড়িত ভিখারীকে ডাকিয়া আনিল। ভিখারী দরজার সম্মুখে ভিক্ষার আশায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। শাশুড়ী পান-গুয়া চর্বণ করিতে করিতে দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিমায় ভিখারীকে শাশুড়ী কহিল,

ঃ যাও বাপু, মাফ কর।

বউ শাশুড়ীর এবম্বিদ আচরণে নির্বাক হইয়া পড়িল। সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া এহেন রহস্যজনক আচরণের হেতু জানিতে চাহিলে শাশুড়ী কহিল,

ঃ আমি হইলাম এই সংসারের কত্রী। তুমি হইলা পরের ঘরের কন্যা। আমি বাঁচিয়া থাকিতে এই সংসারের যে কোন প্রকার নির্দেশ/আদেশ আমিই প্রদান করিব। ভিখারীকে ভিক্ষা দিব কি দিব না ইহার এক্তেয়ার আমার, তোমার নহে।

www.pathagar.com

শাশুড়ী বহু প্রকারের হইয়া থাকে। দাদী শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী, খালা শাশুড়ী, মামী শাশুড়ী, ফুফি শাশুড়ী। এই শাশুড়ীদের বিপরীত লিঙ্গে শ্বশুর হইয়া থাকেন।

বাংলা ভাষায় শ্বশুর শব্দের মধ্যে 'শ'র সহিত 'ব' থাকে শ্বশুর বানানে। শাশুড়ী বানানে 'শ'র সহিত 'র' নাই, এর পরিবর্তে 'ড়' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বশুর আর শাশুড়ী বানানের মধ্যে 'দীর্ঘ'কার স্ত্রী লিঙ্গের প্রতীক কিন্তু এর মধ্যে তালব্য শ'র 'ব' এবং 'র' এর পরিবর্তে 'ড়' কেন আসিল ইহার কোন বৈয়াকরণিক সমাধান খুঁজিয়া পাই নাই।

শাশুড়ীর দাপট সর্ব ক্ষেত্রে নহে। শাশুড়ী যদি পুত্রবধূর দিকে হয় তবে দাপট ষোল আনা। অন্য প্রকারের শাশুড়ী হইলে সেই শাশুড়ীগণ চুপসিয়া যান।

ছেলের 'বউ'র শাশুড়ী বউকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করে আর মেয়ের জামাইকে শাশুড়ীরা 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করে। আমাদের দেশে একটি ধুয়া আছে, শমন দমন রাবণ আর রাবণ দমন রাম / শ্বশুর দমন শাশুড়ী আর শাশুড়ী দমন হাম।

যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে এবং পেশাগত কারণে 'স্বামী স্ত্রীর' আলাদা আলাদা অবস্থানের জন্য শাশুড়ীদের 'প্রাচীন' কর্তৃত্বে আঘাত আসিয়াছে। বর্তমানের 'ছেলে' মাঝে মধ্যে ফিরিয়া পাইবার আশায় শাশুড়ীগণ পুত্রবধূদের তোয়াজ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু শাশুড়ীদের কর্তৃত্ব সংস্কৃতি গৃহের চৌহদ্দি অতিক্রম করিয়া বর্তমানে ইহা অন্যত্র গমন করিয়াছে।

শাশুড়ীদের পূর্বেকার আচরণকে 'শাশুড়ীতন্ত্র' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

পরিবার নামক কারাগারে এই শাশুড়ীতন্ত্রের আঘাত অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হইলেও আমাদের দেশে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এ 'শাশুড়ীতন্ত্র' অন্যভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। বিভিন্ন অফিস আদালতে এই শাশুড়ীতন্ত্র অপর ছদ্মনামে বিরাজ করিতেছে। বউ তথা অধস্তনের কোন স্থান নাই। যে কোন ক্ষেত্রে প্রধান হইলেন শাশুড়ী ও নীচের জন হইল বউ।

পূর্বে বউগণ যেমন নাকের পানি চোখের পানি এক করিয়া শাশুড়ীদের সকল প্রকার নির্যাতন অপমান ভোগ করিয়া থাকিত, চাকুরী করিতে গেলে আপনাকেও তেমনি বউ হইয়া সকল প্রকার নির্যাতন অপমান ভোগ করিতে হইবে। ইহার কোন বিকল্প নাই।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে ষোল আনা সত্য বলিয়া কোন কিছু নাই। এই 'শাশুড়ীতন্ত্র'ও সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে বিরাজমান নহে। যে সকল 'দপ্তরে' ঘুষের খনি রহিয়াছে সে সকল দপ্তরে বউ শাশুড়ী সাম্যভাব বজায় রহিয়াছে।

শাশুড়ীগণ যতই জাঁদরেল হউক না কেন বউয়ের বাপের বাড়ী হইতে পালাপার্বণে অঢেল উপহার আসিতে থাকিলে তখন শাশুড়ীগণ মুচকি মুচকি হাসিয়া বেহাই এর বাড়ীর তারিফ করিতে থাকে।

ঘুষের খনির 'মুনি' যদি বখরা ঠিক আসিতে দেখে তখন তিনি শাশুড়ীতন্ত্রকে চাপিয়া রাখিয়া 'সাম্যবাদ' প্রদর্শন করিতে দ্বিধাবোধ করেন না।

এক কবিয়াল দশ জন লোক লইয়া কবিগান করিত। কবিগানের আসরে যে টাকা পাওয়া যাইত কবিয়াল একাই দশ আনা ভাগ করিয়া নিত আর দশজন পাইত মাত্র ছয় আনা ভাগ। কবিয়ালের এই লোকলস্কর কবির উপর রুষ্ট ছিল। কবিকে প্যাঁচে ফেলিবার জন্য তাহারা সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

একদা রামায়ণের পালা গাইতে যাইয়া লংকায় কে আগুন দিয়াছিল কবিয়াল উহা ভুলিয়া গেল।

কবি গানের সুরে কহিল,

লঙ্কায় আগুন দিল .....

পর পর কয়েকবার উচ্চারণ করিয়াও কবি 'হনুমানের' নাম স্মরণ করিতে পারিল না, অগত্যা কহিল,

লংকায় আগুন দিল তার নাম কি?

দোহারীগণ বহুদিন পর সুযোগ পাইল। কবিকে জব্দ করিয়া দাবী আদায়ের জন্য কহিল,

দশ আনা ছয় আনা ভাগ আমরা জানি কি?

কবি অবস্থা বেগতিক দেখিয়া কহিল,

এইবার হইবে ভাগ সমানে সমান।

দোহারীগণঃ লংকায় আগুন দিল বীর হনুমান।

'ঘুষ' চুরি স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্রে বউ শাশুড়ী নাই। তাহাদের ভাগ হইল সমানে সমান।

□ ৯ই ফেব্রুয়ারী '৯৬

www.pathagar.com

জয় নারী জয় শাড়ী

কিশোর উত্তীর্ণ এক নব্য যুবক একদা এক দৈনিক পত্রিকা অফিসে প্রবেশ করিল। যুবক পত্রিকার বাণিজ্যিক কর্মাধ্যক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

বাণিজ্যিক কর্মাধ্যক্ষঃ হে নব্য যুবক, এই কার্যালয়ে আপনার আগমনের হেতু কী। আমি কি আপনাকে কোন সেবা দানে বাধিত হইব?

যুবকঃ আমি একটি বিজ্ঞাপন আনিয়াছি, বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিলে চির বাধিত হইব।

বাণিজ্যিক কর্মাধ্যক্ষঃ জনগণের বিশেষ করিয়া তরুণদের সেবার জন্যই আমরা নিয়োজিত রহিয়াছি। আপনি কি বিজ্ঞাপন লিখিয়া আনিয়াছেন?

যুবকঃ হাঁ, আনিয়াছি। এই দেখুন। ইহা বলিয়া যুবক বিজ্ঞাপনটি বাণিজ্যিক কর্মাধ্যক্ষের হস্তে প্রদান করিল। বাণিজ্যিক কর্মাধ্যক্ষ বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিতে লাগিলেন।

"আমি আবদুল হক, পীং নুরুল হক, গ্রাম নীলক্ষী, পোঃ ফুলগাজী, জিলা ফেনী বাংলাদেশ, এতদ্বারা স্বজ্ঞানে আমার নাম পরিবর্তন করিয়া অত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করিলাম। আমার পরিবর্তিত নাম হইবেঃ শামীমা ফরজানা হক পীং নুরুল হক গ্রাম নীলক্ষী, পোঃ ফুলগাজী, জিলা ফেনী।

বিজ্ঞাপন কর্মাধ্যক্ষ কয়েকবার যুবকটির আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। মাটিতে ছায়া দেখিয়া কর্মাধ্যক্ষ আশ্বস্ত হইলেন যে যুবকটি 'মনুষ্য' সন্তান।

ঃ ইহাই কি আপনার বিজ্ঞাপন?

ঃ জী। এই বলিয়া চাহিদা মোতাবেক বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধ করিয়া দিল। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ হইবার পর বিজ্ঞাপনটি লইয়া যুবকটি এক এ্যাডভোকেটের নিকট গমন করিল।

www.pathagar.com

এ্যাডভোকেট এই বিজ্ঞাপনটি দেখিয়া প্রথমে যুবকটিকে মানসিক রোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পরে বুঝিলেন ইহা একটি উঁচুদরের সামগ্রী। বড় আকারে কিছু পাওয়া যাইবে।

এ্যাডভোকেট ঃ হে যুবক। এই বিজ্ঞাপন দিয়া কি করিবেন।

যুবক ঃ আমার নাম এফিডেভিট দিয়া পরিবর্তন করাইব, তাই পূর্বাহ্নে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছি। এফিডেভিটের পরে পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রদান করিব।

এ্যাডভোকেটঃ আপনি কোন জবানবন্দী দিতে পারিবেন?

যুবক ঃ নিশ্চয় পারিব।

এ্যাডভোকেট ঃ আপনার জবানবন্দীতে যদি কোর্ট বিরাগভাজন হয় ইহাতে আপনি কি আমার উপর রুষ্ঠ হইবেন?

যুবক ঃ না। আমার নিজের উপর আমার প্রভূত আস্থা রহিয়াছে।

যুবক এ্যাডভোকেটের চাহিদা মোতাবেক টাকা গুনিয়া দিল। এফিডেভিট টাইপ করা হইল। যুবক উহাতে স্বাক্ষর করিল।

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাকিম উপস্থিত হইলেন। এ্যাডভোকেট বাদীর পক্ষে এফিডেভিটখানা উত্থাপন করিলেন। বাদী শপথনামা পাঠ করিল। এই শপথনামা পাঠে হাকিমও বিচলিত হইলেন।

এই যুবকের কি কোন দৈহিক আকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

হাকিমও যুবকের আপাদমস্তক অবলোকন করিলেন। সুদর্শন যুবকের চিকন গোঁফ রহিয়াছে। লম্বা, গৌড়বর্ণ, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। প্রশস্ত বক্ষপট। মস্তকে কোঁকড়ানো কালো চুলের বিন্যাস। তবে কেন এ মতিভ্রম? পুরুষ নাম পরিহার করিয়া কেন এই যুবক নারী'র নাম গ্রহণ করিতে শপথ বাক্য পাঠ করিতেছে? সে কি মানসিকভাবে সুস্থ?

হাকিম ঃ হে সুদর্শন যুবক, আপনি আপনার এ এ্যফিডেভিটের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবেন? কেন নারী নাম ধারণ করিতেছেন?

যুবক ঃ মহামান্য আদালত, এ দুই চারিটি বাক্যে আমি আমার মনের মত ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিব না। আমাকে আপনি আমার ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনমত সময় প্রদান করিতে হইবে।

হাকিম ঃ হে যুবক। নিশ্চয় প্রয়োজন মত সময় দেওয়া হইবে।

যুবক মস্তক নত করিয়া হাকিমকে সালাম জানাইল।

যুবক ঃ হে মহামান্য আদালত, সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। এই ফলাফল আমার মত আপনারও গোচরীভূত হইয়াছে। এই ফলাফলে কি দেখিয়াছি, দেখিতে পাইলাম যে ছাত্রীরা সকল বিভাগে শীর্ষস্থান দখল করিয়া লইয়াছে এবং সকলেই নব্য এলিট ঘরের তনয়া। গরীবের কোন স্থান নাই।

www.pathagar.com

শীর্ষস্থান অধিকারী এক ছাত্র ফল প্রকাশের পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ছাত্রীরা বিভিন্ন পরীক্ষা ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। পুরুষ নাম আজ শীর্ষ স্থানে নাই।

হে মহামান্য আদালত, প্রভাতে মুয়াজ্জিনের সুমধুর স্বরে আজান ধ্বনিত হয়। আসসালাতো খাইরুম মীনান নাউম–নিদ্রা হইতে সালাত উত্তম। শিশু পাঠ্যেও পাঠ দান করা হয়- "আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে।" হায় আমার স্বদেশ! কোন তরুণ শুভ্র প্রভাতের নির্মল বাতাস সেবনে অথবা সালাত কায়েমের জন্য ঘুম হইতে জাগরিত হয় না।

যে সমস্ত তরুণ গলা ফাটাইয়া চিৎকার করে, "ভয় নাই রাজপথ ছাড়ি নাই" তাহারাও ভোরে রাজপথে কোন দিন মিছিল লইয়া গমন করে না। ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত কতিপয় বৃদ্ধকে ভোরের সময় রাস্তায় প্রাতঃভ্রমণে দেখা যায়। প্রভাত সমীরণের সুমধুর কাব্য/গীতি রচয়িতা কবিগণও রাস্তায় থাকেন না। রাস্তায় ডাষ্টবিনে তখন থাকে অগণিত কাকের মিছিল।

হে মহামান্য আদালত, শহরে রাজপথ তখন দখল করিয়া নেয় গার্মেন্ট ফ্যাক্টরীর মহিলা। শত শত মহিলার পদভারে ভোরের রাজপথ মুখরিত হয়। স্কুল কলেজে ছাত্র হইতে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন (ক্ষমতাসনে রহিয়াছেন বলিয়া জোর দিতে পারিলাম না) ও বিরোধী দল নেত্রী (প্রাক্তন ক্ষমতাসীন) হইলেন মহিলা, আমি অত্যন্ত জোরের সহিত কহিব বাংলাদেশে গণতন্ত্র থাকিলে 'মহিলা' হইবেন প্রধানমন্ত্রী। আওয়ামী লীগ বি, এন, পি ছাড়া অন্য কোন দল ক্ষমতার বারান্দায় পায়চারীও করিতে পারিবে না। অন্যান্যরা ছাগলের তৃতীয় সন্তান হইয়া বিনা দুগ্ধপানে উল্লম্ফন করিবে।

ডায়নার মর্মান্তিক তিরোধানের পর বৃটেনে দাবী উঠিয়াছে ডায়নার পুত্রের নিকট অর্থাৎ রানীর জাতির নিকট বৃটেনের রাজার ক্ষমতা দেওয়া হউক। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশে তেমন দাবী উত্থাপিত হইলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মীরা হয়ত একদিন কহিবেন যে জননেত্রী বঙ্গবন্ধুতনয়া শেখ হাসিনা, আপনি ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়াছেন। অতএব আপনি নেতৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আপনার নাতনীর উপর নেতৃত্ব প্রদান করুন। বিএনপি কর্মীরাও হয়ত অনুরূপভাবে কহিবেন, হে দেশ নেত্রী, আপনি আপনার নাতনীর উপর নেতৃত্বের ভার অর্পণ করুন।

প্রভুর কি মহিমা! দেশের গণতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য দুই নেত্রীর বংশে 'নাতনী'র জন্ম হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুরুষ নেতৃত্বের সহিত 'ঘুষ'

www.pathagar.com

মিশিয়া রহিয়াছে, কিন্তু মহিলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ থাকিলেও ঘুষ কেলেংকারী নাই।

হে মহামান্য আদালত, ভারতীয় ঐতিহ্যের আমরাও উত্তরাধিকারী। এই ঐতিহ্যে দেবতা হইতেও দেবীদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী সকলেই মঙ্গলময়ী দেবী। মুসলমান মরমী কবিরাও নারীকে প্রধান হিসাবে দেখিয়াছেন–যেমন লায়লী মজনু। আমাদের মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও কাহিনী কাব্যে আধুনিক যুগের সাহিত্যে নারী চরিত্রই শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত চিত্রাঙ্গদার মধ্যে নারীর রূপ খুঁজিয়াছেন। জীববিজ্ঞানীরা কহিয়াছেন, প্রাণীজগতে পুরুষই সুন্দর, যেমন পুংহাতীর দাঁত আছে, সিংহের কেশর, ময়ুরের পেখম, মোরগের ঝুঁটি আছে, তেমনি পুরুষের গোঁফ দাড়ি আছে। পুরুষের সৌন্দর্য হইতেছে অহংকার আর নারীর সৌন্দর্য অলংকার। তবুও পুরুষের সৌন্দর্য লইয়া বিশেষ কোন কাব্য গীতি রচিত হয় নাই। সম্প্রতি দুইটি শোক বিশ্বকে আলোড়িত করিয়াছে একটি ডায়নার অপরটি মাদার তেরেসার।

হে মহামান্য আদালত, ডায়না ও মাদার তেরেসা কি পুরুষ। নিশ্চয় নহে, তাহারা নারী।

হে মহামান্য আদালত, আমি বিশ্বাস করিতেছি যে, নারী নাম ধারণ করিলেই আমি জীবনে উন্নতি করিতে পারিব। পুরুষ নামে উন্নতির কোন ভরসা নাই। শ্রী রাধা মনের সাধ পূরণ করিবার জন্য কহিয়াছেন–সাধিতে মনের সাধা, পরজনমে তোমারে করিব রাধা।

দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রুক্মিণী পদ্মিনীও পুরুষ ছিলেন।

হে মহামান্য আদালত, স্বজ্ঞানে, দৃঢ় চিত্তে শপথ বাক্য পাঠ করিয়া কহিতেছি, নারী নাম গ্রহণ করিলেই আমি শনৈ শনৈ উন্নতির শিখরে আরোহন করিতে পারিব। পুরুষ নাম নিয়া নারীদের আর পরাস্ত করা সম্ভব নহে।

আদালত ভবনে এতক্ষণ পিনপতন নিরবতা ছিল। হাকিম অপলক নয়নে যুবকের জবানবন্দী শ্রবণ করিতেছিলেন। জবানবন্দী সমাপ্ত হইলে হাকিম উল্লসিত হইয়া স্লোগান হাঁকিলেন, জয়, নারীর জয়, জয়, শাড়ীর জয়।

জয় জয় হাছিনা, জয় জয় খালেদা। সমস্ত আদালত ভবন সেই স্লোগানে প্রকম্পিত হইল, প্রতিধ্বনি হইল,

জয় নারী জয় শাড়ী
যুগ যুগ জিও নারী
আমরা সবাই পরব শাড়ী।

❐ ১৯শে সেপ্টেম্বর '৯৭

www.pathagar.com

চামচাগিরির স্কুল চাই

এই দেশ যখন বেনিয়াদের হস্তগত হইল তখন আমরা একটি অপূর্ব দ্রব্যের স্বাদ পাইয়াছিলাম। সেই স্বাদের নাম কেরানিগিরি। এই 'কেরানি' লইয়া আমাদের দেশে বহু ব্যঙ্গ বিদ্রুপ প্রচলিত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মাছিমারা কেরানি। এই মাছিমারা কেরানি সম্পর্কে বহু গল্প রহিয়াছে তৎমধ্যে জনপ্রিয় গল্পটি হইতেছে নিম্নরূপঃ

কেরানিদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার নাই। জনৈক কেরানি একটি খাতা হইতে আর একটি খাতায় বিভিন্ন বিবরণী লিপিবদ্ধ করিতেছিল। একদা সে অবলোকন করিল যে পূর্ববর্তী খাতার মধ্যে একটি মাছি মরিয়া রহিয়াছে। কেরানি কি করিবে? তাহাকে পূর্ব খাতা হইতে হুবহু লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। মস্তিষ্কের অনেক আক্কেল বুদ্ধি নাড়িয়া চাড়িয়া অবশেষে আর একটি মাছি মারিয়া পরের খাতায় সন্নিবিষ্ট করিল।

দ্বিতীয় কাহিনীটি হইল–পূর্ববর্তী খাতায় মাছি মরা দেখিয়া কেরানি বাবু হতভম্ব হইয়া পড়িল। উপায়ান্তর না দেখিয়া পরবর্তী খাতায় কালি ঢালিয়া একটি মাছির চিত্র তৈয়ার করিলেন। সৈয়দ মুজতবা আলী কহিয়াছেন যে মাছি মারা সহজ নহে, কারণ মাছি মারিতে গেলে মাছি পলায়ন করে। কারণ মাছির মাথার উপর রহিয়াছে মাছির চোখ।

কেরানি সম্পর্কে একটি সরস ইংরেজী বাক্য রচনা রহিয়াছে। আমার মামা কেরানিগিরি করেন ইহার সরস ইংরেজী বাক্যটি হইল- "মাই ডবল মাদার হু কুইন মাউনটেইন ডাস"। হাই স্কুলের কেরানিকে বলিতাম কেরানি স্যার। এখন কেরানি শব্দটি খুব বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার স্থলে হইয়াছে অফিস এসিস্টেন্ট/ অফিস সহকারী। বাংলাদেশে মাছির সংখ্যা বাড়িলেও মাছিমারা কেরানির সংখ্যা তদনুযায়ী বৃদ্ধি পায় নাই। চাকুরীর বাজার এখন নাই বলিলেই চলে। কালেভদ্রে এহেন পদের বিজ্ঞাপনে কেরানি শব্দের স্থলে 'কারনিক' ব্যবহার হইয়া থাকে।

কেরানি দুইভাগে বিভক্ত–আপার ডিভিশন কেরানি ও লোয়ার ডিভিশন কেরানি। লোয়ার ডিভিশন কেরানিদের ইজ্জতের সাথে LDC বলা হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

কেরানি যাহারা হইয়াছেন তাহারা সৌভাগ্যবান, কারণ বর্তমানে চাকুরী নাই বলিলে চলে। ইহা ছাড়া কেরানি তৈয়ারীর শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু বুদ্ধিজীবী শব্দ বুলেট প্রয়োগ করিয়াছেন। কেরানি তৈয়ারীর শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এত সংগ্রাম করিয়াও কেরানি তৈয়ারীর শিক্ষাব্যবস্থা হইতে আমরা আজো মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। শিক্ষাব্যবস্থা কেরানিগিরি তৈয়ারীর ফ্যাক্টরী হইলেও এই ফ্যাক্টরীর উৎপাদিত সামগ্রীর বর্তমানে কোন বাজার নাই। বরং বলা যাইতে পারে যে এই ফ্যাক্টরী হইতে 'বেকার নামক' মনুষ্য সন্তান সৃষ্টি হইতেছে। এবং ইহাদের সংখ্যা দিনদিন গিনিপিগের মত বৃদ্ধি পাইতেছে।

মহাশূন্য বলিয়া শূন্যের একটি স্তর থাকিলেও বাংলাদেশে শূন্য বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব বেশীদিন থাকে না। বাংলাদেশে কেরানিগিরির স্থলে 'চামচাগিরি' দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতীতে যে 'চামচা' ছিল না উহা নহে, সব দেশে সবকালে চামচা ছিল শুধু নহে, তাহারা বহাল তবিয়তে অবস্থান করিত। আমাদের দেশে চামচা ছিল। কিন্তু 'চামচাগণকে' কেহ শ্রদ্ধার চোখে দেখিত না। সম্প্রতি চামচাগণ আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিশেষ স্থান দখল করিয়া লইয়াছে।

পূর্বে দুই একজন ভাগ্যগুণে সোনার চামচ মুখে পুরিয়া জন্মগ্রহণ করিত। জমিদার তনয়গণ ছিলেন স্বর্ণপাত ও পাত্রের অধিকারী, অতএব তাহাদের গৃহে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিত তাহাদিগকে বলা হইত, অমুক সোনার চামচ মুখে দিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রিন্স করিম খানের দাদা আগা খান ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে রৌপ্য জয়ন্তী পালিত হইয়াছিল রৌপ্য দিয়া তাঁহাকে ওজন করিয়া আর স্বর্ণ জয়ন্তী পালন করা হইয়াছিল তাঁহার ওজন পরিমাণ স্বর্ণদান করিয়া।

প্রয়াত সঞ্জীব গান্ধীর স্ত্রী মেনকা গান্ধীকে তাহার ভক্ত অনুরক্তরা রৌপ্যমুদ্রা দিয়া একবার ওজন করিয়াছিল। নবজাত সন্তানের মস্তক মুণ্ডন একটি আনুষ্ঠানিক পবিত্র কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। পূর্বে সমর্থ গৃহস্থরা তাই নবজাত সন্তানের চুল ওজন করিয়া রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিতেন। আজকাল ইহার প্রচলন নাই। 'মুখে সোনার চামচ' এই কথাটির পরিবর্তে বর্তমানে বলিতে হইবে অমুক ডলার / ইয়ান / দিনার / দিরহাম/পাউন্ড পকেটে লইয়া ইহধামে আগমন করিয়াছেন।

তাই সোনার চামচ কথাটির পরিবর্তে নব্য সৃষ্ট চামচাদের জন্য চামচ কথাটি রাখিয়া দিতে হইবে। বাংলাদেশের সকল জায়গায় এখন চামচাদের প্রচণ্ড ভীড় পরিলক্ষিত হইতেছে। অযোগ্য অপদার্থ হইলে চলিবে কিন্তু চামচাগিরির আর্ট না জানিলে চলিবে না। শান্ত, ভদ্র, সৌম্য প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা চামচাদের হাতে নীরবে পরাজয় বরণ করিয়া নিতেছেন। চামচাগণ কখনো উদ্ধত ব্যবহার, আচরণ করেন না। উর্ধতন কর্মকর্তার সহিত মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে তাহারা সদাব্যস্ত থাকেন।

www.pathagar.com

তাহাদের মুখে হাসি থাকে। তাহারা আপ্যায়নে অভ্যর্থনায় কুণ্ঠিত নহেন। তাহারা কখনো 'কঞ্জুস' হিসাবে পরিচিত নহেন, তাহারা বন্ধুবৎসল পরোপকারী হিসাবে চিহ্নিত। আদতে তাহারা পরের উপকারের অভিনয় করিয়া নিজের মতলব হাসিল করিয়া থাকেন। 'চামচাগণ' স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, কল-কারখানায় সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। মাঠে যাইয়া চামচাগিরি করিলে বা কল-কারখানায় চামচাগিরির অভিনয় করিলে উৎপাদন হইবে না। মাঠে বা কল-কারখানায় চামচাগিরি করিলে উৎপাদনের পরিবর্তে 'উৎপাটন' ঘটিবে।

'মস্তান' ও 'চামচা' এক নহে। মস্তানদের শক্তি বাহুতে আর চামচাদের শক্তি মগজে, রসনায় ও আচরণে।

সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া অন্য সর্বত্র 'চামচা'দের দৌরাত্ম্য রহিয়াছে। ইহারা দৈত্য নহে, ইহারা ইঁদুর, কাটিয়া কুটিয়া সব একাকার করিয়া দেয়। মার্শাল আর্ট, রান্না, সৌন্দর্য চর্চা, সংগীত ও শিল্পচর্চার স্কুল রহিয়াছে। কিন্তু চামচাগিরির কোন স্কুল বা কোচিং সেন্টার নাই। কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে কোচিং সেন্টার সমূহ উন্নত চামচাগিরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ভাল ভাল ছাত্রও অবশেষে ভাল 'চামচা' হইয়া বাহির হইয়া থাকে।

রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষায় বলিয়াছিল, 'শঠের' প্রলোভনে মুগ্ধ হইও না। কিন্তু চামচাগিরি করিও না, চামচা হইতে সাবধান, চামচাদের প্রলোভনে মুগ্ধ হইও না এমন বাক্য লেখা নাই। বাংলাদেশের অপরাধ আইনে চামচাগিরি শাস্তিযোগ্য না ক্ষমাযোগ্য ইহা এই অধমের জানা নাই। যদি কোন সুজন পাঠকের জানা থাকে তবে পত্র মারফত জানাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

চামচা কে এবং কে চামচা নয় ইহা বলা মুশকিল। আপনি চামচাকে ছাড়িলে চামচা আপনাকে ছাড়িবে না, আপনার সুদিনে চামচা অত্যন্ত আপন, কিন্তু দুর্দিনে চামচার টিকিও খুঁজিয়া পাইবেন না। বাংলা ভাষায় সুখের পায়রা, বসন্তের কোকিল, দুধের মাছি ইত্যাদি প্রবচনসমূহ থাকিলে, চামচা নিয়া বাক্য নাই। বাংলা রচনায় তাই নতুন প্রবচন হইবে–সুখের চামচা, বসন্তের চামচা, দুধের চামচা, ক্ষমতার চামচা ইত্যাদি ইত্যাদি। যে দেশে যত বেশী চামচা সৃষ্টি হইবে সেই দেশে সুখ শান্তি অতিসত্বর বিনষ্ট হইবে।

পাদটীকা ঃ সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গিয়াছে বাংলাদেশে গরুর সংখ্যা সোয়া দুই কোটি। কিন্তু গুরু ও গাধার কোন সংখ্যা দেখানো হয় নাই।

❐ ১৩ই আগষ্ট '৯৩

www.pathagar.com

সর্পরোগ

একদা শয়তান এক বাকপটু সুবেশ ও বুদ্ধিমান যুবকের সাজে সজ্জিত হইয়া ইরানের রাজা জোহকের রাজদরবারে উপস্থিত হইল।

শয়তানঃ হুজুরের কি পাচকের প্রয়োজন আছে? আমি একজন যশস্বী পাচক।

পাচকের কথা শ্রবণ করিয়া জোহকের মন নাচিয়া উঠিল। রাজা তৎক্ষণাৎ হুকুম প্রদান করিলেনঃ কে, আছ! ইনাকে রান্নার জন্য স্থান করিয়া দাও।

ছদ্মবেশী এই যুবকের কাছে যথাসময়ে রাজকীয় রন্ধনশালার চাবি অর্পণ করা হইল। ইরানের তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী রাজকর্মে তাহাকে নিযুক্ত করা হইল।

সেই আদি যুগেও কোন কিছুরই প্রাচুর্য ছিল না। খাদ্যের জন্য বধযোগ্য প্রাণীর সংখ্যাও ছিল কম।

www.pathagar.com

শয়তান রাজাকে পরামর্শ দিয়া কহিল, "খাদ্যের জন্য অবাধে প্রাণী বধ করা হউক।

উহার ফলে রাজ্যের বিচিত্র বর্ণের পাখি ও নানা চতুষ্পদ প্রত্যহ রাজার খাদ্যের জন্য বধিত হইতে লাগিল। জীবের শোণিতে জীবন ধারণ করা বনের ব্যাঘ্র যেমন প্রাণী হত্যায় তৎপর, রাজার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি প্রাণের নিধনে মাতিয়া উঠিল।

পাচক প্রথমে ডিমের কুসুম দিয়া সুস্বাদু এক ভোজ্য তৈয়ার করিয়াছিল। সে ভোজ্য রাজার দেহে দান করিল শক্তি ও স্বাস্থ্য। রাজা তৃপ্ত হইয়া পাচককে পারিতোষিক দান করিলেন। পাচকরূপী শয়তান চাটুবাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, উন্নত শির রাজার ভাগ্যে নির্দিষ্ট হউক চির যৌবনের জৌলুস। আগামী কল্য ইহা হইতেও সুস্বাদু ভোজ্য আমি রন্ধন করিব। হে রাজন! আপনার পবিত্র রসনা পরিপূর্ণ রসনার সন্ধান পাইবে। পর দিবস শুভ্র চকোর ও চকোরীর মাংসে প্রস্তুত এক রসনা তৃপ্তকর ভোজ্য রাজার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল।

তৃতীয় দিবসে মোরগ ও হরিণ শিশুর মাংস দ্বারা রাজ দস্তরখানা সজ্জিত করা হইল।

চতুর্থ দিবসে রাজসম্মুখে উপস্থিত করা হইল পূর্ণবয়স্ক গাভীর সুস্বাদু মাংস। এই মাংসে দেওয়া হইল জাফরান, গোলাপ জল, সুগন্ধী মৃগনাভী এবং বহুদিনের পুরাতন সুরা।

ভোজন শুরু করিবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চতুর পাচক সহাস্যবদনে রাজার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া কহিল, বল তোমার আকাঙ্ক্ষা, যা তোমার কাম্য অকপটে তুমি নিবেদন কর। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার আকাঙ্ক্ষা আমি পূরণ করিব।

পাচক ঃ হে রাজাধিরাজ। আপনি চিরসুখী দীর্ঘজীবী হউন। আপনার রাজ্য হউক চির প্রতিষ্ঠিত। আমার হৃদয় আপনার দয়ায় পরিপূর্ণ। আমার প্রাণের সম্পদ আপনারই বদনমণ্ডলের অনুগ্রহ। রাজার সমীপে আমার একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা।

রাজা ঃ কি সে তোমার আকাঙ্ক্ষা?

পাচক ঃ আমি সেই সৌভাগ্যের উপযুক্ত নহি--

রাজা ঃ দ্বিধাহীন চিত্তে তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করিতে পার যত কঠিন হোক উহা পূরণ করিবই।

www.pathagar.com

পাচক ঃ আমার বাসনা, রাজার স্কন্ধদ্বয় চুম্বন করি। আমার নয়নদ্বয় সেই সুখ স্পর্শ লাভে ধন্য হউক।

রাজা ঃ তোমার আবেদন গৃহীত হইল। পাচকের সঙ্গী মানুষবেশী দৈত্য তাহাকে কহিল, আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর রাজার স্কন্ধদ্বয় চুম্বন কর।

পাচক কর্তৃক রাজার স্কন্ধ চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হইল। রাজার কাঁধে দুইটি কালো সাপ ফনা তুলিয়া দাঁড়াইল আর চক্ষের নিমিষে পাচক ও তার সঙ্গী অন্তর্ধান হইল।

অবিলম্বে সর্পদ্বয়কে অস্ত্রাঘাতে নির্মূল করা হইল।

কি আশ্চর্য! কিন্তু সর্পদ্বয় যেন বৃক্ষের কর্তিত শাখা। আবার সেই সর্পদ্বয় দুই কাঁধে পুনরায় গজাইয়া উঠিল।

রাজ্যের চারিদিক হইতে রাজধানীতে জ্ঞানী চিকিৎসক দলকে আনিয়া জমায়েত করা হইল। তাহারা নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে নানা কাহিনীর অবতারণা করিল। তাহারা নানা মন্ত্র উচ্চারণ করিল। প্রয়োগ করিল বিচিত্র ইন্দ্রজাল।এই সর্প রোগের কোন উপশম হইল না।

ইহার পর শয়তান এক চিকিৎসকের বেশে জ্ঞানীসদৃশ গুরুগম্ভীর চালে জোহকের সমীপে উপস্থিত হইল। শয়তান কহিল, এমন ঘটনা পৃথিবীর কোথাও নাই। ইহার প্রতিকার অজ্ঞাত। এ স্বর্পদ্বয়কে দিতে হইবে উপযুক্ত খাদ্য। তাহা হইলে ইহারা শান্ত হইবে। অন্যথায় এই সর্পদ্বয় রাজার মস্তকের মগজ চর্বণ করিবে।

রাজা ঃ ইহাদের খাদ্য কি?

শয়তান ঃ মানুষের মগজ, মানুষের মগজ ছাড়া আর কিছুতেই ইহারা তুষ্ট হইবে না। এই খাদ্য পাইলে তাহারা শান্ত থাকিবে। দুই সাপকে প্রতিদিন দুইটি মানুষের মগজ খাইতে দিতে হইবে।

প্রতি রাত্রে দুইজন যুবক ধরিয়া আনা হইত। বাদশার প্রাসাদে হত্যা করিয়া দুই জন যুবকের মগজ টানিয়া বাহির করা হইত। মানুষের এই মগজ দিয়া সর্পদ্বয়ের রোজকার খাদ্যের সংস্থান হইত।

সর্পরোগে আক্রান্ত জোহকের রাজত্বে ইরানে শিল্প জ্ঞান উপেক্ষিত হইল। ইন্দ্রজাল পাইল সম্মানের আসন। ভেদবুদ্ধিময় কারুকার্য ছাড়া রাজধানী হইতে আর সব সদুদ্দেশ্য বিদায় গ্রহণ করিল। স্বাস্থ্য মুখ লুকাইল, সর্বত্র রোগ শোক দেখা

www.pathagar.com

দিল। কম্পিত বেতসের মত মানুষ ভয়ে মূহ্যমান হইয়া পড়িল। অন্যায় কাজে দৈত্যের হাত জয়যুক্ত হইল।

সেই দেশে ছিল শুদ্ধচিত্ত দুই প্রাণ– আরমায়েল ও কারমায়েল। তাহাদের মধ্যে একজন পাচকের বৃত্তি লইয়া রাজ দরবারে স্থান গ্রহণ করিল।

তাহারা একটি উপায় বাহির করিল। দুইজন মানুষের পরিবর্তে আপাতত একজন মানুষের প্রাণ বাঁচান যাইতে পারে। মৃত্যু পথযাত্রী দুই হতভাগ্যের মধ্য হইতে একজনকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হইল। মানুষের পরিবর্তে গাধার মগজ আনা হইল।

একজন হতভাগ্যের সহিত গাধার মগজ মিশাইয়া স্ব স্ব সর্পের খাদ্য প্রস্তুত করা হইল। এইভাবে প্রতিমাসে ৩০ জন যুবকের প্রাণ রক্ষা করা হইল। কথিত আছে, পলাইয়া যাওয়া লোকজন মরুএলাকায় এক মরুচারী গোত্রের পত্তন করিল এবং ইতিহাসে তাহারা 'কুর্দ' জাতি নামে পরিচিত হইল।

(মনির উদ্দিন ইউসুফ অনূদিত ফেরদৌসীর শাহনামা হইতে কাহিনী ভাব -ভাষা বাণী চয়নকৃত)

হে সুহৃদ পাঠক! জোহক রাজা গত হইয়াছে। জোহক রাজা গত হইবার পরই সেই দেশে সর্প রোগ নির্মূল হইয়াছিল। কিন্তু কি নির্মম বিধিলিপি, আজ জোহক রাজা নাই, কিন্তু দেশে দেশে এই সর্পরোগ সন্ত্রাস নামে নূতন রূপ ধরিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে ইহা সর্বনাশা রোগ রূপে দেখা দিয়াছে।

আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাস নামক এই নব্য সর্পরোগ রাজনীতির স্কন্ধে আবির্ভূত হইয়াছে। (সন্ত্রাসের ব্যাপক অর্থ রহিয়াছে, আমি এখানে বর্তমানে প্রচলিত সাধারণ অর্থে সন্ত্রাস বলিতে চাহিতেছি, যাহারা অস্ত্র দিয়া নিজ অভিলাষ চরিতার্থ করিতে চাহে তাহাদের কথা বলিতেছি মাত্র)।

রাজা জোহক অস্ত্রবলে সর্প নিধন করিতে চাহিয়াছিলেন । কিন্তু কর্তিত সর্প কচু গাছের মত পুনরায় গজাইয়া ওঠে।

সন্ত্রাসও তেমনি গজাইতে পারে। সন্ত্রাস নামক এই নব্য সর্পরোগকে নির্মূল করিবার জন্য জাতীয় ঐকমত্য একান্ত অপরিহার্য। এই সর্পকে যাহারাই লালন করুক না কেন, এই সর্প তাহার/তাহাদিগের মগজ খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে।

❐ ২৩শে আগষ্ট '৯৬

www.pathagar.com

দালাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাই

লাল ও দালাল বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত শব্দ। এই শব্দ যুগপৎ নিন্দনীয় ও নন্দনীয়। এক সময়ে বামপন্থীরা লাল বলিয়া অভিহিত হইত। তাহারা লাল পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া "দুনিয়ার মজদুর এক হও" স্লোগান হাঁকিয়া মিটিং মিছিল করিত। বর্তমানে "দুনিয়ার মজদুর এক হও" এই স্লোগান তুলিলেও তাহাদিগকে লাল বলিয়া চিহ্নিত করা যায় না। এক সময়ে আমেরিকার লাল আতঙ্ক ছিল এক মহান আতঙ্ক। লাল দুনিয়ার স্বপ্নভূমি সোভিয়েত রাশিয়া কুপোকাৎ হইয়া যাইবার পর মার্কিন মুল্লুকে শান্তি আসিয়াছে। অতীতে দেখা গিয়াছে যে, যাহারা একটু গরম গরম কথা বলিতেন তাহারাও লাল নামে অভিহিত হইতেন। এমন কি মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকেও মার্কিনীরা লাল মওলানা বা Red Maulana

www.pathagar.com

বলিত। এমন কি সাপ্তাহিক টাইম্‌স পত্রিকায় মওলানা ভাসানীর প্রচ্ছদ ছাপিয়া কহিল, Prophet of violence. বাংলাদেশ হইবার পর লালদের দৌরাত্ম্য কমিয়া গিয়াছে। মিটিং মিছিলে মাথায় লাল সালুর বেন্ডিজ বাঁধা স্বেচ্ছাসেবকদের দেখিতে পাইলেও আদতে তাহারা কেহই লাল নহেন। লালেরা বিপক্ষ দলকে দালাল বলিয়া গালাগালি করিত। কিন্তু বড় বড় লালগণ পরবর্তী সময়ে বড় বড় দালালের খেতাব লইয়া রাজপ্রাসাদে রাজ প্রসাদ ভোগ করিয়াছে।

দালাল কথাটি আমাদের দেশে বড়ই নিন্দনীয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে দালালী এক প্রকারের মহাশক্তি। দালালী করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে বহু লোক বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। আবার দালালী করিতে গিয়া অনেকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত হইয়াছে। দালাল কথাটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দালালী কথাটিকে ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হইবে, যিনি রুটি দিবেন তাহার রুচি অনুযায়ী চলিব। কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, গায়িকা, এমন কি অনেক চিত্র পরিচালকও দালালী করিয়া দেশ বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তি হইয়াছেন। দালালদের মধ্যে জাত বেজাত রহিয়াছে। গরুর দালাল, আর পাটের দালাল বা বীমার দালাল বা ভোটের দালাল তারা একই কাতারে দাঁড়াইতে পারে না। ভোটের দালাল, গরুর দালাল আর পাটের দালালের জন্য কোন লাইসেন্স এর প্রয়োজন নাই। কিন্তু বীমার দালালীর জন্য রীতিমত লাইসেন্স করিতে হয়। দালালের ইংরেজী শব্দ এজেন্ট। দালাল আর এজেন্টের মধ্যে রূপগত, বস্তুগত বা গুণগত কোন তফাৎ নাই। কিন্তু এজেন্ট হইল খান্দানী আর দালাল হইল বদনামী। রামধন যখন জুতা বানায় তখন সে মুচি আর বাটা কোম্পানী যখন জুতা বানায় তখন সে কোম্পানী। দালালী যখন ব্যবহার করি তখন উহা হয় গালি আর এজেন্ট বলিলে হয় প্রশংসা। কাহাকেও গাধা বলিলে রাগে কাঁপিতে থাকে। অপর দিকে বাঘের বাচ্চা বলিলে আনন্দে বুক ফুলিয়া উঠে। অথচ গাধা, বাঘ, সিংহ পশুরই নাম। এজেন্ট ও দালাল ঠিক তেমনই শব্দ। ইহারা দেশী এবং বিদেশী দুই হইতে পারে। অন্যান্য দেশে বিদেশী দালালের কদর কম, কিন্তু আমাদের দেশে দেশী দালাল অপেক্ষা বিদেশী দালালের মূল্য অত্যন্ত বেশী। ইহার একটি ঐতিহাসিক কারণ রহিয়াছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই দেশের শাসক, শোষক, হার্মাদ, বর্গী সবাই ছিল বিদেশী। এই দেশের সিরাজদৌল্লা যেমন ছিল বিদেশী, মীরজাফর ও লর্ড ক্লাইভও ছিল তেমনি বিদেশী।

বখতিয়ার খিলজীর ভয়ে যে লক্ষণ সেন পিছনের দরজা দিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন তিনিও খাঁটি অর্থে বাঙ্গালী ছিলেন না। বিদেশী প্রভাব আমাদের দেশে

www.pathagar.com

এত বেশী যে বাংলাদেশের তৈরী জিনিষের উপর বিদেশী কোম্পানীর সীল মারিয়া না দিলে উহা বাজারে বিক্রয় হইতে চায় না। আমাদের দেশের বিভিন্ন জিনিষের উপর বাঙ্গালীত্ব চলিয়া যাইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালীত্বের খাঁটি পরিচিতি যাহা উহা হইল কান্না। আমাদের রান্নাও দেশী বিদেশী ঠেলায় ভেজাল হইয়া গিয়াছে। জল না পানি, সুরুয়া না ঝোল, মাংস না গোস্ত ইহা লইয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে একদা রেষারেষি ছিল। কাহারো জন্য জল ছিল পবিত্র, পানি ছিল অপবিত্র, কাহারো জন্য সুরুয়া ছিল জায়েয এবং ঝোল ছিল না জায়েয, কাহারো জন্য গোস্ত ছিল হালাল এবং মাংস ছিল হারাম। অথচ জল বা পানি, গোস্ত বা মাংস, ঝোল বা সুরুয়ার মধ্যে গুণগত কোন তফাৎ ছিল না। ঝোল সুরুয়া বা জলপানির ঝগড়া বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ঠাণ্ডা লড়াই করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী দালালীর প্রভাবে জল পানি বা ঝোল সুরুয়ার ঝগড়া ইদানিং মিটিয়া গিয়াছে। মিনারেল ওয়াটার জল পানির ঝগড়াকে ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছে। ঝোল সুরুয়ার গরমকে সুপ আসিয়া নরম করিয়া দিয়াছে। গোস্ত বা মাংসের হালাল হারামকে চিকেন মটন, আর বীফ আসিয়া একেবারে মুক্ত বাজারের মত উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। দালালীর কর্মক্ষেত্র বহু বিচিত্র এবং ব্যাপক। দালালীর প্রয়োজন যে নাই ইহাও বলা যায় না। কারণ দালালী করিয়া দেশের জন্য যেমন ধন সম্পদ আনয়ন করা যায় তেমনি দালালীর পরিণামে দেশ ধ্বংস হইয়াও যায়। মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘ সংকটের সমাধান না হওয়ার প্রধান কারণ, বড় শক্তির দালালীর ক্রয় বিক্রয় ও রপ্তানী। দালালী নামক মহা শক্তিটি টিকিয়া আছে বলিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীর বুকে এখনও টিকিয়া আছে। দালালী অন্যান্য দ্রব্যের মত আমদানী, রপ্তানী, ক্রয় ও বিক্রয়ের যোগ্য। বড় বড় দেশের নেক নজরে পড়িবার জন্য ছোট ছোট দেশসমূহ বড় বড় দেশের দালালদের দালালীর টেক্স দিয়া থাকে। বড় বড় দেশও তাহাদের পচা মাল, পুরানো লোহা লক্কড়, সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ছোট ছোট দেশের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য বড় অংকের দালালী দিয়া থাকে।

দালালী দুই প্রকার–একটি প্রকাশ্যে অপরটি অপ্রকাশ্যে। অপ্রকাশ্য বা গুপ্ত দালালী প্রকাশ হইয়া পড়িলে উহা আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারী নামে অভিহিত হইয়া পড়ে। দালালীর সীমা পরিসীমা নাই। কে দালাল বা কে দালাল নয় বা কোনটি দালালী বা কোনটি দালালী নয় উহার কোন মাপকাঠি আজ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার দালাল অবস্থান করিত। বর্তমানে দালাল ও দালালী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত। অর্থনীতিতে যেমন ডিমান্ড সাপ্লাই আছে দালালদেরও তেমনি ডিমান্ড সাপ্লাই আছে। সামন্ত যুগে দালাল অবস্থান বর্তমান যুগের মত এত ব্যাপক ছিল না। মুক্ত বাজারের মত দালালদের বাজারও মুক্ত

www.pathagar.com

হইয়াছে। মুক্ত বাজারকে মুক্ত বাজারে পরিণত করিতে হইলে দালাল ও দালালী ছাড়া বিকল্প নাই। দালাল মস্তান হইতে পারে মস্তানও দালাল হইতে পারে, কিন্তু দালাল ও মস্তান সমার্থক নহে। মস্তানগণ গোঁয়ার ও গবেট। মস্তানগণ অগ্রপশ্চাত ভাবিয়া কাজ করে না। কিন্তু দালালগণ অত্যন্ত চালাক। অতি চালাকের গলায় যেমন দড়ি আটকাইয়া যায়, তেমনি অতি বুদ্ধিমান দালালের গলায়ও দড়ি আটকাইয়া যায়। গণতন্ত্রের শেকড় যে দেশে যত বেশী গভীরে প্রবেশ করিয়াছে সেই সেই দেশের অন্য ক্ষেত্রে দালালদের বিচরণ ব্যাপক হইলেও রাজনৈতিক দালালীর কোন স্থান থাকে না। উন্নত বিশ্বের দালালগণ উন্নতমানের, কিন্তু আমাদের দালালগণ অত্যন্ত নীচু মানের। আমাদের দেশের দালালগণ স্বীয় চরিত্র দীর্ঘ দিন ধরিয়া রাখিতে পারে না।

দালাল ও দালালী যেহেতু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সেহেতু দালাল ও দালালীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা একান্ত প্রয়োজন। দালাল ও দালালীর জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন রহিয়াছে। এ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রসপেক্টাস তৈয়ার করিতে হইবে। বাস্তবমুখী পরিকল্পনা দাঁড় করিতে পারিলে বিদেশী এন, জি, ও গণ অর্থসাহায্য নিয়া আগাইয়া আসিবেন।

যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দালাল শিক্ষক থাকেন তবে উহারা হইবেন এ বিদ্যায়তনের শিক্ষক। যদি আমাদের দেশে এহেন শিক্ষকের অভাব হয় তবে বিদেশ হইতে দালাল অধ্যাপক ভাড়া করিয়া আনিতে হইবে।

অর্থের লোভে যাহারা নূতন দালাল সাজিবেন তাহাদিগের প্রার্থীতা অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। পেশাদার দালাল শিক্ষক ছাড়া সখের দালাল শিক্ষক দিয়া ভাল জাতের দালাল তৈয়ার করা সম্ভব নয়।

কেহ কেহ বলিবেন, আমাদের বর্তমান শিক্ষানীতিই দালাল তৈরীর কারখানা। বৃটিশ-ভারতে মেকলের কারখানায় বৃটিশের দালাল সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হইয়াছিল আমরা উহা খুব বেশী পরিবর্তন করিতে পারি নাই। তবে আমরা যে ধরনের দালাল সৃষ্টি করিতেছি উহা নীচু মানের। এহেন দালাল আজকাল বাজারে চলে না। যে সমস্ত দালাল ইতোপূর্বে খ্যাত হইয়াছে তাহারা অনেকেই বিদেশ হইতে শিক্ষা ও ডিগ্রী লাভ করিয়াছে। স্বদেশে উচ্চমানের দালাল সৃষ্টির জন্য দালালী প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট খোলার প্রস্তাব রাখা যাইতে পারে।

❐ ৬ই নভেম্বর '৯২

www.pathagar.com

ভাতের চাইতে জাত বড়

একদা জনৈক ব্যক্তি তাহার সন্তানকে নিজ বাটি হইতে দূরবর্তী একটি স্কুলে ভর্তি করাইয়াছিলেন। তিনি ছেলেটিকে স্কুলের হোষ্টেলে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ছেলেটির অবিভাবক ছিলেন নিরক্ষর এবং সহজ সরল প্রকৃতির। তিনি এক হইতে কুড়ি পর্যন্ত গুণিতে জানিতেন। তিনি হোষ্টেল সুপারকে কহিলেন, আমার ছেলেকে সকাল কটায় ভাত দেওয়া হইবে?

হোষ্টেল সুপারঃ সকাল ৮টায়।

অভিভাবক ইহাতে বিচলিত হইলেন। আদতেই তিনি ঘড়ি ঘণ্টার হিসাব বুঝিতেন না। 'সকাল ৮টা' এই শব্দ তাহার মস্তকে বজ্রপাতের মত মনে হইল। হাতের এক একটি আঙ্গুল দিয়া কোন রকমে আট মিলাইলেন এবং কহিলেনঃ

হুজুর আটটার সময় যদি আমার সন্তানকে ভাত দেন তবে সে ১টা ২টা ৩টা ৪টার সময় পর্যন্ত কি খাইয়া থাকিবে? আমি আরো টাকা বাড়াইয়া দিব। সকাল ১টার মধ্যে ভাত দিতে না পারিলে অন্ততঃ ২টা ৩টার মধ্যে তাহাকে দয়া করিয়া ভাত দিবেন।

উক্ত নিরক্ষর লোক যে ঘড়ি ঘণ্টা মিলাইতে পারে নাই উহা নহে, আমরাও ঘড়ি ঘণ্টাকে নিজের তালে রাখিতে যাইয়া বেতাল হইয়া পড়িতেছি। সময়ের হিসাব মিলাইতে ঘণ্টার সহিত টা (যেমন ২টা-৩টা) নির্দেশক এবং পূর্বে পূর্বাহ্ন এবং পরে অপরাহ্ন'র টোপর পরাইতে দ্বিধাবোধ করিতেছি না। গজ/ফুট/ইঞ্চি মিটারের ক্ষেত্রে 'টা' 'টি' নাই–যেমন ২ গজ ৩ মিটার ৫ ইঞ্চি।

তারিখের ক্ষেত্রে অতীতে বিশেষণ যোগ করা হইত–যেমন ১লা ২রা ৪ঠা.. ইত্যাদি। ইদানিং এই লা, রা, ঠা হারাইয়া গিয়াছে। এখন পরিস্কারভাবে লিখা হয় যেমন ১ ফেব্রুয়ারী ৩ জানুয়ারী ৪ মার্চ ইত্যাদি রূপে। গজ, ফুট, ইঞ্চি, মিটার বিদেশী শব্দ হইলেও ইহা বাংলা ভাষার সহিত বিনা বাধায় মিশিয়া গিয়াছে। তবে ইহারা বাঙালী বা বাংলাদেশী নহে। 'বাঙালী' বা 'বাংলাদেশী' ঝগড়া আদতে প্রীতির নহে ভীতির সংলাপ। ধৈর্য ধারণ করুন, ইহা আপনা আপনি সমাধা হইয়া যাইবে। সূর্যমামা, পণ্ডিত কাকা ও ভাষাবিদ পিশে মহাশয়–না ভুল কহিলাম। আজকাল মামা

www.pathagar.com

কাকা চাচা পিশে ইত্যাদি শব্দ গ্রামীণ হইয়াছে, ইহা এক শব্দে প্রকাশিত হইবে "আংকেল" বলিয়া। তাই বলা যাইতে পারে সূর্য আংকেল, পণ্ডিত আংকেল আর ভাষাবিদ আংকেল মিলিয়া সময়ের মাপজোকের অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় অকাতরে দান করিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে সময়, কাল, টাইম, দণ্ড, লগ্ন, বেলা, ওয়াক্ত (অক্ত), ক্ষণ, মুহূর্ত, তিথি, সেকেন্ড, পল, বিপল, অনুপল, মিনিট, ঘণ্টা, প্রহর, অর্ধপ্রহর, যাম, যামার্ধ, পলক, লহমা, নিমেষ, নিমিষ।

সময় চলিয়া গেলে হয় অতীত, চলিতে থাকিলে বর্তমান এবং আগত সময় হইল ভবিষ্যত।

সময়কে যেমন এক যায়গায় ধরিয়া রাখা যায় না, সময়ও তেমনি বহু নাম ধারণ করিয়াছে।

সময়ের আসল হোতা সূর্যকে লইয়া। সূর্যের উদয় অস্ত নহে, সূর্যকে দেখা না দেখাকে ঘিরিয়া সময় নানা তালবাহানা সৃষ্টি করিয়াছে। এই তালবাহানাকে অন্যান্যরা A.M.P.M. দিয়া সমাপ্ত করিয়াছে। রেল কোম্পানী ১১টা ১২ টা ১৩টা দিয়া শেষ করে। কিন্তু অন্যান্যরা ভোর সকাল মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন পূর্বাহ্ন ইত্যাদি প্যাঁচের প্যাঁচাল শেষ করেন নাই। এই প্যাঁচাল শেষ না হইবার জন্য দায়ী অতি পণ্ডিতি ব্যাপার জড়িত রহিয়াছে।

সূর্যের দেখা না দেখার উপর সময়ের নির্ভর ঘড়ি আগাইয়া পিছাইয়া যায়। এ আগানো/পিছানো লইয়া বর্তমান সাহিত্যে অনেক কাহিনী রচিত হইয়াছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে লক্ষণ সহ অনেকেই বিপক্ষ দলের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইলেন, আঘাত প্রাপ্তদের বাঁচাইয়া আনার জন্য হনুমান বিন্ধ্যমাধব পর্বতে গমন করিলেন এবং পর্বতের নিকট স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাম লক্ষণ রণে, পড়েছেন দুইজনে
অপাঙ্গে ঔষধ কর দান ।।
সুগ্রীব অঙ্গদনল আর যাত মহাবল
পড়ে আছে মৃতদেহ প্রায়।
তুমি হয়ে দয়াবান মহৌষধি কর দান
বাঁচে সবে তোমার কৃপায়।।

(রামায়ণ)

কিন্তু পর্ব্বত মানে না উপদেশ, রাত শেষ হইবার পূর্বে ঔষধ আনিতে হইবে। হনুমান পর্বতের উপহাসে বিচলিত না হইয়া চড় চড় শব্দে লতাপাতা ছিঁড়িতে লাগিলেন। পর্বতের টনক নড়িল। অবশেষে ঋষির আগমন ঘটিল। চারি প্রকার ঔষধ বিশল্যাকরণী আর সুবর্ণকরণী, অস্থি-সঞ্চারণী আর মৃতসঞ্জীবনী। এই চারি ঔষধ লইয়া হনুমান চারিদ্বারে ভ্রমণ করিবে স্থানে স্থানে।

www.pathagar.com

(কৃত্তিবাস রামায়ণ)

কথিত আছে যে এই কাজ করিবার সময় হনুমান দেখিলেন সূর্য উঁকি দিতে চেষ্টা করিতেছে। কী করিবেন? রাত্রির মধ্যে এই ঔষধ পৌঁছাইতে হইবে। তাই তিনি অপারগ হইয়া সূর্যকে টানিয়া লইয়া বগলে রাখিলেন।

বিশল্যাকরণী সুবর্ণকরণী অস্থিসঞ্চারণী আর মৃত সঞ্জীবনীর গন্ধে আঘাত প্রাপ্তরা নতুন জীবন পাইল। আর হনুমান সূর্যকে যখন মুক্তি দিলেন তখন লংকায় সূর্যের অবস্থান হইল 'মধ্যাহ্নে'। আর আধুনিক যুগে লালসালু উপন্যাসের নায়ক ভণ্ড মজিদ এ সূর্যের ছায়াকে নিয়া আসল পীরকে নাস্তানাবুদ করিয়াছিল।

আওয়ালপুরের নতুন পীর সূর্যকে ধরিয়া রাখার ক্ষমতা রাখেন। মতলুব মিয়া উদাহরণ দিয়া বলে, "হয়ত তিনি এমন এক জরুরী কাজে আটকে আছেন যে ও ধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাহলে কী হবে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না হুকুম দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য আঙ্গুল নড়তে পারে না।" (লালসালু)

ইহার পরের কথা হইল –

"নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাৎ সারা মাঠটা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠলো। শত শত নামাজরত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের মত তীক্ষ্ণতায় নিঃসঙ্গ একটি গলা আর্তনাদ করে উঠলো।

সে কণ্ঠ মজিদের।

যতসব শয়তানী বেদাতী কাজ কারবার। খোদার সঙ্গে মসকরা। মজিদ বল্ল,এটা কিসের নামাজ।

মুরিদ কহিলঃ কাহে জোহরকা।

মজিদ পুনরায় রাগান্বিত হইল। সূর্যের ছায়া মাপা শুরু হল.... ছায়ার নাগাল পাওয়া গেল না। তখন সুযোগ বুঝে মজিদ কহিলঃ

কেন তোগে পীর ধইর‍্যা রাখবার পারল না সুরুজটারে.. এই বলে মজিদ গণ্ডগোল বাধিয়ে দেয়। তাই দেখা গেল সূর্যকে ধরিয়া রাখিয়া হনুমান যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্তদের বাঁচাইয়াছিলেন আর মজিদ সূর্যের ছায়া মাপিয়া পীরকে জব্দ করিয়া নিজের বুজরুকী দেখাইল। আমরা সূর্যের বুজরুকী যেমন দেখিতে চাহি না অপরদিকে পণ্ডিতদের পূর্বাহ্ন-অপরাহ্নের ঠ্যালা সামলাইতে চাহি না, সময়ের প্রতিশব্দগুলি শব্দ ভাণ্ডারে থাকুক। ঘণ্টা-মিনিট–সেকেন্ড বলিলে যদি আমাদের জ্ঞাত না যায় তবে এরই সাথে A. M. P. M. (এ, এম, পি, এম,) যোগ করাও দোষনীয় নহে। ইহাতে বাঙ্গালীত্ব বা বাংলাদেশীয় কোনটা হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

□ ২০ অক্টোবর '৯৫

www.pathagar.com

যত দোষ নন্দ ঘোষ

ভুল ও ফুল শব্দ দুইটি প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রেমের কবিতা যে দেশের হোক না কেন 'ফুল' ও 'ভুল' সব দেশে বিরাজ করিয়াছে। প্রেম শুরু হয় 'ফুলের' আদান প্রদানের মাধ্যমে আর যখন বিচ্ছেদ হয় তখন একে অপরের মধ্যে খুঁজিয়া পায় ভুল। একে অপরকে ভুলিয়া যাওয়ার জন্য আকুতি জ্ঞাপন করে। প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনে এই ভুলের আকুতিকে মধুর বেদনা বা ইংরেজীতে Sweet Pain নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রেম ভালবাসাকে ভুল হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। দিব্য জ্ঞানীগণ কহিয়া থাকেন, মানুষ মাত্র ভুল করে। শয়তান আর ফেরেস্তা ভুল করে না, মানুষ ভুল করে। ভুল মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

স্কুলের শিক্ষক মহাশয় কহিতেন, ভুল বানান 'ভূল' লিখিও না। কিন্তু কি আশ্চর্য। ভুল হইয়া থাকে। ভুলকে ভুল হিসাবে চিহ্নিত করিতে পারার মধ্যে মহত্ব রহিয়াছে। ভুলকে ভুল হিসাবে স্বীকার করিলে ভুল ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ভুলকে ভুল হিসাবে চিহ্নিত করিতে না পারিলে ভুল 'ভূল' হইয়া মানুষের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে। ভুলের ভূত ঘাড়ে চাপিয়া বসিলে সে ভূতকে সরিষা পড়া দিয়া ওঝার বাবাও তাড়াইতে পারে নাই, পারিবে না। বাস্তব ভূত মানুষকে যতখানি সর্বনাশ করিতে না পারে উহার চাইতে ভুলের ভূত মানুষকে সর্বনাশের চরম সীমানায় পৌছাইয়া দেয়। ইংরেজরা 'ভুল' হইলে 'সরি' বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। আমাদের দেশে 'সরি' বা দুঃখিত শব্দটি কণ্ঠনালী হইতে প্রকাশ হইতে বড়ই কষ্ট হয়। ভিখারীদের বিদায় করিবার জন্য বিনয় জড়িত কণ্ঠে কহিয়া থাকি, মাফ কর/ আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ কর।

ভুলের গল্প বলিতে যাইয়া একব্যক্তি কহিল, আমি এতই ভুলো যে সে দিন বিছানায় নিজের লাঠিটাকে শয়ন করাইয়া নিজে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বড় বড় বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কবি অনেক সময় কাজে এমন মগ্ন থাকিতেন যে তাঁহারা খাওয়া দাওয়া ভুলিয়া যাইতেন। কিন্তু কোন নির্বোধ লোক আজ পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া ভুলিয়া গিয়াছে এমন কোন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

www.pathagar.com

ভুল সব সময় সর্বনাশী ব্যাপার নয়। অনেক সময় ভুল অনেক সুফলও বহন করিয়া আনে। কলম্বাসের 'আমেরিকা' আবিষ্কার একটি ঐতিহাসিক ভুল যাত্রার ফসল। তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন 'ইন্ডিয়ার' দিকে, কিন্তু পৌছিলেন আর এক দেশে। তিনি জানিতেন ইন্ডিয়ার লোকজন 'কালো' আর যে দেশে আগমন করিলেন দেখিলেন তাহারা সকলে 'রাঙা'। তাই তিনি তাহাদিগের নামকরণ করিলেন `Red Indian`

বহু জ্ঞানী ব্যক্তি ভুলকে জীবনের এক মহাদিক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষের চাওয়া পাওয়াও একটি ভুল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,

যাহা চাই ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

কাক ভুল করিয়া কোকিলের ডিমে তা দিয়া যে বাচ্চা সৃষ্টি করে তার স্বর কিন্তু কদর্য নহে, উহার স্বর হৃদয় হরণ করে। হজরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যে আমার একটি ভুল আমাকে উপহার দিবে আল্লাহর করুণা তাহার উপর বর্ষিত হইবে।

পাকিস্তান হইতে বাংলাদেশ এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমাদের কোন রাজনৈতিক নেতা বা দল বিপর্যয়ের মুখেও স্বীকার করেন নাই যে তাহারা ভুল করিয়াছেন বা তাহাদের ভুল হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর উদাহরণযোগ্য অনেক দেশের বড় মাপের নেতা/নেত্রী ও দল 'ভুল' হইয়াছে বলিয়া জাতির নিকট ক্ষমা চাহিয়া দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। ভারতের মহিয়ষী নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভোটে পরাজিত হইয়া পরে নিজের ভুল স্বীকার করিয়া দ্বিগুণ শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন।

সে দিন সংবাদ পত্রে দেখিলাম জাপানের মত দক্ষ দেশে চিকিৎসকদের ভুল হইয়া গেল। ভুলে ফুসফুসের রোগী লিভার অপারেশন আর লিভার অপারেশনের রোগী ফুসফুস অপারেশনের থিয়েটারে প্রবেশ করাইয়াছে। অপারেশন করিয়া ডাক্তারগণ থ বনিয়া গেলেন। ডাক্তারগণ অবশ্যই ভুল স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের দেশে কেহই ভুল স্বীকার করিতে রাজী নহেন। 'ভুলের' মহৎ গুণের কথা আমাদের কিতাবে রহিয়াছে। ব্যবহারিক জীবনে নাই। কেহ ভুল স্বীকার করিলে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাহিলে মানুষ ছোট হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা যেন 'দুর্বলের' আত্মস্বীকৃতি। মহত্বের কোন গন্ধ নাই। আমাদের দেশে যাহারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বড় বড় অফিসার হইয়াছেন তাঁহারা যেমন তেমন ছাত্র ছিলেন না। তাঁহারা গো গবেট ছাত্র হইলে কি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হইতে পারিতেন? স্কুল কলেজের বারান্দা না ঘুরিয়া মন্ত্রী মিনিষ্টার হইতে পারা যায়। ইহা যে আমাদের দেশের ব্যাপারে উহা নহে। অনেক বড় বড় দেশের বড় বড় মন্ত্রীর কোন ডিগ্রী নাই। ভুল স্বীকার

www.pathagar.com

আমাদের দেশের ইতিহাসে নাই। সে জন্য অনেক ভুল জমা হইয়া আমাদের জীবনে অনেক ভূত চাপিয়া বসিয়াছে।

এক বুড়ী অপর বুড়ীর চুল পাকা দেখেন। কিন্তু যাহার চুল সব পাকিয়াছে তিনি নিজের চুল পাকা দেখিতেছেন না। আমাদের অতীতের বড় মাপের কবি মাইকেল, রবীন্দ্র, নজরুল নিজেরা নিজদের ভুল স্বীকারে অমর কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাহাদের ভুল স্বীকারের কবিতা সমূহ বাংলা সাহিত্যের অমর কবিতা। যেমন মাইকেল মধুসূদনের 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন..। আমাদের দেশে ভুল কেন স্বীকার করা হয় না বা কেন ভুল ভাঙ্গে না ইহা একটি গবেষণার বিষয়। আমাদের রাজনৈতিক নেতা বা রাজনৈতিক দল নিজেরা নিজদের কোন কর্মকাণ্ডকে ভুল বলিয়া চিহ্নিত না করিয়া অন্য জনের ভুল দেখাইয়া থাকে। কিন্তু তাও দেখা গিয়াছে সে ভুলও দেখানো হইয়াছে 'হেয়' করিবার অভিলাষে। যাহারা ভুল দেখেন তাহারা শুদ্ধ পথটা দেখাইতে পারেন না। যাহারা শুদ্ধ পথ দেখাইতে পারে না তাহাদের প্রদর্শিত ভুলগুলি আদতে আরো চরম ভুল ছাড়া আর কিছুই নহে। 'যুক্তিতেই মুক্তি প্রযুক্তিতেই উন্নতি' এর বিকল্প রাস্তা আজ পর্যন্ত কেহ যদি দেখাইতে পারেন তবে আমি উল্লেখিত 'শ্লোগান' আদালতে হলফনামা দিয়া প্রত্যাহার করিয়া নিব।

ভুলকে স্বীকার না করিয়া যুক্তি কোন দিন বাসা বাঁধিতে পারে না। প্রযুক্তি সেই দেশে বিকশিত হইতে পারে না। সেই দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্তিও সহজ নহে। ইহজাগতিক কর্মকাণ্ডে চিন্তা চেতনায়, ভুল শুদ্ধ থাকিবে। ইহজাগতিক সুঃখ দুঃখের সহিত ভুল শুদ্ধ জমজ ভাইয়ের মত অবস্থান করে। ভুল নিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা বহু উচ্চাঙ্গের কথা কহিয়াছেন, 'ভুলকে' ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ খয়রাত করিয়াছেন। কিন্তু ভুলের মাশুল বলিয়া একটি কথা রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক নেতাদের ভুলের জন্য বহু দেশে সর্বনাশ টানিয়া আনে। বিভিন্ন দেশে নেতাদের ভুলের জন্য দেশ জাতি শেষ হইয়া যায়। ইহার বড় এবং সমকালীন উদাহরণ হইতেছেন গরবাচেভ। যাহার একটি ভুলের জন্য শুধু রাশিয়া তছনছ হয় নাই বিশ্বের রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও তাহাদের প্রচার মাধ্যম সমূহ সমাজতন্ত্রের দোষ দিতেছে কিন্তু উহা সমাজতন্ত্রের ভুল নহে গরবাচেভের 'ভুল'।

ভুলের মাশুল দিতে আমরা রাজী নহি। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ কখনো ভুল করে নাই। ভুল করিয়াছেন যাহারা তাহারা কি ভুল স্বীকার করিবেন? তাহারা ভুল স্বীকার করিলে আমাদের আর ভুলের মাশুল দিতে হইবে না।

❐ ৫ই মার্চ '৯৩ ইং

www.pathagar.com

অসিজীবী বনাম মসীজীবী

আমাদের ইস্কুলে একদা বিতর্ক সভায় বিতর্কের বিষয় ছিল অসি বড় না মসী বড়। অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্ক বিতর্ক চলিল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হইল যে অসি অর্থাৎ তলোয়ার বড় নহে, কলমই বড়। ছাত্রজীবনে সেই বিতর্ক সভার বিতর্ক বিষয়ের মর্মকথা হজম করিতে পারি নাই।

কর্মজীবনেও আসিয়া দেখিলাম অসি বড় নহে মসী বড়। মসী নিজেরটার মূল্য বেশী নহে, অপরের মসী বেশী মূল্যবান ও শক্তিশালী। অপরের মসীকে হাত করিতে না পারিলে প্রতি পদে পদে আপনাকে হোঁচট খাইয়া প্রাণান্ত হইতে হইবে।

পারমিট, লাইসেন্স, চাকরীর নিয়োগপত্র সবকিছুই হইল একটি মসীর কয়েকটি আঁচড়।

যত বড় অফিসার তাহার মসীর আঁচড়ের মূল্য ততই বেশী।

মন্ত্রীর আঁচড় হইলেত কোন কথা নাই, আরব্য উপন্যাসের আলাউদ্দিন তাহার আশ্চর্য প্রদীপে ঘষা মারিলে বাড়ী ঘর খানাপিনা আসিয়া হাজির হইত। বর্তমান যুগে আমাদের দেশে আপনার আকাঙ্ক্ষার আবেদনে যদি কোন মন্ত্রীর মসীর একটি আঁচড় লাগে তখন আপনার সৌভাগ্য আরব্য উপন্যাসের আলাউদ্দিনকেও হার মানাইবে। মন্ত্রী প্রদত্ত মসীর আঁচড় আপনাকে কি দিতে পারে না? মসী নারীকে পুরুষ আর পুরুষকে নারী করা ছাড়া আর সব করিতে সক্ষম। গাড়ী, বাড়ী, চাকরী, পদোন্নতি, ব্যাংক ঋণ–মন্ত্রী বা উর্ধ্বতন প্রধান/নির্বাহী কর্মকর্তার একটি আঁচড়ে

www.pathagar.com

পাওয়া যাইবে। এমন কি আপনি যদি বিনা খরচে হজ্জব্রত পালন করিতে চাহেন তবে একটি মসীর আঁচড় সংগ্রহ করুন।

তুষার কান্তি ঘোষ 'অসি বড় না মসী বড়' নামক একটি রম্য রচনা লিখিয়াছিলেন। সে রম্য রচনায় তিনি এক অসিজীবী (মিলিটারী) এবং মসীজীবী কেরানীর মতদ্বৈধতার কাহিনী বর্ণনা করত অসিজীবীকে মসীজীবীর নিকট পরাস্ত হইবার কাহিনী সরসভাবে বিধৃত করিয়াছেন।

জনৈক অসিজীবী পেনশন আনিবার জন্য মসীজীবী পেনশনদানকারী অফিসারের নিকট গমণ করিয়াছিল। অসিজীবী অফিসারটি কোন কারণে পেনশন আনিবার দিবসে হঠাৎ রুক্ষ হইয়া উঠিল। কেরানী কহিল, একটু অপেক্ষা করুন।

অপেক্ষা করিবার কথা শ্রবণ করিবার পর অসিজীবীর মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। সে কহিল, জানো আমি কে? এক্ষুনি এককোপে তোমার মুণ্ডু উড়াইয়া দিতে পারি। মসীজীবীও মেজাজ সপ্তম সুরে উঠাইয়া কহিল, আমার তলোয়ার নেই, সুতরাং তোমার মুণ্ডু হয়ত কাটিতে পারিব না। কিন্তু এই পেন্সিল দিয়া তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিব। মসী দিয়া অসিজীবীর কেমন করিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়াছিল ইহা কহিতে যাইয়া তুষার বাবু জানাইলেন যে ওই মসীজীবী অসিজীবীকে কহিল, আপনার চেহারার সহিত আমাদের এখানে রক্ষিত পরিচয় পত্রে মিল নাই।

কেরানী অসিজীবীকে হাঁ করাইয়া তাহার দন্তসমূহ গুনিয়া কহিল, আপনার বত্রিশটি দাঁত রহিয়াছে অথচ আমাদের নথিতে আপনার দুইটি দাঁত নাই। শিশু বয়সে দাঁত পড়িয়া গেলে পুনরায় দাঁত গজায় কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দাঁত গজাইল কেন? পুরানো অফিস হইতে পরিচয়পত্র আনিবার জন্য তাহাকে বলা হইল।

অসিজীবী অফিসার ইহা সামান্য ব্যাপার মনে করিয়া পেনশনদানকারী কেরানীর কথায় চুপ করিয়া চলিয়া গেল। মাসের পর মাস চলিয়া যাইতে লাগিল, পুরাতন অফিস হইতে কোন উত্তর আসিল না। অসিজীবীর স্ত্রী অফিসার মহোদয়কে জ্বালাতন করিয়া তুলিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া অফিসার অত্যন্ত মুষড়িয়া পড়িল। একবৃদ্ধ ভদ্রলোক কহিলেন, হাফব্রেড ইজ বেটার দ্যান নো ব্রেড–অর্ধং ত্যাজতি পণ্ডিত–অর্ধেক নহে কিছু ত্যাগ করিলেই চলিবে। এই বলিয়া বৃদ্ধ লোকটি অসিজীবী অফিসারকে কহিলেন, আজকাল পেইনলেস এক্সট্রাকশনের ব্যবস্থা হয়েছে। সে তোমার দাঁত তুল্লে তুমি জানতে পারবে না। অবশেষে অসিজীবী দাঁত তুলিয়া মসীজীবীর নিকট হার মানিয়াছিল।

www.pathagar.com

আদতে মসীর জোর বর্তমানে অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন অফিস আদালতে ঘুষ আদায়ের প্রধান অস্ত্র হইতেছে মসী বিরতি। যতক্ষণ ঘুষ বাহির হইবে না, ততক্ষণ মসীর আঁচড় দিতে অফিসারের হুঁশ উদয় হইবে না।

আজকাল হাসি বলুন আর ফাঁসী বলুন সর্বক্ষেত্রে মসীর দাগ ফেলিতে হইবে।

কয়েক ক্ষেত্রে মসীর কোন কর্ম নাই। সেই ক্ষেত্র হইল চোর দালাল, বাটপার, মস্তানদের মস্তানীর কোন দলিল সম্পাদিত হয় না। অর্থাৎ তাহারা কোন প্রকার মসীর চিহ্ন রাখিতে রাজী নহে। তাহারা রক্ত চিহ্ন অসির দাগ রাখে, মসীর দাগ নহে।

আমাদের দেশে সাংবিধানিক নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারে মসীর ছাপ মারিতে হইবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন যদি নির্বাচন হয় তখনও মসীর ছাপ মারিতে হইবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক লড়াই চলিতেছে ইহাও অসির লড়াই নহে মসীর লড়াই। মসীর জোরেই খুশী হইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। আমাদের দেশের জন্য অসি বড় নহে, মসীই বড় (জ্ঞানীর মসী নহে)।

কিন্তু বড় বড় শক্তির নিকট মসী বড় নহে, অসি বড়। মার্কিন মুল্লুক অসি ও মসী দুইটিকে হাত করিয়া লইয়াছে। তাহারা যেখানে মসী সেখানে অসি চালাইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা মসী দিয়া শান্তি মানবাধিকারের কথা প্রকাশ করে, অপর দিকে অসির ব্যবসা করিয়া অনুন্নত দেশের সম্পদ হাতড়াইয়া লইয়া থাকে। সাপ হইয়া দংশন করে ওঝা হইয়া ঝাড়ে।

উন্নত দেশসমূহ মসীকে ব্যবহার করে সুবুদ্ধির তাগাদায়, আর অনুন্নত দেশে মসী ব্যবহৃত হয় কুবুদ্ধির তাড়নায়।

আমাদের মসী আজ সম্পদ নহে, ইহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'আপদ', হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুষার বাবু এবং আমাদের অগ্রজ প্রাজ্ঞগণ বলিয়াছেন, অসি হইতে মসী বড়। পারমিট, লাইসেন্স, চাকুরী, গাড়ী, বাড়ী, ব্যাংক ঋণ, সম্পদ বৃদ্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মসী অপাত্রে কুপাত্রে ব্যবহৃত হইতেছে, করিতেছি। অসি ও মসী আমাদের সম্পদ নহে, আমাদের বিপদ। মসি বড় লোকের জন্য হাসি, আমাদের জন্য ফাঁসি। (আমার আলোচনা হইতে পবিত্র মানুষদের মসী বাদ যাইবে)।

❐ ২রা ফেব্রুয়ারী '৯৬

www.pathagar.com

তুমি আমি না আমি তুমি

একদা এক গ্রামে এক বোকা লোক বাস করিত। লোকজনের ভীড়ে সে কখনো কোথাও গমন করিত না। ঘরের বাহির হইলে সে হারাইয়া যাইবে এই ভয়ে সে ঘরের বাহির হইত না।

এক দিবস তাহার স্ত্রী তাহাকে হাট হইতে পান আনিবার জন্য অনুরোধ করিল। বোকা লোকটি কহিল হাটে গমন করিলে যদি হারাইয়া যাই তখন কি করিব?

স্ত্রী ঃ কোন চিন্তা নাই। আমি তোমার কোমরে একটি গামছা বাঁধিয়া দিব। এই গামছা দেখিয়া তুমি তোমাকে চিনিতে পারিবে।

বোকার স্ত্রী যথাযথভাবে তাহার কোমরে গামছা বাঁধিয়া দিল। কোমরে গামছা বাঁধিয়া বোকা হাটে গমন করিল। পান ক্রয় করিল। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল পান বিক্রেতার কোমরেও গামছা বাঁধা রহিয়াছে। ইহাতে সে ভীত হইয়া পড়িল। হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং কহিল "তুমি আমি-না আমি তুমি"।

হে সুহৃদ পাঠক! আমি ইতোপূর্বে বোকা ছিলাম। ইদানিং আমি এই নির্বাচনের প্রাক্কালে বোকা ভোটার হইয়া গিয়াছি। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্র নির্ভর করিতেছে বি, এন, পি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে। ইহারাই প্রধান শক্তি।

www.pathagar.com

আমি বোকা! ভোটার চিনিতে পারিতেছি না কোন জন আওয়ামী আর কোন জন বি, এন, পি।

পূর্বে বি, এন, পির নেতারা সাফারী পরিধান করিতেন আর আওয়ামী লীগারগণ মুজিব কোট পরিধান করিতেন। এই দুই পোশাক ইদানিং দেখা যাইতেছে না। সকলের মধ্যে পায়জামা পাঞ্জাবী সাধারণ পোশাক হইয়াছে।

অতীতে মুসলিম লীগ শেরোয়ানী পায়জামা আর জিন্নাহ টুপি পরিত। কংগ্রেসীরা পরিধান করিত খদ্দরের পোশাক। এই দুই পক্ষের প্রার্থীদের অনেকের মাথার টুপি শোভিত হইয়াছে। দরগাহ ও ধর্মীয় স্থানসমূহে তাহাদের গমনাগমন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দরগাহসমূহ এখন সকলের হইয়াছে।

শ্লোগানসমূহও একই প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।---- সালাম নিন--মার্কায় ভোট দিন। উড়ছে পাখী দিচ্ছে ডাক-- নিপাত যাক। নেতা আছে নি--আছে। কোন সে নেতা/নেত্রী .... অমুক অমুক।

অনুদান দেওয়া নিষেধ। কিন্তু আশা আর ভরসা দেওয়া নিষেধ নহে। আমাদের নেতৃবৃন্দ জানে বৈরাগী যেমন চিড়ার ছালার আশায় আশায় নৃত্য করে, নিরক্ষর নিরন্ন ভোটারবৃন্দও তেমনি আশার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া আছে।

দেখা যাইতেছে কোন দলই প্রকাশ্যে শক্তি না দেখাইয়া ভোটারদের প্রতি-ভক্তি দেখাইতেছেন। ভক্তিতে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর। অতএব ভক্তিবাদী এই দেশে ভোটারভক্তি নূতন মন্ত্র হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। লাগাতার হরতালের ফলে যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কায়েম হইয়াছে। এমনি প্রার্থীদের লাগাতার ভক্তি যদি নির্বাচনের দিন পর্যন্ত লাগিয়া থাকে তবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র কাঁঠালের আঠার মত লাগিয়া থাকিবে।

প্রার্থীদের ইদানিং এই ভোটারভক্তির গণেশ উল্টাইয়া যদি 'শক্তি' আসিয়া উপস্থিত হয় তবে কি হইবে। ইহা কহিতে পারিব না।

সীতার অগ্নি পরীক্ষার সময় আগুন জ্বালানো হইল। সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিবার সময় সীতা সাথে করিয়া কিছু ঘি লইয়া গিয়াছিল যাহাতে হুতাশন আরো প্রচণ্ডভাবে প্রজ্বলিত হইতে পারে। হায় হুতাশন! সীতাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ইহার পর মাটির কন্যা সীতাকে তাই অবশেষে মাটিই (ধরিত্রী) দ্বিধা হইয়া নিজের বুকে আশ্রয় দিয়াছিল।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলের সতীত্ব পরীক্ষার কোন পরীক্ষা আমাদের দেশে নাই। তাহাদের পরীক্ষা হইল ভোট পরীক্ষা। এই পরীক্ষা পাশের জন্য নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

গৃহীত নতুন কৌশলসমূহ অনেক সময় নতুন জীবাণু বহন করিয়া আনে এবং রাজনীতি নিজেই অসুস্থ হইয়া পড়ে। প্রাচীন গ্রীসে নবজাত বিকলাঙ্গ শিশুদেরকে বনের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলা হইত। আধুনিক বাংলাদেশে বিকলাঙ্গ শিশুর ব্যবসা হইয়া থাকে। পোলিও রোগে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য ইদানিং ব্যাপক পোলিও টিকা দেওয়া হইতেছে। জাতীয় নেতা/নেত্রীরাও শিশুর মুখে পোলিও খাওয়াইতেছেন।

অসুস্থ রাজনীতি/বিকলাঙ্গ রাজনীতির যে জীবানু প্রবেশ করিতেছে উহার জন্য কি কোন টিকা নাই। বি. জে. পি তথা বাংলাদেশ যোগদান পার্টি যেই হারে বেগবান হইয়াছে উহাতে মনে হয় এই নির্বাচনের পরে অসুস্থ/বিকলাঙ্গ রাজনীতি আরো বিকাশ লাভ করিবে। অতএব উল্লেখিত দলদ্বয়ের নিকট একান্ত আরজ এই যে, আগামী নির্বাচনে আপনারা যাহারাই নির্বাচিত হউন না কেন আপনারা আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করিবার জন্য রাজনৈতিক পোলিও টিকা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। আমরা বোকা ভোটারবৃন্দ বুঝিতে পারিতেছি না আপনারা কোন দলের না 'কোন্দলের'। ভোটের বাজারে প্রার্থী না হারাইয়া ভোটার হারাইয়া যাইতেছে।

আপনারা মেনিফেস্টোতে যাহা বলিয়াছেন উহা কি সত্যই আপনাদের শপথ না মুদ্রিত শব্দমালা? যদি উহা আপনাদের অন্তরের অঙ্গীকার হইয়া থাকে তবে কি ভাবে ৫ বৎসরে এই 'শপথ' রূপায়ন করিবেন উহা ব্যাখ্যা করুন। উহাতে রাজনৈতিক হাঙ্গামাও কমিবে অপর দিকে রাজনৈতিক তামাশা দূরীভূত হইবে।

পাদটীকা ঃ ভারতের নব্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী মহোদয় নিজের পছন্দের গানসমূহ টিভিতে প্রচার করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহার পছন্দসই গানের মধ্যে

তু হিন্দু বনেগা না
মুসলমান বনেগা
ইনসান কি আওলাদ হ্যায় ইনসান বনে গা
গানটি কি অন্তর্ভুক্ত হইবে?

□ ২৪শে মে ১৯৯৬

www.pathagar.com

সত্যবাদী মিথ্যুক!

কথিত আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্য শরাবিষ্ট বেতালকে লইয়া গমন করিতেছিলেন। এমন সময় বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, ওহে বীর পুরুষ! তুমি কে, আমায় কি নিমিত্তে কোথায় লইয়া যাইতেছ বল।

ভূপতি কহিলেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল নামক যোগীর আদেশ অনুসারে তোমায় তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইতেছি।

বেতাল কহিল, মহারাজ! মূঢ়, নির্বোধ ও অলসেরা কেবল নিদ্রায় আলস্যে ও কলহে কালহরণ করে। কিন্তু বুদ্ধিমান, চতুর, পণ্ডিত ব্যক্তিরা সদালাপ, শাস্ত্রচিন্তা ও সৎকর্ম অনুষ্ঠান দ্বারা আনন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। (ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি)।

এই বেতালকে বেতাল পঞ্চবিংশতি গল্পের বিবেক বলা যাইতে পারে।

প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত আমরা বহু বিবেকওয়ালার কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি।

ঢাকার এক গাড়োয়ানকে জনৈক যাত্রী কহিল, ওহে! অমুক স্থানে কি গমন করিবে?

গাড়োয়ান ঃ আলবৎ গমন করিব।

যাত্রী ঃ ভাড়া কত হইবে?

গাড়োয়ান ঃ দুই টাকা।

যাত্রী ঃ এক টাকা হইবে না?

গাড়োয়ান ঃ আবে হালায়, আর কইয়েননা, ঘোড়ায় হাসবো----।

www.pathagar.com

গাড়োয়ান ঘোড়ার বিবেকের কথা রসিকতার ছলে কহিয়া উঠিলেন।

অতীতে রচিত রূপকথা হইতে জানা যায় পশু পাখী নানা প্রকার বিবেকের কথা কহিত। তাহারা রাজা বাদশাদের ভবিষ্যৎ কথা জানাইয়া দিতে পারিত। পশুপাখীদের ভাষা সকলে না বুঝিলেও সাধকগণ পশুপাখীদের ভাষা বুঝিতে পারিত।

বস্তুতপক্ষে পশু পাখীদের ভাষা নাই, ধ্বনি বা শব্দ আছে। শব্দ ভাষা নহে। শব্দ যদি ভাষা হইত তবে মোটরগাড়ীর গড়গড়নী, রেলগাড়ীর হিস হিস ঝম ঝম তাহাদের ভাষা হইত। ভাষা, ভাব ও বিবেকের একমাত্র অধিকারী হইল মানুষ। পশুদের ভাষা ও বিবেক উপমা উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইদানিং ভাব, ভাষা ও বিবেক ধনিক বণিক, ঋণ খেলাপী, আচার্য, উপাচার্য, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ (বিজয়ী ও পরাজিত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী), নব্য আঁতেল প্রমুখ এককভাবে অধিকার করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কাহাকেও ইহার ভাগ দিতে রাজী নহেন।

গরিবের কোন ভাব নাই। তাহাদের আছে 'অভাব'। গরিব তথা হা-ভাতের দলের ভাষা, আশা, বিবেকের নাম 'ভাত' আর তাহাদের নিরাশা দুঃখ ইত্যাদির নাম ক্ষুধা।

হিন্দি গানের একটি কলি হইল, 'ভুখ নে হামকো জনম দিয়া হায় মেহনতনে হামকো পালা।' আর এক বেরসিক ইহাকে উল্টাইয়া গাহিল, 'সুখ নে হামকো জনম দিয়া হ্যায় সুখ নে হাম কো পালা।' গানের প্রথম দু' কলি হইল শ্রমিক মজদুরের আর দ্বিতীয় অংশের গানটি হইল ঋণ খেলাপী ধনিক বণিকের সন্তানদের জন্য।

আর এক প্রকার বিবেক আমরা দেখিতে পাই যাত্রাগানে। এই বিবেক মঞ্চে আসিয়া অন্যায়কারীকে সাবধান করিয়া দেয় আর ন্যায়বানকে আশাবাদী করিয়া প্রেরণা যোগায়।

মীর জাফর পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ক্লাইভের সহিত যখন গোপন চুক্তি করিতেছিল তখন হঠাৎ তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এবং কহিল, "আমরা কি দেশকে বিক্রয় করিয়া দিতেছি?"

মীরজাফরের এই বিবেক ছিল দেশপ্রীতির নহে, ভয়ে কাঁপা এক কাপুরুষের আর্ত চিৎকার।

আমি কাহারো নাম উল্লেখ করিব না। পাকিস্তান হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিগত ৪৯ বৎসর ধরিয়া দেখিতে পাইয়াছি ক্ষমতাচ্যুত বা পদচ্যুৎ হইবার পর অনেকে বিবৃতি দিয়া থাকেন। আমি ইহা বিবেকের তাড়নায় করিয়াছি।

www.pathagar.com

কোন দল হইতে কখনো কাহাকে বহিষ্কার করিলে তখন তিনিও জোর গলায় কহিয়া উঠেন, আমি বিবেকের তাড়নায় সত্য কথা প্রকাশ করিতেছি।

ইহারা আসলে বিবেকবান নহেন, তাহারা হইলেন চতুর প্রতারক। ভাগ্যবান ভোগী পদচ্যুত হইবার পর কখনো প্রকৃত বিবেকবান হইতে পারে না। তাহারা আসলে সুযোগ সন্ধানী। তাহারা আর একটি নতুন সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাহারা সত্যবাদী মিথ্যুক।

সত্যিকার বিবেকবান হইলেন তাঁহারা, যাঁহারা ত্যাগী-সাধক এবং সত্য ভাষণের জন্য নির্যাতিত।

সত্যিকার বিবেকবানদের অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সত্যিকার বিবেকবানদের কোন 'লোভ' দিয়া ক্রয় করা যায় না। যদি ক্রয় করা যাইত তবে আমরা আধুনিক সভ্যতা ভোগ করিতে পারিতাম না। মধ্যযুগীয় অন্ধকারে বাস করিতে থাকিতাম।

আমাদের দেশে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা আছে। অসম্পূর্ণ রাজাকারের তালিকা আছে। দুর্নীতি দমন বিভাগে দুর্নীতিবাজদের তালিকা আছে। কিন্তু উঁচুপদে অবস্থান করিবার পর পদচ্যুতিতে মিথ্যা ভাষণ প্রদানকারীদের কোন তালিকা আমাদের দেশে এখনো সংকলিত হয় নাই। যাহারা বিবেকের দোহাই দিয়া নিজেদের অকর্ম কুকর্ম ঢাকিতে চাহেন, তাহাদেরও একটি তালিকা প্রকাশ হওয়া উচিৎ।

বর্তমান যুগে যদি বেতাল এই ধরাধামে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে আবির্ভূত হইত তবে কহিত, "ওহে মূঢ়গণ! তোমরা জানিয়া রাখ-বুদ্ধিমান চতুর পণ্ডিতগণ আর সদালাপ, সৎ চিন্তা, সৎ উপার্জন, সৎকর্ম না করিয়া বাক চাতুর্যে মানুষকে ঠকাইবে এবং নিজেদের আত্মোন্নতিকে পাকাপোক্ত করিবে। যত প্রকার ভোগ উপকরণ আছে তাহা ভোগ করিবে এবং সন্তান-সন্ততিগণ যাহাতে নির্বিবাদে ভোগ করিতে পারে উহার ব্যবস্থা করিবে। ওহে মূঢ়গণ, তোমরা জান না ইহারা একবার লাল আবার পরমুহূর্তে দালাল হইবে। ইহারা ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবে। গণতন্ত্র, আইনের শাসনকে (সামরিক আইন নহে) ইহারা ভয় করিবে। গণতন্ত্র আইনের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ভীতু প্রতারকরা পলায়ন করিবে-ইহার নাম ইতিহাস, ইহার নাম বাস্তবতা।"

পাদটীকাঃ অবশেষে টিকটিকির লেজ নেশাখোরদের নেশার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রাণীর বিষ্ঠাও তাহাদের নেশার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে সুপারিশ করা যাইতে পারে।

❑ ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

www.pathagar.com

শেয়ার কী পেয়ার

একদা দৈনিক আজাদী অফিসে সাধন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাদা, আপনি অনেক বৎসর নিজ গ্রামে চেয়ারম্যান ছিলেন। আপনার চেয়ারম্যান জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি?

তিনি কহিলেনঃ একদা এক বাড়ীর জমি-জমা, বিষয় সম্পত্তি ভাগ করিতেছিলাম। দুই ভাইয়ের মধ্যে সব কিছু সমান ভাগ করিয়া দিলাম। সমস্যা হইল একটি ঢেঁকি লইয়া। দুই ভাই একটি ঢেঁকিকে সমান ভাগে ভাগ করিবার জেদ করিতে লাগিল। জেদ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। অবশেষে দুই ভাইয়ের আপোষে আস্ত ঢেঁকিকে দুই টুকরা করিয়া কাটিয়া দুই ভাইয়ের সমান ভাগের জেদ বজায় রাখা হইল। জানা গিয়াছে পরবর্তীকালে সেই বাড়ীর নাম হইয়াছে ঢেঁকি কাটাদের বাড়ী।

দেখা গিয়াছে যে, গ্রামের অনেক সাধারণ মানুষ যাহাদের জমিই জীবিকার একমাত্র উৎস তাহারা কখনো কখনো হিংসা বিদ্বেষের জন্য বা আত্মমর্যাদার ছুয়া

www.pathagar.com

ঝাণ্ডা উঁচাইয়া রাখিবার জন্য জমিকে দাবার ছকের মত ভাগ করিয়া ফেলে। ইহাকে কেহ গ্রামীণ কৃষি সংস্কৃতির প্রভাব বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে জমি কখনো শক্ত হয়, আবার কখনো হয় নরম। এই শক্ত ও নরম মানসিকতা এ দেশের মানুষকে প্রভাবিত করিয়া তোলে। বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষি সংস্কৃতি পাল্টাইয়া গিয়াছে। বাঙালী একদা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগে অপারগতা দেখাইয়াছিল। কিন্তু এখন বাণিজ্যে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়াছে।

আমাদের দেশে নতুনকে বরণ করিয়া নিতে বড়ই উৎসাহী।

আমরা বুঝিতে পারিয়াছি মাওবাদ, লেলিনবাদ, মওদুদীবাদ, ফ্যাসীবাদ এই দেশে বরবাদ হইয়া গিয়াছে। এখন আসিয়াছে টাকাবাদ ও শেয়ারবাদ। অথবা টাকাইজম/মানিইজম, শেয়ারইজম।

টাকাইজম কি, ইহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই বলিলেই চলে।

শেয়ারইজম হইল বর্তমানের অত্যন্ত গরম মতবাদ। শেয়ার তথা শেয়ার বাজার ছিল একমাত্র ঢাকায়। মাত্র এক বছর হইল চট্টগ্রামে শেয়ার বাজার চালু হইয়াছে। বছর যাইতে না যাইতে শেয়ার বাজার দারুণ সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে।

শেয়ারকে শুধু কোম্পানীর শেয়ার হিসাবে ধরিলে চলিবে না, শেয়ার নিজেই একটি দর্শন, একটি মতবাদ। ইহা হাসাইতেও পারে, কাঁদাইতেও পারে। ফকিরকে রাজা আবার রাজাকে ফকিরও বানাইতে পারে। এই দর্শন সম্পূর্ণভাবে সেকুলার/ইহজাগতিক। অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের অনেক সন্তান এই নতুন মতবাদে দিন দিন দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইতেছে। এই দীক্ষা গ্রহণকারী নব্য সন্তানগণের উপর বিশেষ কোন ফতোয়া জারী হইতে দেখা যায় নাই। ফতোয়াবাজগণ এই ক্ষেত্রে দারুণভাবে চুপসিয়া গিয়াছে। এই বাজারে মেধাদের সম্মুখে গাধারা ঠাঁই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এক এক কোম্পানীর শেয়ারের তেজ এটম বোমা হইতে অধিক তেজী বলিয়া মনে হইতেছে।

শেয়ার বাজার এর সংবাদ না ছাপিলে চালু পত্রিকাও অচল হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শেয়ার ছাড়া আজ বাঁচিবার শক্তি নাই। বড় বড় এপার্টমেন্ট ক্রয়ও এক প্রকার শেয়ারে বসবাস। পর্যটন কর্পোরেশন শেয়ারে বিভিন্ন এলাকা দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

www.pathagar.com

শেয়ার মতবাদকে দীর্ঘদিন ধরিয়া যাহারা লালন পালন করিয়াছে তাহারা হইল পরীক্ষার নকলবাজবৃন্দ। নকলবাজী পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের শেয়ার আদান প্রদান করিয়া বন্ধুত্ব অটুট রাখিয়াছে এবং পাশ নামক সার্টিফিকেট জোগাড় করিতে সহজে সমর্থ হইয়াছে। চলতি বৎসরে এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের ধরন পাল্টাইয়া যাইবার জন্য পরীক্ষার হলে নকলের শেয়ারবাজার দারুণভাবে মার খাইয়াছে। নকলের জন্য বিখ্যাত পরীক্ষাকেন্দ্র তথা নকলের শেয়ার কোম্পানীগুলোতে শেয়ার সূচকের দারুণ পতন ঘটিয়াছে। এ কোম্পানীগুলোতেও পাশের কারবালা দেখা গিয়াছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের কিছু কিছু জায়গায় শেয়ারে রিক্সায় যাতায়াত করিতে দেখা যায়। হরতালের সময়ে রিক্সায় শেয়ারবাজার চাঙ্গা হইয়া উঠে। অদূর ভবিষ্যতে হরতালের সম্ভাবনা নাই বলিয়া রিক্সার এই শেয়ার বাজার আর উঠানামা করিবে না বলিয়া মনে হইতেছে।

শেয়ারইজম এত সেয়ানা যে, কোরবানীতেও ইহা সংযুক্ত হইয়াছে। আজকাল অনেকেই শেয়ারেই কোরবানী করিয়া থাকে (খাসি, ভেড়া, দুম্বা, ছাগী এই শেয়ারইজম হইতে বাদ পড়িয়াছে)।

যেখানে লাভ সেখানে শেয়ার, যেখানে ক্ষতি সেখানে শেয়ারের সেয়ানামী পৌঁছাইতে পারে নাই।

কথিত আছে যে, হযরত নিজাম উদ্দিন (রঃ) আউলিয়া প্রথম জীবনে একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন। তিনি ডাকাতি করিয়া জীবন যাপন করিতেন। একদা ডাকাতির সময় এক সাহসী লোক তাঁহাকে প্রশ্ন করিলঃ আপনি ডাকাতি করেন কেন?

নিজাম ঃ পরিবার পরিজন পোষণ করিবার জন্য।

ধৃত ব্যক্তি ঃ আপনার পরিবার পরিজন কি আপনার এ পাপ কাজের শেয়ার গ্রহণ করিবে?

নিজাম ঃ ইহাতো জানি না।

ধৃত লোকটিকে একটি গাছের সহিত উত্তমরূপে বাঁধিয়া তিনি স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। পরিবারের সকল সদস্যকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি আমার পাপের শেয়ার গ্রহণ করিবে?

তাহার পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যা এক সুরে ও স্বরে উত্তর করিলঃ না, না।

www.pathagar.com

ইহাতে নিজাম উদ্দিনের চৈতন্য উদয় হইল। তিনি ধৃত ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়া পরম আরাধ্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অবশেষে সংসারের শেয়ার ত্যাগ করিয়া নিজাম ডাকাত আউলিয়া হইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

এই পর্যন্ত নুনের শেয়ার নিতে চাহিলেও খুনের শেয়ার, আপদ-বিপদের শেয়ার, কিল-ঘুষির শেয়ার কেহ গ্রহণ করিতে রাজি হইবে না। মানুষ মাত্রই লাভে লোহা বহন করে, বিনা লাভে শোলাও বহন করিতে রাজি থাকে না।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তৈমুর লঙ যখন কোন দেশ আক্রমণ করিতেন তখন সেই দেশ বিনা বাধায় তাহার পায়ে লুটিয়া পড়িত। তৈমুর শিরাজনগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরীতে বাস করিতেন বিখ্যাত কবি হাফিজ। তৈমুর হাফিজকে দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন-

তৈমুর ঃ আপনি কি কবি হাফিজ?

হাফিজ ঃ আমি হাফিজ বটে। কেউ কেউ কবিও বলে থাকেন।

তৈমুর ঃ কেউ কেউ কবি বলে থাকে? তা বেশ, আচ্ছা কবি, একথা কি সত্যি যে আপনি লিখেছেন –

'আগার আঁ তুর্কা সিরাজী
বদস্ত আরদ দিলে মারা
বখালে হেন্দুয়স
সমরখন্দ ও বুখারারা?'

(যদি সে সিরাজসুন্দরী তুলে নেয়, মোর দিলভার/সমরখন্দ বুখারা দেই বদলে তার গালের তিলটার)।

হাফিজ ঃ সত্যই।

তৈমুর ঃ বুখারা সমরখন্দ আমার প্রিয়তম নগর। এর সমৃদ্ধি সাধনের জন্য আমি দুনিয়া তছনছ করে ফিরছি। আর সে বুখারা সমরখন্দকে আপনি দান করছেন আপনার প্রিয়ার একটি ছোট তিলের জন্য?

হাফিজ ঃ জাহাপনা, ঐ রকম অতি দানের জন্যইতো আজ আমার এ দুর্দশা।

তৈমুর ঃ বাহ! বাহ! তোফা বলেছেন। খাজাঞ্চী! এই কবিকে দশ হাজার আশরাফি দিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস। (ইতিকাহিনীঃ ইব্রাহিম খাঁ)

www.pathagar.com

হাফিজ তাহার প্রিয়ার তিলের জন্য সমরখন্দ-বোখারা দিতে চাহিলেও সে প্রিয়ার প্রেমে কাহাকেও শেয়ার প্রদানে কি রাজি হইতেন? না প্রেমের শেয়ার দিতে কেউ রাজি থাকে না। উমর খৈয়াম শেয়ারইজমের ঘোর বিরোধী। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে নগদ নারায়ণের পূজারী। তাই তিনি কহিয়াছেন–

রাজ্য সুখের আশায় বৃথা
কেউবা কাটায় বরষ মাস,
স্বর্গ সুখের কল্পনাতে
পড়ছে কারো দীর্ঘশ্বাস।
নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতায় শূন্য থাক
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে
মাঝখানে যে বেজাইয়া ফাঁক।

খেলাধূলায়ও শেয়ারইজম প্রবেশ করিয়াছে। যেমন আবাহনী ক্লাব লিমিটেড।

নরনারীর প্রেমে শেয়ারইজম ব্যর্থ হইলেও শেয়ারছাড়া প্রেমময় পৃথিবী অপ্রেম হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এক দেশের সহিত অন্য দেশের বহু রকম প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য শেয়ার রহিয়াছে। এই প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য শেয়ারকে অস্বীকার করিয়া কোন দেশই একক কোম্পানী হইতে পারিবে না। এই শেয়ারের জন্য মৈত্রীভাব বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন গঙ্গার পানিতে আমরা শেয়ার চাহিতেছি। কারণ আমরা গঙ্গার ভাটি এলাকায় অবস্থান করি।

ফ্রান্স কূটকৌশল করিয়া মিশরের সুয়েজ খাল খনন করিয়াছিল। বৃটেন দেখিতে পাইল যে, এই বিরাট সুযোগ হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। তাই তড়িঘড়ি করিয়া বৃটেন সুয়েজ খাল কোম্পানীর অনেক শেয়ার কিনিয়া লইয়াছিল।

একদা আমাদের দেশে জাসদ নামের একটি রাজনৈতিক দল শ্রমজীবী কর্মজীবীদের রাজনৈতিক শেয়ারের ভিত্তিতে এক রাজনৈতিক শ্লোগান চালু করিয়াছিল। আধুনিক অর্থনীতি শেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া বিকশিত হইয়াছে। ব্যাংক বীমা ছাড়া বিশ্ব অর্থনীতি অচল। ব্যাংক বীমার ভিত্তিই হইল শেয়ার।

বিভিন্ন দেশে যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইয়া থাকে উহাও এক প্রকার ক্ষমতার শেয়ার ভাগাভাগি। ভারতের বর্তমান সরকারও শেয়ার সরকার। ভারতের বর্তমান সরকার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়াতে শেয়ারী সরকার হইয়াছে। শেয়ারে

www.pathagar.com

ভাগাভাগিতে মতানৈক্য হইলে শেয়ারী সরকার ভাঙ্গিয়া পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট দীর্ঘদিন ধরিয়া শেয়ার সরকার কায়েম রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। আমাদের বর্তমান সরকার অন্যদের শেয়ার না দিলেও চলিতে পারিবে। ইহাতে বর্তমান সরকারের কোন শংকা নাই।

ক্ষমতার শেয়ার হইতে চিন্তার শেয়ার দেশের জন্য মঙ্গলকর। অর্থনীতি রাজনীতি রাষ্ট্রযন্ত্রের দুই চাকা। এই দুই চাকা ছাড়া রাষ্ট্র চলিতে পারে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে শেয়ার যেমন ভূমিকা রাখে রাজনীতিতেও তেমনি চিন্তার শেয়ার ও মতের শেয়ার অনুরূপভাবে ভূমিকা পালন করিয়া থাকে।

পৃথিবীর উন্নতশীল দেশসমূহে অর্থনৈতিক শেয়ার বাজার যে চাঙ্গা ও তেজী উহা নহে, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্য মতের ভিন্ন মতের শেয়ারে তেজী হইয়া রাষ্ট্র শক্তিকে বেগবান করিয়া থাকে। উদার শেয়ারনীতি শত্রুকে মিত্র করিয়া থাকে যেমন ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামের এক সময়কার বড় দুশমন এখন তাহাদের দেশের উন্নয়নের বড় শেয়ারী দোস্ত। শেয়ারইজমের জোয়ার বাংলাদেশে আসিয়াছে।

ইহার তেজ কতদিন প্রখর থাকিবে এই ব্যাপারে এই নিন্দুক নিবন্ধকারের সন্দেহ রহিয়াছে। ব্যাংক বীমা, শিল্প কারখানা, দোকান-বাড়ী শেয়ার ব্যবস্থায় মন্দ নহে। রিক্সাতে বা বেবী টেক্সীতে শেয়ারে ভ্রমণে বহু বিপদ রহিয়াছে। সবচেয়ে বড় বিপদ হইল হুজুগের শেয়ারে অংশ গ্রহণ করা। বাস্তবের শেয়ারে অংশ গ্রহণ না করিয়া হুজুগের শেয়ারে অংশ গ্রহণ মহাবিপর্যয়কে টানিয়া আনা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ভাষা-সাহিত্য-শিল্পকলা, সংগীত-নৃত্য, খাদা-বাদ্য বসন-ভূষণ-সম্ভাষণ সর্বক্ষেত্রে এক দেশ অন্য দেশের সহিত শেয়ার ব্যবস্থা চালু রাখিয়াছে। প্রত্যেক কিছুর একটা মৌসুম রহিয়াছে, আর সীমা পরিসীমাও রহিয়াছে। মৌসুমের পূর্বে বীজ বপন করিলে ভাল ফসল আশা করা যায় না। অপরদিকে সীমা লংঘন করিলেও আশা নিরাশায় পরিণত হয়।

শেয়ারের সেয়ানী পাগলামী যেভাবে শুরু হইয়াছে ইহার ধস নামিলে আমাদের কি হইবে?

❐ ১লা নভেম্বর ১৯৯৬

www.pathagar.com

তোফায়েল, গোফায়েল ও শালা সমাচার

একদা এক গ্রামে জনৈক বৃদ্ধ মুরব্বী এক গৃহস্থের বাড়িতে দাওয়াত উপলক্ষে যাইতেছিলেন।

পথের মধ্যে তাহার সহিত এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটিল। সে মুরব্বী সাহেবকে যাইতে দেখিয়া কহিল,

ঃ আসসালামু আলাইকুম।

ঃ ওয়ালায়কুম সালাম।

ঃ হুজুর আপনি কোথায় গমন করিতেছেন?

ঃ দাওয়াতে।

ঃ আমি আপনার সাথী হইব।

ঃ তুমি কে! আমার সাথী হইবে?

ঃ হুজুর আমি আপনার তোফায়েল।

ঃ মুরব্বী ছাহেব ছিলেন অত্যন্ত সরলপ্রাণ ও দয়ালু। একজন সাথী ছাড়া দাওয়াতে যাওয়া ঠিক হইবে না মনে করিয়া মুরব্বী ছাহেব কথিত তোফায়েলকে সংগে করিয়া পুনরায় হাঁটিতে লাগিলেন। কতটুকু গমন করিবার পর আর একজন লোকের সাক্ষাৎ ঘটিল। সেও তোফায়েলের মত সালাম প্রদান করিয়া কহিল,

ঃ হুজুর কোথায় যাইতেছেন?

ঃ দাওয়াতে।

www.pathagar.com

ঃ হুজুর আপনার সাথে ইনি কে?

লোকটি উত্তর দিল, আমি হুজুরের তোফায়েল।

তখন অপর লোকটি কহিল, তুমি যদি হুজুরের তোফায়েল হইয়া থাক, তবে আমি 'গোফায়েল'।

ঃ হুজুর আমি আপনার গোফায়েল। তোফায়েল যদি আপনার প্রায়োজন ও সাথী হইতে পারে, তবে গোফায়েলও আপনার প্রয়োজন এবং সাথী হইবে।

মুরব্বী ভাবিলেন ইহা মন্দ যুক্তি নহে। তোফায়েল ও গোফায়েলকে সাথী করিয়া মুরব্বী ছাহেব পুনরায় হাঁটিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ গমন করিবার পর পথে পুনরায় তৃতীয় আর এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটিল। সে অনুরূপভাবে সালাম প্রদান করিয়া কহিল,

ঃ হুজুর কোথায় গমন করিতেছেন?

ঃ দাওয়াতে।

ঃ কাহার বাড়ীতে?

ঃ অমুকের বাড়ীতে।

ঃ আপনার সহিত ইহারা কাহারা?

ঃ তোফায়েল ও গোফায়েল।

ঃ আমিও আপনাদের সাথে গমন করিব।

ঃ আপনি কে?

ঃ হুজুর। আমি অমুকের পরম আত্মীয়।

ঃ তোফায়েল গোফায়েল আর পরম আত্মীয়কে সাথে করিয়া তিনি অমুকের বাড়ীর দিকে পুনরায় হাঁটিতে শুরু করিলেন। গরিব গৃহস্থ কেমন করিয়া চারজনকে খাওয়াইবেন ইহা তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এহেন বোকামীর জন্য মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

তাহারা চারজনই গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। এক জনের পরিবর্তে চারজনকে দেখিয়া গৃহস্থ চমকাইয়া উঠিলেন। এমন কি সালাম আদাব দিতে পর্যন্ত প্রথমে ভুলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পর গৃহস্থের সম্বিত ফিরিয়া আসিল।

ঃ হুজুর আসসালামু আলায়কুম,

ঃ ওয়ালায়কুম সালাম।

www.pathagar.com

গৃহস্থ এক একজনের দিকে অংগুলি প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,

ঃ হুজুর ইনি কে?

ঃ তোফায়েল

ঃ উনি?

ঃ গোফায়েল।

গৃহস্থ হৃদয়ের মধ্যে চাপা রাগ আর থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। রাগত স্বরে কহিলেন, হুজুর ওই শালা কে?

তৃতীয় জন এক গাল হাসি দিয়া কহিল, 'হুজুর আমি আপনাকে বলি নাই ইনি আমার পরম আত্মীয়! সম্বোধনে সম্পর্ক পরিষ্কার হইলতো!

মুরব্বী "শালা" গালি হিসাবে বুঝিতে পারিলেন না বরং তিনি ধরিয়া নিলেন যে জগতে শালার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। গৃহস্থের রাগও তিনি ধরিতে পারেন নাই।

সে দিন মওলভী ছাহেব তোফায়েল গোফায়েল আর পথের শালাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইদানিং দাওয়াত না পাইয়াও বোকা সরল প্রাণ সে মুরব্বীর মতই আমাদের অবস্থা হইয়াছে।

সেদিনের মওলভী ছাহেব ছিলেন বোকা ও সরলপ্রাণ এবং বিব্রতকারী তোফায়েল গোফায়েল ও শালা ছিল সুচতুর ব্যক্তিত্রয়।

ইদানিং আসন্ন ভোটের ভুটভুটি বা ফুরফুরে হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। এখানে ওখানে গজাইয়া ওঠা তোফায়েল-গোফায়েল ও শালাগণ জোট বাঁধিতে শুরু করিয়াছে। ইহারা নিরীহ ভোটারদের এখন হইতে 'সাইজ' করিতে শুরু করিয়াছে।

হে সুহৃদ পাঠক! "এই সাইজ" নব অর্থে মারধর করা বুঝিবেন না। সাইজ ইংরেজী শব্দটি বিভিন্নার্থে, ইদানিং বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত হইতেছে। আমরা খাদ্যে বাদ্যে যেমনি "বিদেশী" অনুপ্রবেশকে স্বাগত জানাই তেমনি ভাষায়ও গোঁড়ামীর পুরাতন বন্ধনকে ছিঁড়িয়া ইংরেজী এ শব্দটি আনিতে দ্বিধাবোধ করিতেছি না।

ধন্য বাঙালী! তুমি বহুদিন পর ঠিক কাজটি করিতে শিখিয়াছ।

সাইজের ইংরেজী অর্থ যাহা হউক না কেন বাংলায় এ সাইজের এখন অনেক অর্থ। এক অর্থে 'আঘাত করা' (তাহাকে সাইজ করে এলাম, সাইজ করে দাও)।

সাইজ অর্থ সুন্দর ও ঠিক করা।

www.pathagar.com

(ইহা একটু সাইজ করিয়া দিন, ইহা মানান সাইজের কাপড়)।

এই বিদেশী শব্দের সহিত আর এক বিদেশী 'বে' যোগ হইয়া সাইজ হইল 'বে-সাইজ'। সাইজ শব্দ দ্ব্যর্থক হইলেও বে-সাইজ দ্ব্যর্থক নহে।

কিছুদিন পূর্বে দৈনিক আজাদীতে একটি রাজনৈতিক রিপোর্ট দেখিলাম। এক দল অপর দলকে সাইজ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

নির্বাচন এখনো দেরীতে, এই তো মাত্র কলির সন্ধ্যা। ঘোর কলি এখনো দূরে! সন্ধ্যাকালে এই সাইজ খেলা শুরু। ইহা দল বা গণতন্ত্রের জন্য কি হজমী দাওয়াই না বেহজমীর আলামত এখনো বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আলামত শুভ নহে বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে।

ফুটবল খেলার মওসুমে খেলোয়াড়দের টোকেন লইতে শুনিয়াছি। তাহারা দলবদল করেন। দাম হাঁকিয়া থাকেন। এই দল বদলের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে।

নির্বাচন কমিশনার মহোদয়কে কহিব, জনাব ফুটবল খেলার মত রাজনৈতিক স্টারদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন কে বা কাহারা কোন দলে যাইবেন। ইহার পর তাহাদিগকে খেলায় নেওয়া হইবে না।

ইহার জন্য লটারীও নির্ধারণ করা যাইতে পারে। লটারী বাংলাদেশের জনপ্রিয় আশা ও হতাশা।

আমরা তোফায়েল, গোফায়েল ও শালাবৃন্দ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। কোথায় যাইব কি খাইব।

ক্রীড়ার মান উন্নয়নে যদি লটারী হইতে পারে রাজনীতিও এক প্রকার 'ক্রীড়া'। এই ক্রীড়ার মান উন্নয়নেও লটারীর ব্যবস্থা চালু করা যাইতে পারে। ইহাতে পলিটিকেল কালচারের বিকাশ হইবে এবং আঁকড়াইয়া ধরা পুরাতন কালচার বিনাশ হইবে।

শুধু 'স্টার' নহে এই হতভাগ্য তোফায়েল-গোফায়েল ও শালাগণও এ ব্যবস্থায় প্রচুর উপকৃত হইবে।

ইহা প্রবন্ধ বা নিবন্ধ নহে। ইহা নিছক অবন্ধ কুবন্ধ মনে করিয়া ধরিয়া লইবেন। ইহা সরস পাঠকদের জন্য নহে, ইহা বিরস-নিরস-অবশ-হতাশ পাঠকদের জন্য রচিত হইয়াছে। ডুবন্ত-ভাসন্ত সংসদকে 'চলন্ত' রাখিবার মত প্যাঁচ মারিয়া এই 'বিরস'কে নিরস না করিবার জন্য অনুরোধ থাকিবে।

www.pathagar.com

দৈত্য ও কুকুরের লেজ

একদা এক যুবক-দৈত্য এক গ্রামে আসিয়া হাজির হইল। দৈত্য গ্রামে আগমন করিয়া কহিল, আমাকে কাজ দাও না হইলে আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করিব। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি দৈত্যকে ডাকিয়া কহিলঃ দৈত্য, তুমি ওই পাহাড়টির মাটি নদীতে ফেলিয়া দাও।

দৈত্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশাল পাহাড়ের মাটি উপড়াইয়া ফেলিল।

দৈত্য কহিলঃ কাজ দাও।

লোকঃ আচ্ছা ওই নদীর পানি অপর নদীতে ফেলিয়া দাও। এক নদীর পানি অপর নদীতে ফেলিতে দৈত্যের খুব বেশী সময় লাগিল না।

দৈত্যের এমনতর কার্য দেখিয়া প্রথমে অভিভূত হইলেও পরে সকলে আতংকিত হইল। তাহারা ভাবিতে লাগিল কি কাজ দিয়া দৈত্যকে দিবানিশি ব্যস্ত রাখা যাইতে পারে?

দৈত্যকে পরাস্ত করিতে আগাইয়া আসিল এক বিজ্ঞজন।

www.pathagar.com

বিজ্ঞ কহিল ঃ ওহে দৈত্যবাবাজী! তুমি আমার কুকুরের লেজটি সোজা করিয়া ছাড়িয়া দাও। দৈত্য কুকুরের লেজ একবার সোজা করিয়া ছাড়িয়া দেয় কিন্তু লেজটি পুনরায় বাঁকা হইয়া যায়। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও দৈত্য কুকুরের লেজ সোজা করিতে পারিল না।

এই কাহিনীর বিজ্ঞজন দৈত্যকে কাজ দিয়া পরাস্ত করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশে আজকাল বিজ্ঞজনের বড়ই অভাব।

আমাদের তরুণগণ প্রাণশক্তিতে দৈত্য হইতে কম নহে। গল্পের দৈত্য পাহাড় উপড়াইয়াছিল, নদীর পানি অন্য নদীতে প্রেরণ করিয়াছিল।

আমাদের তরুণগণও অতীতে তেমনি কাজ করিয়াছিল। পাকিস্তান নামক জগদ্দল পাহাড়কে এই দেশে তরুণ দৈত্যগণ উপড়াইয়া ফেলিয়াছিল।

আয়ুব খাঁ তাঁহার 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার' কিতাবে লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা অসামরিক জাতি। তাহাদের দিয়া যুদ্ধ চলে না।

আয়ুব খানের কিসমত অত্যন্ত সুপ্রসন্ন এই যে তিনি তাহার জীবিতকালে দেখিতে পাইলেন অসামরিক জাতি আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্যের ডঙ্কাবাদক পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে 'ক্যাচকা মাইর' দিয়া কাদার মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিল। ৯২ হাজার পাকিস্তানী তাগড়া জোয়ানদেরকে মছলী খানেওয়ালা বাঙ্গালী বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল।

বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায়ের আজ কোন কাজ নাই।

সেই দিন ৬০ দশকে তরুণগণ দশকের শুরুতে গণতন্ত্রের জন্য স্বায়ত্ব শাসনের জন্য মাঠে নামিল। বুকে প্রত্যাশা এবং উদ্যম স্বাস্থ্যের তারুণ্যের কর্ম খুঁজিয়া পাইল। পাঠ আর মাঠ দুইটিতে বিচরণ করিল নবীন তরুণের পদযুগল।

৬০ দশকের শেষের দিকে এই বিচরণ আরো বেগবান হইল। নতুন প্রত্যাশার সহিত প্রাণ বিসর্জনের জন্য তরুণ প্রস্তুতি গ্রহণ করিল।

মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিশিখায় পতঙ্গের মত তরুণ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মাহুতি প্রদান করিল।

দেশ স্বাধীন হইল। ক্ষমতার মসনদ পরিবর্তন হইল। নতুন নতুন মন্ত্রী হইবার জন্য কলাকৌশল অবলোকন করিলাম। কিন্তু তরুণদের প্রত্যাশা হতাশায় রূপান্তরিত হইল। কর্মের পরিবর্তে বেকারত্বের দুঃসহ যন্ত্রণায় ষাট সত্তর দশকের যুবক যেন কোথায় হারাইয়া গেল।

www.pathagar.com

জাতি গঠনে, উৎপাদনে, উন্নয়নে তরুণের যেন কোন ভূমিকা নাই। মনে হইতেছে ইহারা শক্তি নহে, অপশক্তি। তাহারা যেন অসময়ে আগত অতিরিক্ত অধম অপশক্তি।

আফ্রিকার খরা প্রপীড়িত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ শিশু মরিয়া সে দেশে প্রজন্মের বিরাট গ্যাপ দেখা দিয়েছে।

আমাদের দেশে কি এক প্রজন্মের সহিত অন্য প্রজন্মের বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছে না?

৯০ দশকের তরুণের তারুণ্যছটা যাহা দেখিয়াছি বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে তারুণ্যের দ্যোতি কি বিলীন হইতেছে না?

নতুন প্রজন্মকে প্রত্যাশার সাতরঙা যাদু দেখাইতে আমাদের বিজ্ঞজন কেন ব্যর্থ হইতেছেন?

'তরুণ' না বলিয়া হতাশ তরুণ ও বেকার তরুণের মিছিল কি জাতির জন্য শুভ?

গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ করিতে হইলে তরুণদেরকে হতাশার অন্ধকার পর্দাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবার মন্ত্র দিতে হইবে।

গ্রীক দেবতা প্রমিথুয়াস যেমনি স্বর্গের দেবতাদের শত রোষাগ্নিকে উপেক্ষা করিয়া মর্ত্যের মানুষের জন্য সূর্যালোক ছিনাইয়া আনিয়াছিল, তেমনি আজিকার তরুণদের মুক্তির জন্য নতুন আশার সুর্যালোক ছিনাইয়া আনাইবার মন্ত্র শিখাইতে হইবে।

তরুণদের নিরাশাকে আশায় রূপান্তরিত করিবার জন্য প্রয়োজন কর্ম সৃষ্টি করা।

অর্থনীতির ছাত্র না হইয়াও আমি জোরের সঙ্গে বলিতে পারিব আমাদের দেশে কর্ম সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। মিমি চকোলেট আর আন্ডারওয়ার তৈয়ারীর ফ্যাক্টরী দিয়া তরুণ তরুণীর ব্যাপক কর্মসংস্থান সম্ভব নহে। কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশী ফর্মুলা দিয়া স্বদেশের মাটিতে ফল গজাইবে না।

আশায় আশায় বৈরাগী যেমন চিড়ার ছালা লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তেমনি কর্মসংস্থানের বড় বড় বেলুনী আওয়াজ দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রবণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

www.pathagar.com

জনৈক সাধু বাতাস খাইয়া দীর্ঘদিন নাকি জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সাধুর নাম হইল পবন বাবাজী। আমাদের তরুণগণ পবনবাবাজী নহেন এমন কি পবনবাবাজীর মুরিদও নহেন।

বিগত ২৬শে এপ্রিল ঢাকার এক পত্রিকায় দেখিলাম দুইজন থাই পুলিশ বহিরাগত ছয়শত শ্রমিককে আটকাইয়া পাহারা দিতেছে। জানি না, উহাতে বাঙ্গালী সন্তান যে নাই উহা কি বলা যাইবে?

থাইল্যান্ডে যে কাজ আছে উহা কি বাংলাদেশে নাই? একশতবার কহিব, বাংলাদেশে বহু কাজ রহিয়াছে। এ দেশের তরুণ কেন, অন্য দেশ হইতে মানুষ আসিয়া কাজ করিলেও কাজ ফুরাইবে না।

শহরে ফল দেখাইয়া তরুণদের হতবল ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে। চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আর বিরানী হাউসের বাহার ছুটাইয়া তরুণদের দিশাহারা করা হইতেছে।

তরুণদেরকে কর্মে বেগবান না করিয়া 'লোভে' বিলাসিতায় ভরাইয়া তোলা হইতেছে।

এত বিলাস ও বিলাস প্রচার প্রদর্শনের সময় এখনো বাংলাদেশে উপস্থিত হয় নাই। এ বিলাস প্রদর্শন বিলাস নহে, উহা তারুণ্যের প্রতি উপহাস। বিপথে পরিচালনার শয়তানী ষড়যন্ত্র!

অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান ঘরের সন্তান ছাড়া বেশীর ভাগ তরুণ আজ ভোগের ভাগিদার নহে, তাহারা ধিক্কারের পাত্র হইয়া যাইতেছে। সকল দোষ যেমন নন্দ ঘোষের, আজকাল তরুণগণ উচ্ছন্ন যাওয়া কতিপয় প্রাণী বলিয়া অনেকের চোখের বালি হইয়া পড়িয়াছে। এই গ্লানি কাহার? তরুণদের স্কন্ধে এ অপবাদের জন্য দায়ী কে?

তরুণগণ রবিনসন ক্রুসো বা নাবিক সিন্দাবাদ নহে। তাহারা এককভাবে জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে না। দুই একজনের উদাহরণ টানিয়া আনা উড়োখৈ গোবিন্দায়নম ছাড়া আর কিছুই নহে।

সমষ্টিগত চিন্তা, সমষ্টির জন্য কর্ম পরিকল্পনা ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব নহে।

বাকীতে চিড়া পাওয়া গেলেও মুখের সুমিষ্ট ভাষণে অথবা কর্কশ ভাষণে চিড়া ভিজানো সম্ভব হইবে না। চিড়া ভিজাইতে হইলে পানির প্রয়োজন।

আজিকার হতাশগ্রস্ত তরুণদের আশায় দোলাইতে হইলে ভাষণ/ তোষণ/তিরস্কার/ তাবিজ/ দোয়া দিয়া চলিবে না। তরুণদের জন্য চাই কর্মসংস্থান।

❐ ২৯শে এপ্রিল ১৯৯৪

www.pathagar.com

মস্তান রপ্তানি

পালি সাহিত্যে একটি বিখ্যাত গল্প হইল বাবেরু জাতক। গল্পের শুরুতে আছে অতীতে বারাণ সিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো মোর যোনিয়ং নিববত্তিত্বা বুদ্ধি অম্বায় সোভগুপ্পত্তো অরঞ্ঞে বিচার। –অতীতে বানারসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব ময়ূরকুলে জন্ম গ্রহণ করত সৌভাগ্যশালী হইয়া অরণ্যে বাস করিত।

পুরা গল্পটি হইল– সে সময় এক বণিক দেশী কাক লইয়া বাবেরু রাজ্যে আসিয়াছিল। সেই রাজ্যে তখন কোন পক্ষীকুল ছিল না। বণিকদের নৌকায় কাকটি দেখিয়া তথাকার অধিবাসীগণ কাকের প্রশংসা করিতে লাগিল, "দেখ ইহার কি সুন্দর বিচিত্র বর্ণ, গলার অন্ত্যদেশ অবধি মুখমুণ্ডক ও মনিগোলক সদৃশ্য আঁখি দুইটি।"

ইহার পর তাহারা বণিককে কহিল, "আপনাদের দেশে অনেক পক্ষী রহিয়াছে, এই পক্ষীটি আমাদের দান করুন।

তেনহি মুলেন গণ হথাতি।
কহাপণেন নো দেথা তি।

তার অর্থ হইল, তাহা হইলে মূল্য দিয়া গ্রহণ কর।

ঃ একটি মুদ্রা দিয়া দিবেন না?

ঃ 'না'। বণিক কাকের দাম বাড়াইয়া একশত মুদ্রা দাবী করিল। একশত মুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পক্ষীটি অর্পণ করিল এবং কহিল, ইহা আমাদের বহু উপকারী, তোমাদের সঙ্গে মৈত্রী হউক। তাহারা ইহাকে লইয়া সুবর্ণ পিঞ্জরে স্থাপন করিয়া নানা প্রকার ফল-মূল ও মৎস্য মাংস দ্বারা পরিচর্যা করিয়াছিল। (মধ্যভারতীয় অর্থ ভাষা সংকলনঃ অরবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া)।

আমাদের দেশে বৈদেশিক কাজকারবারে যে সমস্ত সরকারী কামলা (বুরোক্র্যাট) দেশের হিত সাধনে মনপ্রাণ লইয়া কাজ করিতেছিলেন সম্ভবত তাহারা পালি সাহিত্যের এ বিখ্যাত গল্পটি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

তাই তাহারা দেশের অর্থনৈতিক হিতার্থে ঠিক করিলেন যে মধ্যপ্রাচ্যে তাহারা পশুপক্ষী রপ্তানী করিবেন।

www.pathagar.com

জানা গিয়াছে যে, তাহারা প্রথমে বিড়াল ও কাক লইয়া গিয়াছিলেন। এই কাক বিড়াল দেখিয়া বাবেরু রাজ্যের অধিবাসীর মত মরুবাসীরা এই পক্ষী ও পশুকে কি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল উহা অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। কিন্তু কপাল মন্দ, কাক ও বিড়াল মধ্যপ্রাচ্যের ঐশ্বর্য হজম করিতে পারিল না। অল্প দিনের মধ্যে ইহাদের ইহলীলা শেষ হইল।

মধ্যপ্রাচ্যে অপ্রচলিত দ্রব্যের বাজার খুঁজিবার বিভিন্ন চেষ্টা হইয়াছে। কাক ও বিড়াল প্রেরণ করিয়া সম্ভবত অপ্রচলিত দ্রব্যের বাজার বৃদ্ধির চেষ্টা হইয়াছিল। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত মধ্যপ্রাচ্যে 'এরেন্ডা' সরবরাহ করিয়া নাকি প্রচুর বৈদেশিক অর্থ উপার্জন করিয়াছে। 'নাই দেশে এরেন্ডাও বৃক্ষ' এই প্রবচনটি সম্ভবত ভারতই মধ্যপ্রাচ্যে চালু করিয়াছিল। আমাদের কৌশলীগণ 'এরেন্ডা' বিক্রি করিতে না পারিলেও ভেরেণ্ডা ভাজেন নাই এমন তথ্য জানা যায় নাই।

'তেলা পোকা' যাহার মসৃণ পাখা রহিয়াছে যাহা উড়িতে না পারিলেও পক্ষী বলিয়া উহা মধ্যপ্রাচ্যে চালান দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করা যাইতে পারে। কারণ তেলাপোকাই একমাত্র প্রাণী যাহা আমাদের দেশে বহু সংঘাতকে অতিক্রম করতঃ নিজেদের বংশ বিস্তার অটুট রাখিয়াছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় যাহা মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানীযোগ্য, উহা হইতেছে মস্তান ও চাঁদাবাজদের রপ্তানীকরণ। পৃথিবীতে কোন কিছুই নিরর্থক নহে। সকল কিছুর দোষ যেমন আছে গুণও তেমনি রহিয়াছে।

মস্তান ও চাঁদাবাজগণ স্বদেশের অপকারী হইলেও বিদেশের জন্য তাহারা মহা হিতৈষী হইতে পারে।

লর্ড ক্লাইভও তাহার পিতার এক মস্তান সন্তান। তাহার মস্তানীতে অসহ্য হইয়া তাহার পিতা তাহাকে ভারতবর্ষে নির্বাসন দিয়াছিল। ভারতে প্রেরণ করিবার সময় ক্লাইভের পিতা বলিয়াছিল –

ভাল যদি হস কভু
ফিরে আসিস দেশে
নইলে যেন খায় তোরে
মাদ্রাজের মোষে (মহিষে)।

সে ঐতিহাসিক মস্তান ক্লাইভ তাহার পিতাকে নয়, ব্রিটিশদেরকে একটি রাজ্য উপহার দিয়াছিল।

আমাদের মস্তানগণ ও চাঁদাবাজগণের মধ্যে যে ক্লাইভ ঘুমাইয়া নাই উহা কে বলিবে? খারাপ ভাল হইতে কতক্ষণ? মস্তান ও চাঁদাবাজদের সাধন ভজনের একটি সুন্দর পরিচিতি প্রকাশ করিতে হইবে। মধ্যপ্রাচ্যে জুয়েল আইচের যাদুর মত তাহাদের কাজকর্ম বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করিতে হইবে। এ দেশীয় মস্তানদের কাজ

www.pathagar.com

কারবারে মধ্যপ্রাচ্যের শেখগণ অবশ্যই আহলাদিত হইবে। ক্লাইভের মত দেশ আনিতে না পারিলেও তাহারা অর্থ আনিতে সমর্থ হইবে।

আমাদের রাজ্যের দরকার নাই। নিজ রাজ্য চালাইতে যাইয়া যে ক্ষেত্রে হিমশিম খাইতেছি অপর রাজ্য লইয়া বাড়তি যন্ত্রণা সহ্য করিবার মত শক্তি আমাদের নাই। অল্পে সন্তুষ্টি ইহাই আমাদের কৃষ্টি। নিরক্ষর নিরন্ন মানুষের মস্তানের প্রয়োজন নাই। হৃদয়বৃত্তহীন বিত্তশালীদের মদদ বন্ধ হইলে মস্তানদের আখড়া আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে। মস্তানরাও মানুষ। তাহারা না খাইয়া মরিবে উহা সহ্য হইতেছে না। এ মস্তানদের বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিনা চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশে আইন নাই একথা বলিব না কিন্তু সাক্ষীর বড়ই অভাব। খুন-গুমের বহু মামলা সাক্ষীর অভাবে অপরাধী খালাস হইয়া যাইতেছে। ইহা বিচার আদালতের দোষ নহে।

সুখ বস্তুগত ব্যাপার, সুখের সহিত সামগ্রী প্রাপ্তির যোগ রহিয়াছে। সামগ্রী ছাড়া ন্যূনতম যে শান্তি মানুষ ভোগ করিয়া থাকে উহার জন্য প্রয়োজন ভীতি ও আতংকমুক্ত সমাজ।

মস্তান ও চাঁদাবাজগণ যে কোন সময়ে যে কোন মুহূর্তে হাজির হইতে পারে। তাই ভীতি ও আতংক আজ শহর বন্দর গ্রামের মানুষের কাছে নিত্য বিরাজ করিতেছে। ভীতি ও আতংককে শিয়রের কাছে রাখিয়া কোন দিন কোন সুস্থ মানুষ ঘুমাইতে পারে না। মস্তানগণ সভা সমিতি, পালাপার্বন, সংগীতানুষ্ঠান তথা এমন কোন স্থান নাই যেখানে তাহাদের গমন নাই। মস্তানদের আগমনে সব আয়োজন তছনছ হইতেছে।

প্রচলিত আইন দ্বারা মস্তান দমানো সম্ভব নয়। যতই পরিকল্পনা করা হউক না কেন মস্তানগণ স্বদেশ ছাড়িবে না। কারণ মস্তানগণ জানে, গেঁয়ো যুগি বিদেশে ভিক্ষা পাইবে কি? মস্তানদের হিতোপদেশ দিয়াও কোন কাজ হইবে না। ইহাদের দমনের জন্য বর্তমান বাস্তবতাকে স্বীকার করিয়া নতুন আইন চালু করিতে হইবে। আমাদের অর্থনীতির মস্তানী সহ্য করিবার শক্তি নাই। একটি বড় আকারের ঝড়ে বা প্লাবনে আমাদের এই গরিবী সংসার তছনছ হইয়া যায়। প্রকৃতি একটু নড়বড় করিলে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস আমাদের আক্রমণ করিয়া বসে। শত অভাবের দেশে মস্তান রোগ যে কোন উপায়ে দূরীভূত করিতে হইবে।

মস্তানদের সহিত চাঁদাবাজী সন্ত্রাস ওৎপ্রোতভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। সকলে চাহিতেছেন সন্ত্রাসমুক্ত করিতে। সন্ত্রাস ত সকলে করে না।

কতিপয় মস্তানই সন্ত্রাসের হোতা। তাই বারবার প্রশ্ন জাগে, কতিপয় মস্তান দমন কি আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারের জন্য দুষ্কর?

❐ ৩রা এপ্রিল '৯২

www.pathagar.com

হতাশা রোগের ঔষধ কি

আশা ও হতাশা এই দুইয়ের নাগরদোলায় মানুষ উঠিতেছে ও পড়িতেছে। এই আশা ও হতাশা সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আশা ও হতাশা জড়িত রহিয়াছে ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে। আশা সম্পর্কে বলিতে গিয়া রবার্ট ব্রাউনিং বলিয়াছেন, "এ জগতে প্রতিটি পদে যেন চলেছে চাওয়া আর পাওয়ার লুকোচুরি। এটা চাই, সেটা চাই, নানা কিছু চাই, বহু কিছু চাই। চাই অর্থ, চাই প্রতিপত্তি, চাই পরমায়ু, চাই আরও নাম যশ খ্যাতি। পাইও ঠিক ওগুলোই, তবু যেন আশা মেটে না। আজ যা চাই সে চাওয়া না মিটিতেই কোথা থেকে আসে আরও আকাঙ্ক্ষা, আরো পিপাসা, আরও পাওয়ার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষাইত সকলের জীবনের মূলকথা। উচ্চাশার মাদকতার মধ্যেই জীবনের সব রসবোধ, সব ছন্দ। হে অন্তহীন আশা, আর কোন নিত্য নতুন পথে তুমি মানুষের জীবনকে পরিচালিত করবে?"

রবার্ট ব্রাউনিং ছাড়াও পৃথিবীর বহু কবি দার্শনিক 'আশা' সম্পর্কে বহু আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশের এমন কবি নাই যাহারা হতাশার সহিত এই আশাবাদকে প্রকাশ করেন নাই। তবে আমাদের দেশে আশা হইতে হতাশাবাদ ব্যক্ত হইয়াছে বেশী। আমাদের দেশে ইহজাগতিক আশাবাদ হইতে পরজাগতিক আশাবাদকে অত্যন্ত প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। অনেকে আশাকে মায়া মরীচিকার সাথে তুলনা করিয়াছেন। অনেকে আশাকে লোভের মত পাপ বলিয়াও গণ্য করিয়াছেন। মাইকেল মধুসুদন দত্তের মত বিপ্লবী কবি আশায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ তিনিই বাংলা ভাষার জাগ্রত বেদিতে আশার সেঁজুতি জ্বালাইয়া ছিলেন। আশার অপর নাম সংগ্রাম, কিন্তু সংগ্রামী এই মহাকবিও আশার মধ্যে হতাশা অবলোকন করিয়াছেন ঃ

www.pathagar.com

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে
জীবন প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না
একি দায়!

ইহা কি কবির ভাষ্য না বাঙ্গালী জীবনের সার্বিক হতাশাবাদের চিত্র? আমাদের জীবনের দীর্ঘ হতাশাবোধ সম্ভবতঃ কবিকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আমাদের দেশের অনেক কবি আশাকে মায়া হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। আশার প্রলোভনে ছুটিয়া না বেড়াইবার জন্য আহবান জানাইয়াছেনঃ

"আশার আলোক দেখায়ে আমায়
গভীর তিমিরে ডুবায়ো না,
ক্ষীণ আলো-রেখা রেখো আগুকরি,
তবু আশা দিয়ে ছলিও না।"

(সুরেন্দ্র মোহন)

কিন্তু অন্যান্য দেশে 'আশা' হচ্ছে সৃষ্টির প্রেরণা। তাই ডিকেন্স বলিয়াছেন, "আশার অপর নাম অনুসন্ধিৎসা।"

আশাকে 'অনুসন্ধিৎসা'র আলোর ফুলঝুরি হিসাবে না দেখার একমাত্র কারণ হইতেছে যৌক্তিক বা লজিকেল চিন্তা চেতনার অনুপস্থিতি। ভাববাদ যেখানে প্রাধান্য লাভ করে যুক্তিবাদ সেখানে অবশ্যই অনুপস্থিত থাকিবে। সে ক্ষেত্রে আশাবাদ কখনো বাসা বাঁধিতে পারিবে না। আমাদের লোককাহিনী সমূহের মর্মকথায় হতাশার বাণী প্রধান না হইলেও উপস্থাপনার জন্য অনেক ক্ষেত্রে 'হতাশা' মূলসুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকগাথা 'রূপবান' এর মূল বক্তব্য ছিল সতীত্বের পরীক্ষায় রূপবানের সংগ্রাম ও জীবনের অনুসন্ধিৎসা। কিন্তু আশার বৈপরীত্যে হতাশার আহ্বান লইয়া এই 'রূপবান' আমাদের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। ১২ বৎসরের সুন্দরী রূপবান ভাগ্যদোষে ১২ দিনের শিশুকে স্বামী হিসাবে বরণ করতঃ 'দাইমা দাইমাগো' বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে জঙ্গলে ঘুরিল। অথচ বাঙ্গালীদের বনে জঙ্গলে ঘুরিবার কোন ঐতিহ্য বিশেষ নাই বলিলেও চলে।

www.pathagar.com

বেহুলা লখিন্দরের কাহিনীতেও আমরা দেখিতে পাই যে ভাগ্যদোষে বেহুলা সাপে কাটা স্বামীর মরা লাশকে লইয়া বন্দরে বন্দরে ঘুরিতেছে।

বাঙ্গালীরা ঐতিহ্যগতভাবে 'অলস'। এই অলস হইবার পশ্চাতে রহিয়াছে জীবন সামগ্রীর সহজলভ্যতা। ভূতত্ত্ববিদ স্যার চার্লস লায়েবের এক পুস্তকের নাম 'প্রিন্সিপালস অব জুয়লজী'। এই পুস্তক পাঠ না করিলেও আমরা অনেকে জানি যে ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত পলি মাটিতেই বাংলাদেশের সৃষ্টি। এদেশের অধিবাসীরা নদী আর সাগরের উপকূলে বাস করিয়াছে, মাছ ধরিয়াছে, ধান চাষ করিয়াছে। সুপ্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালীরা ধান চাষ করিয়াছে, পৃথিবীর শষ্যভোগী সভ্য মানুষ জাতির মধ্যে বাঙ্গালী অন্যতম।

পাখীর ঠোঁট হইতে ছিটকাইয়া পড়া 'ধান্য' শস্যদানা হইতে যে সামান্য বীজ ছুটিয়া আসিয়াছিল বাঙালীরা সেই সামান্য বীজ হইতে পরবর্তীকালে ধানের চাষ করিয়াছে। ভেতো বাঙ্গালী বাঙ্গালীর জীবনে নিন্দাবাচক শব্দ নহে। উহা বাঙ্গালীর জীবনে প্রশংসনীয় উপমা বলিয়া বিবেচিত।

ইহাছাড়া এই অঞ্চলের উপরে রহিয়াছে ষড়ঋতুর প্রভাব। আদিগন্তব্যাপী সবুজের সীমাহীন সামিয়ানা, পাখ-পাখালীর নানা সুরের দ্যোতনা, এরই সহিত ফুলে ফলে দুলিয়া উঠে নানা ঋতুর দোলদোলানী। মাধবী মৃত্তিকার কোলে পান্তাভাতই ত আমাদের দিয়াছে 'অলস-আয়াশ'। বিশিষ্ট ভাষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই এই আয়াসলভ্যকে অন্যভাবে দেখিতে গিয়া বলিয়াছেন, তাই বাঙ্গালীকে করে তুল্ল" Most poetic race in the world," ভাবনার উৎকর্ষ ও ভাবুকতা, ভাবালুতা তার সাহিত্যিককে দিলো গীতিময় প্রকাশ, তার শিল্প সংহতির সৌন্দর্যকে করলো সুক্ষ্ম হতে সুক্ষ্মতর। বাঙ্গালীর সুক্ষ্ম অনুভূতি ছিল বলিয়া বাঙ্গালীরা মসলিনের সুক্ষ্ম কাজ করিতে পারিয়াছিল। হাতীর শক্ত দাঁত চিরিয়া পাটি শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু হতাশার কফিন যাহা আমাদের মন মানসিকতার উপর দীর্ঘদিন যাবত ছাউনি হইয়া রহিয়াছে সেই হতাশাকে আজো পর্যন্ত আমরা ছিঁড়িতে পারি নাই। বর্ষাকালে সাপ আর অন্য সময়ে নানাজনের অভিশাপ আমাদেরকে নৈরাজ্যের অন্ধকারে নিপতিত করিয়াছে।

আশা ও হতাশার হেঁচকা টানে আমাদের দেশের অনেক কীর্তিমান পুরুষ আত্মহত্যা করিয়া জীবনে শান্তি খুঁজিয়াছেন।

জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যের চির আধুনিক কবি, যিনি চিরসত্য দেহের মরণশীলতাকে অস্বীকার করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ

"আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে-এ বাংলায়

www.pathagar.com

হয়তো মানুষ নয়-হয়ত বা শঙ্খচিল, শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক এই কার্তিকের নবান্নের দেশে।"

কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন তিনি নাকি আত্মহত্যা করিয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল হাই ছিলেন আজিকার বহু শিক্ষকের শিক্ষক। যাঁহার আচার-আচরণে, ভাষণে–ভূষণে ছিল আভিজাত্যের সুরভি মাখা। যিনি বাঙ্গালীদেরকে সুন্দর উচ্চারণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারও মৃত্যু স্বাভাবিক হয় নাই। তাঁহার বিরচিত একটি প্রবন্ধের নাম ছিল 'মহাভয়-মহৎগুণ'।

এই প্রবন্ধে তিনি লাশ ও মৃত্যুর দৃশ্য অবলোকন করিতে যাইয়া আঁতকাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দুর্ঘটনায় (?) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক আব্দুল হাই কি আমাদের স্মৃতির পাতা হইতে অপসারিত হইবেন? বাংলাদেশে সর্বত্র এখনো তাঁহার শত শত বাঘা বাঘা ছাত্র রহিয়াছে, যাহারা ভাষণে-তোষণে-লেখনে মাটির সামান্য মানুষকে স্বর্গের দেবতা বানাইতেছেন এবং বানাইতে পারেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের কথা তাঁহারা কেহই সেই মহান শিক্ষকের কথা একবারও উচ্চারণ করিতেছে না।

তাহা হইলে বলিতে হইবে অধ্যাপক আব্দুল হাই সাহেবের মৃত্যুর রহস্য রহিয়াছে? কেহ কি সাহস নিয়া সেই রহস্য উদঘাটন করিবেন?

ডিমওয়ালা, পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা অর্থাৎ যাহারা বিভিন্নভাবে দাঁও মারিয়া পয়সাওয়ালা হইয়াছেন তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন হইতেছে, পত্রিকায় ছবি আসিতেছে। সাধারণ, অসাধারণ অথবা বিজ্ঞাপন যেভাবে হউক তাঁহারা ছবি হইয়া ভাসিতেছেন। অথচ কীর্তিমান মানুষের কাহিনী অমা অন্ধকারে হারাইয়া যাইতেছে।

তবে জোর দিয়া বলিতে পারিব আমাদের দেশে আশাবাদ অত্যন্ত কম। আশাবাদের অনুপস্থিতি রহিয়াছে বলিয়া চালাক শয়তানসমূহ বিভিন্ন কায়দায় আমাদেরকে ফাঁদে ফেলিয়া ফায়দা লুটিয়া লইতেছে। যাহার বিশদ বিবরণী প্রদান করিলে একটি বড় আকারের পুঁথি রচিত হইবে। মওত ছাড়া সকল রোগের ঔষধ আছে। কিন্তু হতাশা রোগের ঔষধ নাই। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে তাহাদের নেতৃবৃন্দ হতাশার অন্ধকারকে গলা টিপিয়া ধরিয়া আশাবাদের সোনালী আলোক ছুটাইয়া আনিয়াছেন। আনন্দধারাকে আমাদের ভুবনে ছড়াইয়া দিতে হইলে চাই নবজীবন চেতনার উন্মেষ। জীর্ণতার সকল সম্পর্কের সহিত সম্পর্কচ্ছেদই আশার আশাবাদ সৃষ্টি হইতে পারে।

❐ ৭ই আগষ্ট '৯২

www.pathagar.com

টুপি ও সংবিধান

একদা জনৈক তরুণ শ্বশুর বাড়ীতে গমন করিতেছিল। বাড়ি হইতে বাহির হইবার পূর্বে তরুণটির মাতা কহিলঃ ওহে বৎস, আমরা খানদানী বংশের। খানদান বড় পবিত্র দ্রব্য। বৎস, মনে রাখিও খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করা যাইতে পারে, বিলাস দ্রব্য গাড়ী-বাড়ী ক্রয় করা যাইবে, কিন্তু খানদান ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য নহে। খানদান আমদানী, রপ্তানীযোগ্য নহে, ইহা ঐতিহ্যগত। হে আমার প্রিয়তম বৎস! আমাদের বংশের তুমিই একমাত্র আশা ভরসা, যেখানে গমন কর বা অবস্থান কর না কেন খানদান কথাটি মনে রাখিতে হইবে।

তরুণ ঃ আম্মা হুজুর, খানদানের প্রতীক কি?

আম্মা ঃ মাথার টুপি, মাথার টুপি খানদানের মস্ত বড় পরিচয়। ইহা রক্ষা করিতে হইবে। মস্তক যাইতে পারে কিন্তু মস্তকের টুপি ঠিক থাকিতে হইবে, পুরুষের টুপি হইল খানদান আর খানদান হইল টুপি।

মায়ের দোয়া ও বচন সমুহকে সঙ্গে করিয়া তরুণ শ্বশুর বাড়ীর দিকে রওনা হইল। শ্বশুর বাড়ীর গমনাগমনের মধ্যপথে একটি নদী অতিক্রম করিতে হয়। তরুণ সাম্পানে করিয়া নদী পার হইতেছিল। সাম্পানে কোন ছই ছিল না। নদীর মাঝপথে যখন সাম্পান উপস্থিত হইল তেমনি সময়ে হঠাৎ বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে শুরু করিল।

নদীর বুকে বাতাসের নিঃশ্বাস সহসা তরুণের খানদানী টুপি উড়াইয়া লইয়া গেল। খানদানের প্রতীক টুপি নদীর পানিতে সলিল সমাধি লাভ করিল।

www.pathagar.com

তরুণের টুপি তথা খানদানের প্রতীক উড়িয়া চলিয়া গেল। তরুণ হতবিহ্বল হইয়া পড়িল। খানদান রক্ষা করিতে মস্তক খোলা রাখা চলিবে না। মায়ের কথা তাহার বারংবার স্মরণে উদিত হইতে লাগিল– টুপি যাহার নাই তাহার আবার খানদান কিসের? মাথার টুপিই খানদান। খানদানই টুপি।

এখন সে কোথায় টুপি পাইবে? উপায়ান্তর না দেখিয়া তরুণ অবশেষে নিজের পরিধানের লুঙ্গী খুলিয়া লইল এবং পাগড়ীর মত করিয়া লুঙ্গী মাথায় পরিধান করিল।

জামাইকে আগাইয়া লইবার জন্য শ্বশুর বাড়ীর লোকজন সাম্পানঘাটায় উপস্থিত হইল।

জামাইয়ের এহেন অবস্থা দেখিয়া তাহারা সকলে বিব্রত হইয়া পাড়িল, চক্ষু চড়কগাছ হইল। শিরোপরি লুঙ্গীতে পেঁচানো পাগড়ী আর লুঙ্গীর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। খানদানী পরিবারের জামাইয়ের এমন অবস্থা কেন? একে অপরের মুখের দিকে চাহিতে শুরু করিল।

ঃ ওহে দুলাভাই, আপনার এ অবস্থা কেন। নিম্নদেশের লুঙ্গী উর্ধ্বলোকে উঠিল কেন?

ঃ ওহে শ্যালক, তোমরা হইলে নীচু বংশের লোক। খানদানের পরিচয় কি ভাবে বুঝিতে পারিবা। আমরা হইলাম খানদানী, মাথা খালি রাখিতে পারি না। মস্তক আবৃত রাখিয়াছি।

ঃ ওহে দুলাভাই, আপনার লুঙ্গী কোথায়?

ঃ ওহে শ্যালক, টুপি হইল খানদানের পরিচয়। নদীপথে মম টুপি বাতাস ষড়যন্ত্র করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া নদীগর্ভে ডুবাইয়া দিয়াছে। আমি আমার খানদান রক্ষার জন্য তথা টুপির পরিবর্তে লুঙ্গী দিয়া পাগড়ী ধারণ করিয়াছি মাত্র, খালি মাথা ছোট লোকের–অখানদানী পরিচয়।

হে সুহৃদ পাঠক, আমাদের গণতন্ত্র এখন খানদানের সমস্যায় পতিত হইয়াছে। বর্তমানে আমাদের রাজনীতিতে কি সাংবিধানিক সংকট হইয়াছে? না সংবিধানে জট পড়িয়াছে? কেহ কেহ কহিতেছে ইহা সাংবিধানিক সংকট। কেহ কহিতেছেন রাজনৈতিক সংকট। কাহারো ধারণা জটের অন্যান্য কিছুর মত ইহাও এক প্রকার জট। রাজনৈতিক/সাংবিধানিক জট, যানজট, সেশনজট ইত্যাদি নিরসন করা সময়সাপেক্ষ। চুলের জট আঁচড়াইলে সারিয়া যায়। আমাদের প্রথমে জানিতে হইবে ইহা কি রাজনৈতিক সংকট না সাংবিধানিক সংকট, না রাজনৈতিক /সাংবিধানিক জট?

এই সংকট হইতেছে সদিচ্ছার সংকট। এক পক্ষ সংবিধান হেফাজত করিতেছেন অপর পক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নছিয়ত দিতেছেন। দুই পক্ষ আপন

www.pathagar.com

আপন খানদানকে যে কোন উপায়ে রক্ষা করিতেছেন, খানদান রক্ষা করিতে যাইয়া তরুণ যে ব্যবহার করিয়াছিল তেমন ব্যবহার রাজনৈতিক দল হইতে আশা করি না।

ওই তরুণ নদী পার হইয়া শ্বশুর বাড়ীতে যাইয়া খানদান পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন। কিন্তু খানদানের জিদ বজায় রাখিতে গিয়া লুঙ্গী খুলিয়া খানদান রক্ষা করিয়াছিল। উপনির্বাচন সংবিধানে রহিয়াছে, কিন্তু অপ নির্বাচন সংবিধানে নাই। একদিকে আন্দোলনে রহিয়াছে ভাটা অপর দিকে উপনির্বাচনের হাঁটা, ইহাতে কি সৃষ্ট জট নিরসন হইবে? গণতন্ত্রের জন্য উপনির্বাচন হইতে পারে, জিদের জন্য বা জটকে আরো জমাট করিবার জন্য উপনির্বাচন হইবে অপনির্বাচন, দুই পক্ষের ভুল মাশুল দুই পক্ষকে দিতে হইবে। সংবিধানের 'হেফাজত', তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নছিয়তের জিদে কি ভুল নাই? ভুল আছে, তাই আর জিদ নয় সদ ইচ্ছার সংলাপ কামনীয়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সংকটকালে ছাত্রগণ আগাইয়া আসিত, ছাত্রগণ রাজনৈতিক কুম্ভকর্ণদের ঘুম ভাঙ্গাইতেন, কিন্তু এখন?

বর্তমানে সৃষ্ট সংকটকে সংকট না কহিয়া কহিব আমাদের ইচ্ছার জট, 'এই জট' রোগ নিরাময় করিবার বৈদ্য নিনিয়ন বা কেনিয়ন নহে। এই রোগের বৈদ্য হইতেছে ছাত্র সমাজ এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ। রোগী দেখিয়া প্রেসক্রিপসন দিলে চলিবে না, রোগ বুঝিয়া প্রেসক্রিপসন দিতে হইবে।

আমাদের গণতন্ত্র সম্পর্কে বলিতে গিয়া আবুল মনসুর আহমদ একদা কহিয়াছিলেন, আমাদের সমাজ জীবনে গণতান্ত্রিক আচরণ রহিয়াছে। আমাদের সমাজে বিবাহে, মেজবানীতে, দাফন-কাফনে লোকজন লোকজনের মতামত গ্রহণ করে, ইহাও এক প্রকার গণতান্ত্রিক আচরণ। তিনি আফসোস করিয়া কহিয়াছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রে গণতন্ত্র নাই।

জাতিতাত্ত্বিক সমস্যায় জর্জরিত বহুদেশে গণতন্ত্র ঝড়ের পাখীর মত কাঁপিতেছে। ছোট ছোট দেশেও রহিয়াছে জাতিতাত্ত্বিক সমস্যা। জাতিতাত্ত্বিক সমস্যাবিহীন যে দেশ সে দেশের নাম বাংলাদেশ ও মূল ভূখণ্ডে একই জাতির এমন সমাবেশ আর কোন দেশে নাই। ইহাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

একই জাতির বিরাট মেলায় শুধু গণতন্ত্র নহে স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠারও মহাসুযোগ রহিয়াছে।

বিভিন্ন দেশে সম্পদ রহিয়াছে, কিন্তু জাতিগত সম্পদ নাই। রহিয়াছে জাতিগত বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষের আগুনে বিভিন্ন দেশ জ্বলিতেছে। অপরদিকে নব্য সাম্রাজ্যবাদী নিরোগণ বাঁশী বাজাইয়া যুদ্ধের রসদ বেচিতেছে। জাতিগত দাঙ্গায় করাচি কাঁদিতেছে। শ্রীলংকার শ্রী মুছিয়া যাইতেছে। জাতিগত দাঙ্গা ও বিদ্বেষের লিষ্ট আর দীর্ঘ করিতে চাহি না। মূল ভূখণ্ডে এক ভাষা, এক খাদ্য, একবাদ্য, এক

www.pathagar.com

রন্ধন, এক বন্ধন–এমন এক জাতির নাম পূণ্যভূমি বাংলাদেশ–যাহা পৃথিবীতে বিরল।

সাংবিধানিক সংকট বাংলাদেশে কেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রহিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিহত হইলে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হইলেন। রাজীব গান্ধী তখন লোকসভার সদস্য নহেন। তাহাকে পরে লোকসভার নির্বাচনে সদস্য হইতে হইয়াছে।

পাকিস্তান আমলে নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান পূর্ব বাংলা হইতে শূন্য আসনে নির্বাচিত হইয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন।

আমরা বারংবার সংবিধান কাটিয়া নিজেদের প্রয়োজনে সেলাই করিতেছি এবং সংকটকালে দিশাহারা হইতেছি।

যত মুশকিল তত আসান। সংকট অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টির সহায়ক হয়। আমাদের বর্তমান সংকট আগামী দিনের নতুন সৃষ্টির সহায়ক হইবে না এমন কথা কি জোর দিয়া বলা যাইবে?

সংবিধানের হেফাজত আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নসিহতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার তাত্ত্বিক আলোচনা হইয়াছে এবং হইতেছে। বর্তমান সংকট দূরীভূত করিবার জন্য রোগ দেখিয়া প্রেসক্রিপসন দিবার কথা পুনরায় উল্লেখ করিলাম।

বি, এন, পি ও আওয়ামী লীগ সদইচ্ছা প্রকাশ করিলে এই সংকট গণতন্ত্রকে নতুন পথে আগাইয়া দিবে। আমাদের দেশে জাতিগত সংকট নাই। আমাদের সংকট হইতেছে সদইচ্ছার সংকট।

একদা এক সন্তানকে লইয়া দুই নারী কাজীর দরবারে উপস্থিত হইল। দুই জনেই সন্তানের মাতৃত্বের দাবী করিল। এমন সময় কাজী কহিল, একটি ছুরি লইয়া আস, সন্তানকে কাটিয়া দুই ভাগ করিয়া দুইজনকে ভাগ করিয়া দাও। নকল মা কহিল, তাহাই হউক আর আসল মা কহিল, না, আমি সন্তান ভাগ করা চাহি না, সন্তানের দাবীও করিব না।

ইহা শ্রবণ করিয়া কাজী বুঝিতে পারিলেন যে সন্তানের ভাগ চাহিয়াছে সে আসল মা নহে, নকল মা।

সদইচ্ছার বহিঃপ্রকাশের উপর নির্ভর করিবে ক্ষমতা বড় না গণতন্ত্রের মমতা বড়। গণতন্ত্র টিকিয়া থাকিলে ক্ষমতা আসিবে এবং ক্ষমতা শক্তিশালী হইবে। গণতন্ত্রকে নির্বাসিত করিয়া নির্বাচন করিলে ক্ষমতা কর্পূরের মত উড়িয়া যাইবে।

ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়া এক কথা নহে। গণতন্ত্রের মমতার সদইচ্ছায় বর্তমান সংকট দূরীভূত করা সম্ভব। গণতন্ত্রের প্রতি যাহাদের সদইচ্ছা দেখিব, জনগণও তাহাদের দেখিবে।

❐ ৪ঠা আগষ্ট '৯৫

www.pathagar.com

গরিবের খেতাব

একদা জনৈক দার্শনিক এক গোয়ালঘরের পার্শ্বদেশ দিয়া গমন করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন যে, গোয়ালঘরের বেড়ার ছিদ্র দিয়া গরুর একটি লেজ ঝুলিতেছে। লেজটি বারংবার দুলিতেছে। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া অনেকক্ষণ লেজটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন। তিনি বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তাঁহার বিস্ময় উদ্রেকের কারণ হইল এই যে, ছোট ছিদ্র দিয়া গরু প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু উহার লেজ প্রবেশ করিতে পারিল না কেন?

গরুর লেজ লইয়া সে দিন সে দার্শনিকপ্রবর যে সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন উহা নহে, অতীতে ও বর্তমানে অনেকে লেজের সমস্যায় পড়িয়াছেন। লেজের সমস্যা নিরুপণ করিতে যাইয়া জীবন ও জগতের বহুমূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'লেজ' যেমনি জীবনের অনেক নির্দেশ দিয়াছে, তেমনি 'লেজ' মোচড় মারিয়া অনেক কিছুকে কুপোকাত করিয়াও দিয়াছে। লেজতত্ত্ব সোজা নহে। বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডারউইন 'লেজ' গবেষণা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন। মানুষের রূপান্তরের ইতিহাস এই 'লেজ' গবেষণা হইতে আসিয়াছে। কিন্তু সেই গবেষণা এখনো শেষ হয় নাই। বানরের লেজ ধরিয়া ডারউইন মানুষের ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখন যদি কেহ বলেন যে বিবর্তনে হয়ত মানুষের লেজ গজাইয়া মানুষ পুনরায় 'বানর' হইতে পারে তবে তাঁহার সে গবেষণাকে একেবারে ডাষ্টবিনে ছুঁড়িয়া ফেলা যাইবে না। মানুষ বানরে রূপান্তরের গবেষণা না হইলেও কিছু কিছু আলামত ইতোমধ্যে দেখা যাইতেছে। বিশেষ

www.pathagar.com

করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নতশীল রাষ্ট্রের বাঁদরামী যেভাবে প্রকট হইয়া দেখা যাইতেছে উহাতে হয়ত নতুন গবেষকবৃন্দ লেজ খসা তত্ত্বের পরিবর্তে লেজ গজানোর তত্ত্বে মনোনিবেশ করিবেন। মোহাম্মদ রফি বানর নিয়া গাহিয়াছিলেন, তুহ্যায় মেরা চাচ্চা ম্যায় ভাতিজা তেরা /ম্যায় শহরমে পালা তু জঙ্গল মে পালা ইত্যাদি।

অতীতে রাজা বাদশারা মাথায় মুকুট পরিধান করিতেন। পরবর্তীতে নামের পূর্বে মানুষ মুকুট পরাইয়া থাকেন। এই মুকুট হইল জনাব, মিষ্টার, শ্রী, শ্রীযুক্ত, বাবু, হজরত, মওলানা, হাজী, ব্রিগেডিয়ার, অধ্যক্ষ, কাজী ইত্যাদি।

প্রাণী জগতের সকল প্রাণীর লেজ আছে। মানুষও তাহাদের নামের সহিত এক লেজ ব্যবহার করিয়া থাকেন উহাকে পদবী বলা হইয়া থাকে। এ পদবী বংশ পরম্পরায় হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ কোর্টে হলফনামা দিয়া নামের শেষে পদবী যোগ করিয়া থাকেন। বংশ পরম্পরায় পদবী হইল চৌধুরী, পাটোয়ারী, খান, মিস্কী, মজুমদার, দত্ত, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী ইত্যাদি ইত্যাদি।

পদবী অর্জন করা যাইতে পারে, কিছু কিছু নামের পরে কিছু নামের পূর্বে ব্যবহার করা হয়। যেমন পাকিস্তান আমলে তমঘায়ে খিদমত সংক্ষেপে টিকে, সিতারায়ে জুরাৎ (এস, যে,) ইত্যাদি। বৃটিশ আমলে প্রদত্ত টাইটেল রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর, খানসাহেব, স্যার ইত্যাদি নামের পূর্বে ব্যবহৃত হইত।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত খেতাব দুইভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ /ডঃ নামের পূর্বে এবং অন্যান্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নামের পরে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ডিগ্রীর সাথে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটি জুড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী প্রাপ্তগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জুড়িতে দেখা যায় না। মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত পদবীও অহংকারের সহিত নামের সহিত ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

পূর্বে ডবল এম, এ, এবং ফার্ষ্ট ক্লাশও লেখা হইত, আজকাল ইহা খুব বেশী নজরে পড়ে না। নামের সাথে ডিগ্রীর ক্লাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করিয়া প্রহসন করিয়া জনৈক হাস্যরসিক লেখক কৌতুক করিয়াছিলেন এইভাবে–মিঃ অমুক M.F.T. ও T.T.C.M অর্থাৎ মিঃ অমুক ম্যাট্রিক ফেইল থ্রাইস এবং টোটো কোম্পানীর ম্যানেজার। নামের পূর্বে ও পরে পদবী ব্যবহারের কৌলিণ্য ও অহংকার লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক বা ছাত্র প্রতিষ্ঠান যখন নামের সহিত ব্রাকেট যোগ করিয়া অ-আ বা ক-খ, মার্কসবাদী এম, এল ইত্যাদি

www.pathagar.com

যোগ করিয়া থাকেন তখন উহাতে গর্বের বিশেষ কিছু থাকে না। দুধের রঙ সাদা, কিন্তু যখন সাদা দুধ বলা হয় তখন অহেতুক দুধের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সন্দেহ সৃষ্টিতে আমরা বড়ই ওস্তাদ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা ২৪-১২-'৯০ ইং তারিখের ৯/৯১ স্মারক বরাবরে নামের শৃংখলা আনিবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দেশ প্রদান করিয়াছে। এই নির্দেশনামার মধ্যে আছে নামের পূর্বে মোহাম্মদ এবং নামের পরে আহামদ সম্পূর্ণ লিখিতে হইবে। মোং মোহাং মোঃ আং আহাং লিখা চলিবে না।

পারিবারিক উপাধি–চৌধুরী, মজুমদার, পাটোয়ারী, তালুকদার, ভট্টাচার্য ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত না লিখিয়া পুরাপুরি লিখিতে হইবে। চৌং, মজুঃ, পাটো, তালুঃ, ভট্ট লিখা চলিবে না।

পিতার নামের সহিত অর্জিত পদবী যথা হাজী, আলহাজ্ব, মেজর, ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ার, অধ্যক্ষ প্রভৃতি অবশ্যই বর্জন করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কুমিল্লা বোর্ডের পূর্বের সিদ্ধান্ত সঠিক কিন্তু পরের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ পিতার নামের সহিত অর্জিত পদবী যোগ না করানোর মধ্যে ভেদাভেদ রহিতকরণের ইংগিত থাকিলেও উহাকে প্রশংসা করা যাইতে পারে না।

আমাদের সমাজে বৈষম্য রহিয়াছে, পিতার নাম কাটিয়া সাম্য আনা কখনো সম্ভব নহে।

নিজের শিরকে উঁচু রাখিবার জন্য রাজা বাদশাগণ দামী দামী শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন। নেপোলিয়নের টুপিটা ছিল ডবল শীর্ষ মুখী। তাই তাঁহার সেই ডবল মুকুটটির দাম নিলামের বাজারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লেজও মানুষের কম প্রিয় নহে। আগেকার দিনে রাজা রাণীদের পোষাকে লম্বা লম্বা লেজ থাকিত। রাজা–রাণীর লেজ বহন করিবার জন্য বাহকও থাকিত। দর্জীরা রাজা–রাণীর পোষাকে লেজ বানাইত বলিয়া সম্ভবত Tail (লেজ) হইতে Tailor শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

উর্দু কবিরা প্রায় সময় একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এরই সাথে তাহারা তাহাদের জন্মস্থানের নাম জুড়িয়া দেন– যেমন যোশ মলিহাবাদী। আমাদের দেশে কোন নামের সাথে অঞ্চলের নাম যুক্ত হইতে দেখা যায়। যেমন মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আবদুল্লাহ বিন-জালালাবাদী। বিখ্যাত নেহেরু পরিবারের পদবী নেহেরু শব্দটি আসিয়াছে 'নহর' (নদী) হইতে। কথিত আছে কাশ্মীরে নদীর কুলে তাঁহাদের অবস্থান ছিল বলিয়া তাঁহারা এই নামে পরিচিত হইয়া উঠেন।

www.pathagar.com

দেশ নেতাদেরকে জনগণ বিভিন্ন নামে ভূষিত করেন। কাজেম আলী মাষ্টার পরিচিত ছিলেন শেখ-এ-চাটগাম হিসাবে, এ, কে, ফজলুল হক শেরে বাংলা, শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' হিসাবে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাহাদের এ পদবী তাহাদের নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে তিন বিশিষ্ট মহিলা তিনটি ভুবনে ভূষিত। মহিলারা হইলেন যথাক্রমে দেশনেত্রী, জননেত্রী ও দেশজননী। আবার অনেক সময় পদ ও পদবী বিরাট বোঝা হইয়া যায় যেমন- ফার্ষ্ট লেডী। রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন, জয়নুল আবেদীনের পদবী হইতেছে যথাক্রমে বিশ্বকবি, বিদ্রোহী কবি, পল্লীকবি এবং শিল্পাচার্য রূপে। যাহাদের কীর্তি রহিয়াছে তাহাদের পদবীসমূহও রহিয়াছে। অপর দিকে যাহাদের কীর্তি নাই তাহারা মৃত্যুর পর দুর্নামে ভূষিত হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নিজস্ব নাম ছাড়াও গুণগত একটি পরিচিতি রহিয়াছে। জার্মান হেকমতের জন্য, চীন বুদ্ধির জন্য, ফ্রান্স সৌন্দর্যের জন্য, জাপান কারিগরির জন্য। মার্কিন মুল্লুককে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী রূপে, অতীতে বৃটেনকে বলা হইত উপনিবেশবাদী। আমরা কি নামে পরিচিত হইব। আমাদের ত অনেক কিছু রহিয়াছে। ধান আছে, মাছ আছে, গাছ আছে, বাঁশ আছে, ঝগড়া ফ্যাসাদের ঐতিহ্য আছে। তবে কি আমরা মাছের দেশী, বাঁশের দেশী ইত্যাদি বলিব? অন্য কিছু খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে একটি পরিচিতি আমাদের ব্যাপক, উহা হইল আমরা নিত্য উপবাসী। আমাদের চৌধুরী, মজুমদার, দত্ত, ভট্টাচার্য সকল পদবীকে এই 'নিত্য উপবাসী' সামিয়ানাটি আমাদের সকল পরিচিতিকে ঢাকিয়া দিয়াছে।

ভি, সি, আর, ডিশ এন্টেনা, শহরের শত শত রকমের ফলের সমাহার, মিষ্টির দোকান, চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট, বিউটি পার্লার, শপিং সেন্টার, পাজেরোর তীব্র গতি, সংসদে তর্জন গর্জন ইত্যাদি ইত্যাদি, আমাদের নিত্য উপবাসী পরিচিতিকে কোনক্রমে মুছিয়া দিতে পারিতেছে না। নিত্য উপবাসী ইহাই কি আমাদের শেষ পদবী? ইহাই কি চিরদিন গলায় ঝুলিতে থাকিবে? অপরের লেজ ধরিয়া আমরা আর কত নিশিযাপন করিব। বানরের লেজ আছে, অন্যান্য পশুদের লেজ আছে, তবে তাহাদের লেজ দৃশ্যমান এবং লেজ একটি থাকে। কিন্তু আমাদের লেজ বহু এবং এই লেজ মনের গহীনে অবস্থান করে। এই লেজগুলি হইল সাম্প্রদায়িকতা, হীনমন্যতা, দাসত্ববৃত্তি, পরশ্রীকাতরতা, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি। এই লেজগুলিকে কাটিয়া দিতে পারিলেই আমাদের নিত্য উপবাসী খেতাবটি আপনা আপনি খসিয়া পড়িবে।

www.pathagar.com

দুর্ভিক্ষের ব্যাসবাক্য

দুর্ভিক্ষ অর্থ কি? বাংলা ব্যাকরণে ইহা অব্যয়ীভাব সমাস। ব্যাসবাক্য হইল ভিক্ষার অভাব কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা এখনো পর্যন্ত ইহার সঠিক অর্থ প্রদান করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হইতেছে। বিরোধী দল যদি বলেন, অমুক এলাকার চরম দুর্ভিক্ষ, সরকারী দল বলেন– দুর্ভিক্ষ নহে আকাল।

আকাল কবে সকাল হইবে, না আকাল চিরকাল কণ্ঠলগ্ন সহচর হইয়া থাকিবে উহাও বোধগম্য হইতেছে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতে' দুর্ভিক্ষের একটি চমৎকার কাহিনী আছে।

মুচিরাম গুড় ঘুষ খাইয়া, শঠামী, ফেরেববাজী করিয়া বিরাট তালুকের মালিক হইল। চননপুর নামে এক তালুক তাহার হস্তগত হইল। ভজগোবিন্দ তাহাকে তোষামোদ করিয়া বলিলেন, মহাশয় আপনি কখনও তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে, তালুকে যান। মুচিরাম আনন্দিত হইল। ভাবিল, তাইত? এমন

www.pathagar.com

সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না। মুচিরাম খুশী হইয়া ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল।

চননপুর তালুকে বাবু গেল। সে বৎসর নিকটবর্তী স্থানসমূহে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত।

প্রজাবৃন্দ মুচিরাম দর্শনে আসে। কোনদিন পঞ্চাশ-ষাট-আশি, কোনদিন আশি-একশ। যাহাদের বাড়ী নিকটে তাহারা চলিয়া যায়। একদা একশত প্রজা আসিল। হিসাব-নিকাশ করিতে তাহাদের সময় কাটিয়া গেল, তাহাদের রাত্রি যাপন করিতে হইবে। তাহারা রান্না করিয়া মাঠে খাইতে বসিল।

এমন সময় সেই মাঠের নিকট দিয়া অশ্বযানে একটি সাহেব যাইতেছিলেন। সাহেবের নাম মীন ওয়েল। তিনি এ জেলার ম্যাজিষ্ট্রট কালেক্টর। সাহেব দুর্ভিক্ষ তদারকে বাহির হইয়াছিলেন। নিকটস্থ গ্রামে তাহার তাঁবু পড়িয়াছিল। তিনি তখন অশ্বারোহনে তাঁবুতে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন একটা বাগানের ভিতর কতগুলি লোক ভোজন করিতেছে। দেখিয়া তিনি সহজে সিদ্ধান্ত করিলেন ইহারা সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত, উপবাসী দরিদ্রলোক। কোন বদান্য ব্যক্তি ইহাদের ভোজন করাইতেছে। সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য নিকটে একজন চাষাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

চাষা ইংরেজী জানে না, সাহেব উত্তম বাঙ্গালা জানেন। পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। সুতরাং চাষার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। সাহেব চাষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'টোমাডিগের গড়ামে ডুরবেক্কা কেমন আছে? চাষা জানে না 'ডুরবেক্কা' কাহাকে বলে। সে ফাঁফরে পড়িল। ডুরবেক্কা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম হইবে ইহা একপ্রকার স্থির হইল। কিন্তু কেমন উহার উত্তর দিবে? যদি বলে যে, সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না তাহা হইলে সাহেব হয়ত এক ঘা চাবুক দিবে, যদি বলে যে ভাল আছে, তাহা হইলে সাহেব হয়ত 'ডুরবেক্কাকে' ডাকিয়া আনিতে বলিবে। তাহা হইলে কি করিবে চাষা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিল, বেমার আছে।

ঃ বেমার Sick?

সাহেব ভাবিলেন- অসুখ থাকিতে পারে। এই লোক বড় বোকা। আমি বলিতেছি ডুরবেক্কা কেমন আছে, অধিক আছে কিংবা অল্প আছে।

এখন চাষা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে এ যখন সাহেব তবে অবশ্য হাকিম। হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে ডুরবেক্কা অধিক আছে কি অল্প আছে।

www.pathagar.com

তখন ডুরবেক্কা একটা ট্যাক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবিল, কই ডুরবেক্কার ট্যাক্স দিই না। কিন্তু যদি বলি আমাদের গ্রামে সে ট্যাক্স নাই তবে বেটা এখনই ট্যাক্স বসাইয়া যাইবে। অতএব মিছা কথা বলাই ভাল। সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, টোমাডের গড়ামে ডুরবেক্কা অটিক কিংবা অল্প আছে?

চাষা উত্তর দিল, হুজুর আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুরবেক্কা আছে।

সাহেব ভাবিলেন, হাঁ আমারও মনে হয় অটিক আছে। পরে যে সকল লোক খাইতেছিল তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বোজন করিল (ভোজন করাইল অর্থে)

চাষাঃ প্রজারা ভোজন কোচ্চে।

সাহেব চটিয়া কহিলেন, টাহা আমি জানে। They eat that I see, but who pays? টাকা কাহার?

চাষা জানে যে যত টাকা আসিতেছে সকলই জমিদারের সিন্দুকে যাইতেছে। সে নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল। অতএব এবার বিনা বিলম্বে উত্তর করিল, টাকা জমিদারের।

সাহেব ভাবিল, জমিদার এ মহাদুর্ভিক্ষের দিনে ইংরেজ রাজত্বের প্রতি আনুগত্যবশত সঠিক কাজটি করিতেছে।

ঃ জমিদারের নাম কি?

চাষা ঃ মুচিরাম রায়।

সাহেব ঃ কট ডিবস বোজন কড়িয়াছে?

চাষা ঃ তা, ধর্মাবতার, প্রজারা রোজ রোজ আসে খাওয়া-দাওয়া করে।

সাহেব ঃ এই গড়ামের নাম কি?

চাষা ঃ চননপুর।

সাহেব নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিল দিয়া লিখিলেন-

দুর্ভিক্ষের রিপোর্ট।

চননপুরের জমিদার বাবু মুচিরাম রায় তাহার রায়তদের এক বিরাট অংশকে প্রতিদিন ভোজন করায়।

সাহেব চলিয়া গেলেন।

www.pathagar.com

চাষা গ্রামে রটনা করিল, সাহেব টাকায় আট আনা ট্যাক্স বসাইতে আসিয়াছিল। বুদ্ধি কৌশলে বিমুখ হইয়াছে। মীনওয়াল সাহেবের ফেমিন রিপোর্ট সরকারের উচ্চধাপে প্রেরণ করিল। মুচিরাম জমিদারদিগের আদর্শ স্থানে। এ দুঃসময়ে অন্নদান করিয়া সকল প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

মুচিরাম গুড 'রাজবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিলে লঙ্গরখানার জন্য রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু বৃটিশ আমলের বদ খাচিয়ত হইতে আমরা বিমুক্ত হইতে পারি নাই। মানুষ ঠকাইবার বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির নতুন ঢঙ্গে নতুন ছাঁদে হাজির করিয়া সুযোগ বুঝিয়া নিরন্ন নিরক্ষর নির্বোধ মানুষদের ঘাড়ে চড়াইয়া দিতেছি।

চৈত্রের চৌচির মাঠের শক্ত ঢেলা বর্ষার পানির সংস্পর্শে গলিয়া যেমন কাদা হইয়া যায় বাংলাদেশের মানুষও তেমনি নরম সুরের কথায় বিগলিত হইয়া পড়ে।

ভাল-খারাপ অনেক কিছু ভুলিয়া যায়। এইত সে দিনের কথা। ইরাকের যুদ্ধের সময় সাদ্দাম হোসেনের নামে এই দেশের মানুষ পাগল হইয়া উঠিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের কুশ পুত্তলিকা ফাঁসীতে ঝুলানো হইল। ইরাকের কপালে পরাজয় জুটিল। আমরা আর দেরী করিলাম না। এক রাত্রির মধ্যে সকলে হিমশীতল হইয়া রহিলাম, এই পূর্বেকার রৌদ্র করোটির তেজ বিন্দুমাত্রও উত্তপ্ত করিতে পারিল না। আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ ঢুকিয়া যায় না। সোডা খাইলে যেমন গ্যাষ্ট্রিকের কামড়ি কয়েক দিবস দমিয়া থাকে, তদ্রুপ দুর্ভিক্ষ বা আকাল রিলিফের ঠ্যালায় কিছুদিন নিরবে অবস্থান করে।

দুর্ভিক্ষের বিবৃতি দান বন্ধ থাকে। আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বিবৃতির হিড়িক পড়ে।

বাংলা ব্যাকরণে দুর্ভিক্ষের ব্যাসবাক্য যাহা হউক না কেন, সরকারী দল বা বিরোধীদল যে দৃষ্টিতে দেখুন না কেন, সোজা কথায় অন্নের নিদারুণ অভাবের নাম দুর্ভিক্ষ।

যে দেশে মাত্র পনের দিনেই সবজী উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সুফলা দেশে খাদ্যাভাব ভাগ্যের এক নিদারুণ পরিহাস। এক এক আকালের কাল সামলাইতে দরিদ্র মানুষ নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। যাহার জমি যাইতেছে সে আর জমি ফিরিয়া

www.pathagar.com

পাইতেছে না, যাহার হালের বলদ যাইতেছে তাহার হালের বলদ আর যোগাড় হয় না।

যে স্ত্রী হাতের কাঞ্চন হাতছাড়া করিতেছে, সে হাতে উঠিতেছে কাচ। দরিদ্রের অভাবের ব্যাপ্তি অত্যন্ত বেশী, খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, বাসস্থানের অভাব, চিকিৎসার অভাব, চাউল, ডাল, তেল, নুন, মরিচের অভাব, অভাব আর অভাব, অভাবের শেষ নাই।

আর অপরদিকে ফ্রিজ, রঙ্গীন টিভি, ভি, সি, আর, পাজেরো গাড়ী, আঙ্গুর, পোস্তা, কিসমিস, আপেল, কমলা, নাসপতি, খোরমা, খেজুর, লং, এলাচি, দারুচিনি, চিকন চাউল, ঘি, মিষ্টির দোকান, চাইনিজ হোটেল, পিস্তল, বোমা, ককটেল, কাটা রাইফেল, দেশী স্টেনগান, চাইনিজ কুঠার, ক্ষুর, অটোমেটিক চাকু ইত্যাদি ইত্যাদি সামগ্রীর কোন অভাব নাই। সকাল, বিকাল আকাল নাই।

শহরে এলিটদের গৃহেও খাদ্যে, বসনে ও ভূষণে, অঞ্জন-ব্যাঞ্জনে নিত্য নতুনের যে হাওয়া উহাতে গর্ববোধ হওয়া উচিত (?)।

পাকিস্তান আমলে কবি গোলাম মোস্তফা বি, এ, বি, টি, (অগত্যা পত্রিকায় যাহাকে গোলমাল মোস্তফা ইয়ে টিটি বলিয়া ঠাট্টা করিত) লিখিয়াছিলেন–

লুঙ্গী আর গেঞ্জী পাব

পাবনাতে ভাই ভাবনা কি

লুঙ্গী আর গেঞ্জী পাওয়ার গানে আমরা একদা আত্মহারা হইয়াছিলাম, মালদহের আমের কথাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু মালদহ যে তখন ভারতের অংশ সে খেয়াল কবির ছিল না।

ইংরেজ সাহেবের কথিত 'ডুরবেক্কা' যেমন সেদিন চাষা বুঝিতে পারে নাই, বর্তমানের নির্বোধ চাষাগণ এখনো দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে বুঝিতে পারে না, বুঝিতে পারেনা শঠরাজ মুচিরাম কিভাবে 'ডুরবেক্কার' জোরে মহারাজ বাহাদুর ভূষিত হইলেন।

প্রতি আকালে নির্বোধগণ সব কিছু বেচিয়া কংকালসার হইয়া দিন দিন কাংগাল হইতেছে, অপর দিকে মুচিরাম গুড়ের উত্তরসুরীগণ এ সুযোগে নতুন জমিদার বনিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। তারাই গ্রামাঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রায়বাহাদুর, খান বাহাদুর খেতাব দিবার নিয়ম চালু করিলে উহা শঠদের প্রাপ্য হইবে।

www.pathagar.com

কোনটা বাংলা?

আব্বা রিকসা করিয়া গুলিস্তান সিনেমায় গেলেন।

ইহা কি বাংলা ভাষা?

হ্যাঁ ইহা বিশুদ্ধ বাংলা।

The goondas gherowed the Reazuddin Bazar.

ইহা কি ইংরেজী?

হ্যাঁ ইহা বিশুদ্ধ ইংরেজী।

দেখা যাইবে প্রথম বাক্যে আব্বা আরবী, রিকশা জাপানী, গুলিস্তান ফারসী, সিনেমা ইংরেজী। বাক্যটি বিশুদ্ধ বাংলা। দ্বিতীয় বাক্যে মাত্র The শব্দটি খাঁটি ইংরেজী Article.

আমরা গরম ভাতে ঘি না দিয়া পান্তা ভাতে অনেক সময় ঘি দিয়া ঘি ও পান্তাভাতের স্বাদ বিস্বাদ করিয়া তুলি। বাংলা গদ্যের উন্মেষ যুগ হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত খাঁটি বাংলা শব্দ আমরা খুঁজিতে যাইয়া বাংলা ভাষার ব্যাপক শক্তিকে

www.pathagar.com

দিন দিন খর্ব করিয়া ফেলিতেছি। হীনমন্যতা ও সাম্প্রদায়িকতা আমাদের এই ভাষার শক্তিকে খর্ব করিয়া দিতেছে। উদ্ভাবন, উৎপাদন, বিপণন, ব্যবস্থাপন হইতে এই ভাষাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার হীন ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভাষার কোন আদর্শ নাই। যে কোন আদর্শ যে কোন ভাষায় প্রচার করা যায়। ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের জন্য নয়। ভাষা এখন জীবন জীবিকার মাধ্যমও বটে।

শব্দ ভাষার প্রাণ, কিন্তু শব্দ ভাষা নহে। ভাষা রীতির শৃংখলে আসিয়া শব্দ শব্দের সহিত মিতালী পাতিয়া যখন মনের ভাব প্রকাশ করে তখন হয় ভাষা। পশুপাখী, বাস ট্রেনের ইঞ্জিনও শব্দ করে, কিন্তু সে শব্দ ভাষার পদবাচ্য নহে। কিন্তু সে শব্দগুলিকে ভাষায় আনিলে তখন তা পদ হইয়া যায়। কোকিল কু কু করে, রেলগাড়ী হিস হিস করিয়া চলে। বাক্যের খণ্ড অংশ পদ। সব শব্দ তাই বলিয়া পদ নহে। শব্দকে যখন বাক্যের পিঁড়িতে বসানো হয় তখনই তা পদ।

আমাদের ভাষার শব্দ তৈয়ারীর ফ্যাক্টরীগুলির নাম হইতেছে– সমাস, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ, অনুসর্গ, সন্ধি ইত্যাদি। নতুন শব্দ তৈয়ারীর ক্ষেত্রে এ 'ফ্যাক্টরী অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। ভীরু কাপুরুষ, হীনমন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বাংলা ভাষার এই ফ্যাক্টরীকে অচল করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য! আমাদের এ ভাষা আপন গতিতে আগাইয়া যাইতেছে। ভাষায় শব্দ বর্জন ও গ্রহণ কাহারো ইশারাকে তোয়াক্কা করিতেছে না। পুরাতন শব্দ বিদায় নিতেছে। নতুন শব্দ আসিতেছে এবং আসিতে থাকিবে। ইংরেজী আংকেলের স্ত্রীলিঙ্গ আন্ট (Aunt), কিন্তু আমাদের সমাজে যে আন্ট আন্টি হইয়া মাসি, পিসি, খালা, ফুফুকে আপন মনে সাদরে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে।

রেল বিদেশী শব্দ, গাড়ী দেশী। উহা সমাসের ফ্যাক্টরীতে পড়িয়া রেলগাড়ী শব্দ হইয়াছে। রেলের উপর চলে যে গাড়ী। তেমনি হইয়াছে মোটর চালিত যে গাড়ী = মোটর গাড়ী।

নীল সিয়া আসমান
লালে লাল দুনিয়া
আম্মা লাল তেরী
খুন কিয়া খুনিয়া। **(নজরুল)**

এ কবিতা চরণের শেষ অংশের সব শব্দ বিদেশী এবং এর ক্রিয়া পদ উর্দুর মত, ইহাকে বাংলা ভাষার আদর্শ হিসাবে ধরা যাইবে না। কারণ এই রীতি,

www.pathagar.com

আমাদের ভাষার আদলে নাই। বটতলার পুঁথিতে এই আদর্শকে তথাকথিত ঐতিহ্যের ধারক বাহকগণ একদা হাততালি দিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাত টিকে নাই বরং বাঙ্গালী মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দ প্রতিভাধর হইয়াও অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত অশ্বডিম্ব প্রসব করিয়াছিল। মুসলমান কবি আলাওল যে ক্ষেত্রে পদ্মাবতী রচনা করিলেন তাহার উত্তরসূরী বাংলা সাহিত্যের মহা প্রবহমানতার যুগে রচনা করিল গুলেবকাওয়ালী, সোনাবান ইত্যাদি পুঁথি।

'ভুরুর ভঙ্গিমা দেখে লুকাইল ভুজঙ্গ সকল।' (পদ্মাবতী, আলাওল) আর সোনাবান মার্কা পুঁথির বাক্য হইল 'তেরা সাথ মেরা বাত ছিল বহুৎতর' অথবা অবান্তর বাক্য 'সৈন্য মরে লাখে লাখে কাতারে কাতার। শুমার করিয়া দেখে পঞ্চাশ হাজার।'

পৃথিবীর সকল ভাষা অন্য শব্দকে হজম করিতে পারে না। উর্দু-হিন্দী-ইংরেজী যেমন সহজে অন্য শব্দ হজম করিতে পারে বাংলা ভাষাও তেমনি সহজে অন্য শব্দ গ্রহণ করিতে পারে।

আজিকার ইংরেজী ভাষার শতকরা ৮০% ভাগ বিদেশী শব্দ। ইহাতে ইংরেজী ভাষার জাত যায় নাই বরং ইহা এখন বিশ্বের ভাষার একমাত্র বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্যারীচাঁদ মিত্ররা যখন নতুন বাংলা কথ্যভাষা চালু করিতেছিল তখনকার ভীতুরা আতংকিত হইয়া সে নব্য রীতির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল, ঠাসিয়া সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় গুঁজিয়া দিতে চাহিল। বঙ্কিম চন্দ্র আসিয়া ইহার মিমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, এ রূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতনুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে বিষয় অনুসারে রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিৎ। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সকলে বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায় অর্থ গৌরব থাকিলেই তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে, যতটুকু বলিবার সবটুকু বলিবে। তজ্জন্য ইংরেজী, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।

আমাদের ভাষায় শব্দ ব্যবহারের কথা বলিতে যাইয়া ডঃ শহীদুল্লাহ বলিয়াছেন, যেমন আমরা বাংলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এক মিশ্রিত জাতি, আমাদের ভাষা বাংলাও তেমনি এক মিশ্রিত ভাষা।

www.pathagar.com

ভাষায় জোর করিয়া সংস্কৃত ঢুকানো বা ধর্মের নামে আরবী ফার্সী শব্দ ঢুকানোর বিরুদ্ধেও ডঃ শহীদুল্লাহ ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন–

ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়, গোঁড়ামী গোঁড়ামীকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত করতে চেয়েছে, তেমনি আরও একদল বাংলাকে আরবী ফার্সী ঘেঁসা করতে উদ্যত। একদল চাচ্ছে বাংলাকে বলি দিতে আর এক দল চাচ্ছে জবেহ্ করতে। একদিকে কামারের খাড়া অপর দিকে কসাইয়ের ছুরি।

তিনি আরো বলিয়াছেন যে, নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষাও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (Style) ও গতি কোন নির্দিষ্ট ধরা বাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না।

ঘষেমেঝে রূপ ধরেবেঁধে পীরিত যেমন, নিয়ম বেঁধে ভাষার রীতি শেখানোও তেমন। অবশ্যই প্রয়োজনবোধে খাম খেয়ালিতে নয়। সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ইংরেজী, জার্মান, রুশ যে কোন ভাষা থেকে আমাদের শব্দ ধার করতে হবে।

আমাদের মানস ঐশ্বর্য আরো সমৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শব্দ ব্যবহারে কিছু কিছু সংস্কার বোধ থাকিবে। যেমন বাংলায় দুর্গাপূজার দাওয়াত আর ওরশের নিমন্ত্রণ সহজে অনেকে মানিয়া নিবে না। কিন্তু উর্দু /হিন্দীতে দুর্গাপূজাকা দাওয়াত বলিবে। এবাদত শব্দটি মুসলিম ধর্মীয় প্রতিশব্দ ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করিলে অনেকে উদ্ধত হইয়া যাইবে। কিন্তু উর্দু বা হিন্দিতে এ শব্দ অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিছু কিছু সংকোচ থাকাটা অস্বাভাবিক নহে। তবে ইহাকে উহার লেজ ধরিয়া ভাষাকে পিছন দিকে টানিয়া রাখা প্রগতির লক্ষণ নহে।

যে ক্ষেত্রে খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ সে ক্ষেত্রে আমরা খাঁটি বাঙলা শব্দ ব্যবহার করি না। যেমন উৎপাদিত দ্রব্যের নামকরণে ভবন বা বিপনী কেন্দ্রের নামকরণে আমরা খাঁটি বাংলা শব্দ বা বাংলা ইতিহাস ঐতিহ্যের স্মারক ব্যবহার করি না।

৭১ সালের পূর্বে এবং ৭১ সালের কিছু পরে খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যবহার ও বাঙ্গালী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এখন যা সম্পূর্ণ বিপরীত। ৭১ সালের পূর্বে বিপনী কেন্দ্রের নাম মৌচাক, বিপনী বিতান (ইহা মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম পর্ব হইতে নেওয়া হইয়াছে) রমনা সিগারেট, পিয়া টুথ পেষ্ট, বলাকা ব্লেড ইত্যাদি।

ইহার পরিবর্তে আসিয়াছে –

www.pathagar.com

সৌদিয়া মার্কেট, লাকী প্লাজা,মিমি সুপার মার্কেট,সি-বোঁ, মেনোলা ইত্যাদি অর্থাৎ বিদেশী শব্দ না দিলে যেন আমাদের দ্রব্য জাতে উঠে না। আবার অন্যদিকে নিম্ন মধ্যবিত্তে দ্রব্য সামগ্রীর নাম খাঁটি বাংলায় রূপবান শাড়ী, আলমের পঁচা সাবান, বক মার্কা সাবান, রূপসা সেন্ডেল, আবুল বিড়ি, আকিজ বিড়ি ইত্যাদি। অন্যান্য দেশে তাহারা তাহাদের ঐতিহ্যের দিকে নজর দিয়া তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের নামকরণ করে। যেমন ব্রিটেনেকা বিস্কুট, মেরী বিস্কুট, হারকিউলাস সাইকেল, মিনার্ভা থিয়েটার (গ্রীক উপাখ্যানের নায়ক নায়িকার নাম)।

মারুতী এবং বংশের TATA BIRLA ইত্যাদি। আমাদের 'গ্রামীণ ব্যাংক' একটি উত্তম উদাহরণ। আমাদের রেলওয়ের নামকরণগুলি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

আমাদের জন্য বিদেশী শব্দ আসিলে বিপনী কেন্দ্র ও উৎপাদিত দ্রব্যে বিদেশী নাম অবশ্যই বর্জন করিতে হইবে। বিদেশী নাম যাহারা গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে কোন প্রকার সরকারী আধাসরকারী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হইতে সাহায্য প্রদান বন্ধ করিতে হইবে।

আমাদের বর্ণমালা ও বাক্য রীতি হইল আমাদের ভাষার আসল পরিচয়। এই পরিচয়ের বন্ধনে শব্দ আনিব, রাখিব। আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য আমাদের ভাষায় সবটুকু শক্তিকে ব্যয় করিতে হইবে। আমাদের বর্ণমালাকে আজো শতকরা ৭০ জনের কলমে ও নজরে আনানো যায় নাই। কলমের শীষ ও লাঙ্গলের ঈষকে এক করিতে হইবে। শহীদ দিবসে আমাদের উচ্চকিত প্রার্থনা হইতে হইবে– বাঙালী যেন নিরক্ষরতার পাপ লইয়া মৃত্যুবরণ না করে।

আমাদের ভাষাকে হীনমন্যতা ও সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়া হইতে বাঁচাইতে না পারিলে আমাদের ৪৯টি বর্ণমালাকে শতকরা ১০০ জনের কলমে ও নজরে যতদিন আনিতে পারিব না ততদিন ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মা কি তৃপ্ত হইবে।

পাদটীকা ঃ লিজ টেইলর দুই ডালি (৮ খানা) বিবাহ শেষ করিবার পর সম্প্রতি কহিয়াছেন, বিবাহে মোর আর নাহি স্বাদ। এইবার তিনি খায়েশ করিয়াছেন যে তিনি মাইকেল জ্যাকসনের পুত্রের গড মাদার হইবেন। তবে মাইকেল জ্যাকসন কি God father হইবেন? হইলে কোন দেশের হইবেন।

❐ ২১শে ফেব্রুয়ারী '৯৭

www.pathagar.com

বিশুদ্ধ ভেজাল ও খাঁটি নকল

নকল ও ভেজাল আমাদের দেশে বহুল আলোচিত শব্দ। কিন্তু আমাদের দেশে বিশুদ্ধ ভেজাল ও খাঁটি নকলের দারুণ অভাব রহিয়াছে। আমাদের দেশে যাহা আছে বা চলিতেছে উহা হইল নকল ভেজাল ও ভেজাল নকল।

যে রসায়ন শাস্ত্র লইয়া দুনিয়া তোলপাড় হইতেছে উহাও একটি বিশুদ্ধ ভেজাল শাস্ত্র। রসায়ন শাস্ত্রের মধ্যে বিন্দুমাত্রও রস নাই। যাহা আছে উহা কস। তাই উহাকে কসায়ন শাস্ত্র বলিলে সঠিক হইত। কেমিষ্ট্রি/কেমিষ্ট আলকেমী/ কিমিয়া শাস্ত্র হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই কিমিয়া শাস্ত্রবিদগণ নকল সোনা বাহির করিবার জন্য চেষ্টা তদবির করিয়াছিলেন, উক্ত চেষ্টাকে কোন প্রকারে বিফল চেষ্টা বলা ঠিক হইবে না।

তর্কশাস্ত্রে গণনাত্মক আরোহ হইতেছে এক প্রকার অপ্রাকৃত আরোহ, বা তথাকথিত আরোহের একটি । উহার একটি উদাহরণ হইতেছে– যদি কোন বাগানের একশত গাছের প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে দেখিয়া বলি, এই বাগানের সকল গাছই লিচু গাছ, যেহেতু এই বাগানের প্রত্যেকটি গাছকে প্রত্যক্ষ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কিন্তু ইহাতে আরোহ কোথায়? ইহাতে উল্লম্ফ নাই। জানা হইতে অজানার কোন নির্দেশ নাই। তবুও তর্কশাস্ত্রে এই উদাহরণ কেন? জানা হইতে অজানায় যাইবার এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া জানিবার জন্যও জানার প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহা বিভিন্ন বচনকে একটিমাত্র সমষ্টি দান করিয়াছে। এই বাগানের সকল গাছই লিচু গাছ।

সেই সূত্র মোতাবেক বলিতে হইতেছে, অতীতের রসায়ন শাস্ত্রের ভেজালবাজী বা ভোজবাজীর চেষ্টাও নিরর্থক নহে। পুরাতনের কস বাহিয়া নতুন কসে সিক্ত হইয়া রসায়ন বিশুদ্ধ শাস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখনো রসায়ন রসের সহিত কস, কসের সহিত রস, নকলের সহিত ভেজাল আর ভেজালের সহিত নকল মিশাইয়া

www.pathagar.com

একটি নতুন কিছু বাহির করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার, সাহিত্য শিল্পের প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলের এক বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে। মানুষের জন্ম পাঁচ লক্ষ বৎসরের কম হইবে না। এই পাঁচ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ বিভিন্ন জিনিষকে নকল করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

সকল মানুষের আদি প্রবৃত্তি। পশু পাখী নকল আর ভেজাল করিতে জানে না। নকল আর ভেজাল একান্তভাবে মানুষের মেধার সৃষ্টি। নকল শুরু হইল সভ্যতার আলো প্রবেশ করিবার সময় হইতে, তাই নকল আদি আর ভেজাল হইল আধুনিক। তাই বলা চলে ভেজাল হইল নকলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

মানুষ নকল করিতে যাইয়া বা ভেজাল মিশাইতে যাইয়া সব সময় ব্যর্থ হয় নাই। নকল ভেজালের দোলা-দোলানীতে মানুষ বহু নতুন কিছু আবিষ্কার করিয়াছে, নকলবাজী উদ্ভাবনের প্রেরণা দান করিয়াছে। মাছের সাঁতার নকল করিতে যাইয়া মানুষ সাবমেরিন বানাইয়াছে। পাখীর মত উড়িতে যাইবার বাসনা করিয়া উড়োজাহাজ বানাইয়াছে। পাখীর সুরের নকল করিতে যাইয়া গানের সুর গলায় চিরদিনের জন্য আটকাইয়া রাখিল। শিল্পের মাধ্যম ভাস্কর্য চিত্র, নৃত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য জীবনকে নকল করে। এই নকল করাকে আমরা সুন্দর ভাষায় অনুকৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি।

এক সময় বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং এর পরবর্তী বেশ কয়েক বৎসর জাপানী মাল বলিতে নকল সামগ্রী বলা হইত। সে জাপান মাত্র ৫০ বৎসরের মধ্যে নকলের ধকল সামলাইয়া, নকল-নকল খেল করিয়া গোটা বিশ্বের বাজার সামগ্রী দিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছে।

জাপান কোন প্রকার আদর্শ মতবাদ জীবন দর্শন বিপ্লব ইত্যাদি প্রচার বা পাচার করিয়াছে বা করিতেছে বলিয়া এখনো পর্যন্ত জানা যায় নাই। প্রযুক্তিকে নকল করিয়া তাহারা তামাম দুনিয়ার বাজার দখল করিয়া লইয়াছে।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষ জিঞ্জিরার কথা শুনিলে নাক সিঁটকাইয়া উঠেন। গাইতে গাইতে গায়ক হয়। বাজাইতে বাজাইতে বাদক হয়। ভাইসব, ভাইসব বলিয়া মাইক ফুঁকাইয়া নেতা হইয়া থাকে। জিঞ্জিরাতে সে কসরত চলিতেছে। উহাকে স্বীকৃতি প্রদান করিলে আমাদের অসুবিধা কোথায়? জিঞ্জিরা প্রযুক্তিবিদগণের সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি হইলঃ

একদা বাংলাদেশের এক বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের উৎপাদন ফাঁকি বন্ধ করিবার জন্য জাপান হইতে একটি রোবট ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল।

কিছুদিন যাইতে না যাইতে রোবটটি তালবেতাল কাজ শুরু করিল। যে কোম্পানী হইতে রোবটটি ক্রয় করা হইল সে কোম্পানীকে জরুরী ভিত্তিতে রোবটের তালবেতাল আচার-আচরণের সংবাদ জানাইয়া ফ্যাক্স করা হইল।

www.pathagar.com

জাপানের কোম্পানী এবং জাপান সরকার এই সংবাদ পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। ইতোপূর্বে 'মরিনাগা' দুধের ক্ষুদ্র সংবাদটি 'মরিনাগা' দুধ কোম্পানীর বারোটা বাজাইয়া দিয়াছিল।

জাপানী রোবটের দুর্নীতির কথা যদি একবার বাংলাদেশের পত্রিকায় প্রকাশ পায় তবে কোম্পানীর লালবাতি জ্বলিবে। আর যাহাই থাকুক না কেন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের খুঁটির জোর খুব বেশী।

অবশ্য সংবাদপত্রের সংখ্যাও বেশী। তাহারা কালক্ষেপণ না করিয়া রোবটের আচরণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ৭ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল প্রেরণ করিল। তাহারা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ঠিক করিল মেধাবান কোন বাঙালী কারিগর রোবটের চরিত্র পাল্টাইয়া দিয়াছে। তখন তাহারা বাংলাদেশ সরকারের নিকট বলিলঃ

এই রোবটের চরিত্র মেধাবান কোন বাঙালী কারিগর পাল্টাইয়া দিয়াছে। যিনি এই কাজ করিয়াছেন তিনি আমাদের ওস্তাদের ওস্তাদ বলিয়া নত মস্তকে স্বীকার করিতেছি। অতএব তাহাকে সর্বোচ্চ বেতন দিয়া আমরা আমাদের উপদেষ্টা করিবার প্রস্তাব করিতেছি।

আদতেই বাঙালীর মেধা পৃথিবীর বিস্ময়। আমরা আরো দেখিয়াছি যে বাঙালীরা ভেজাল করিতে যাইয়াও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে। যেমন অনেক স্থানে লেখা থাকে, এইখানে খাঁটি গরুর দুধ বিক্রি হয়। দুধ বিক্রেতা ভুলক্রমে দুধ খাঁটি কিনা উহা প্রকাশ করে না। গরু নানান জাতের নানান রঙের হইতে পারে, কিন্তু নকল গরু বা ভেজাল গুরু হইতে পারে না। গরুর রচনা পরীক্ষার হলে নকল হইয়াছে ও হইতেছে। ভবিষ্যতে পরীক্ষার হলে গরুর রচনা নকল বন্ধ হইবে বলিয়া খুব বেশী আশা করা যাইতেছে না।

পরীক্ষার হলে আমরা যে নকল বলি ও আদতে নকল নহে। কেহ যদি মোহাম্মদ রফির কণ্ঠ নকল করে, তবে বুঝিতে হইবে তাহার মেধা ও শ্রম আছে। কাহারো কণ্ঠ নকল করিতে হইলে শ্রম ও মেধার একান্ত প্রয়োজন। নকল মানেই নতুন কিছু আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা, পরীক্ষার হলে নকল কি সৃষ্টিধর্মী? উহা হইল চৌর্যবৃত্তি। উহার নাম নকল না বলিয়া চোরাকল বা চুরি কল বলিলে সর্বোত্তম হইবে।

পরীক্ষার হলে কেয়ামত পর্যন্ত গরুর রচনা নকল করিলে গো সম্পদ বৃদ্ধি লাভ ঘটিবে না। অন্যান্য দেশে গো সম্পদ কেমন করিয়া বৃদ্ধি করিতেছে উহা যদি নকল করি তবে গো সম্পদ অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের বাড়ীতে এক দুধওয়ালা রোজ দুধ দিয়া যাইত। দুধওয়ালার লম্বা সিকার কয়েকটি পিতলের কলসী ছিল। সে নিজে দুধ বহন করিত না, একজন ভাঁড় তাহার পরিবর্তে কাজ করিত। একদিন

www.pathagar.com

দেখিলাম খালী কলসীতে সে ওই ভাঁড়টি দিয়া কয়েক ঘটি পানি একটি কলসীতে ফেলিল। এরপর অপর কলসী হইতে দুধ লইয়া সে পানি দেওয়া কলসীতে ঢালিতে লাগিল। প্রায় সময় সে এই প্রকারের পানির সহিত দুধ মিশাইত, দুধের সহিত সে পানি মিশাইত না।

তাহার দুধ খাঁটি কিনা জানিতে চাহিলে সে রাগিয়া চিৎকার করিয়া কহিতঃ কোন শালা দুধে পানি দেয় ..... এই দুধ আমি নিজে গোরুরবাট দুহিয়া আনিয়াছি। দুধে পানি দিলে গরুর বাচ্চা কি বাঁচে? অতি উত্তম কথা। কারণ সেত দুধে পানি মিশায় নাই, সে পানিতে দুধ মিশাইয়াছে, উহা হইল চালাকী ভেজালের উদাহরণ। সত্য কহিবার এমন টনটনে জ্ঞান আমি আজ পর্যন্ত খুব কম লোকের মধ্যে দেখিয়াছি। গলাকাটা পাসপোর্ট করিয়া যাহারা টাকা কামাইতেছে তাহারা পঞ্চাশ ভাগ বিশুদ্ধ নকল করিতেছে।

কথা হইল নকল ও ভেজালের সংজ্ঞা কি? বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধোঁকা খাইয়া আমি যে সংজ্ঞাটি নকলভাবে তৈয়ার করিয়াছি, সে মতে নকল ও ভেজালের সংজ্ঞাটি নিম্নরূপঃ

নকল হইতেছে অন্য কোন ভাব, আচার, আচরণ, রং, দৃশ্য, বস্তু অন্যভাবে উপস্থাপন, সৃষ্টিকরণ, বিতরণ, বিপণন বা ব্যবস্থাপন বা উত্থাপন করা আর ভেজাল হইল কোন তরল বায়বীয় বা কঠিন বস্তুর সহিত সমগোত্রীয় স্বল্প মূল্যের অন্যবস্তু অহেতুক অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ ঘটাইয়া লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিয়া অধিক মুনাফা অর্জনের নাম ভেজাল।

সোনাতে রাঙ বা খাদ দেওয়া ভেজাল নহে, কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণে সোনায় খাদ বা রাঙ্ না মিশাইলে স্বর্ণালংকার তৈয়ার করা সম্ভব হইবে না।

আমাদের দেশে যাহারা নকল ও ভেজাল করিয়া থাকে তাহারা খাঁটি ভেজাল ও বিশুদ্ধ নকল করিতে পারে না, তাহারা যাহা করে নকল ভেজাল ও ভেজাল নকল করিয়া থাকে।

শোনা যাইতেছে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হইতেছে। অতএব প্রস্তাব করিতেছি, বিশুদ্ধ ভেজাল ও খাঁটি নকলের জন্য একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক। আমাদের মেধা বিভিন্নভাবে অহেতুক অপচয় হইতেছে। এই অপচয় রোধ করিবার পন্থা হইতেছে বিশুদ্ধ ভেজাল ও খাঁটি নকল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

পাদটিকা ঃ 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে .....' একজন হাবা ব্যক্তি জোরে উহা পাঠ করিতেছে – "উন্মাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে।"

www.pathagar.com

নন্দিত ও নিন্দিত

মানুষের শৈশবকাল কাটে মামার বাড়ীতে/ নানার বাড়ীতে, যৌবনকাল শ্বশুর বাড়ী আর বৃদ্ধ বয়সে পীরের বাড়ী, শেষ বাড়ী গোরস্থান। মামার বাড়ীর আবদার বলিয়া বাংলা ভাষায় একটি প্রবচন রহিয়াছে। নাই মামার চাইতে কানা মামাও ভাল বলিয়া উল্লেখ আছে। কবি জসীম উদ্দিন সকল শিশুদেরকে মামার বাড়ীতে ফুলের মালা গলায় দিয়া যাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ী যাই।

তিনি আরো বলিয়াছেন-

ঝড়ের দিনে মামার দেশে আম কুড়াতে সুখ
পাকা জামের মধুর রসে রঙ্গীন করি মুখ।

যৌবনকালে শ্বশুর বাড়ী প্রতিটি জামাইয়ের জন্য আনন্দের ক্ষেত্র। জামাইগণ শ্বশুর বাড়ীতে আদর পাইয়া থাকেন বলিয়া আমরা জামাই আদর বলিয়া ঠাট্টার ভাষা ব্যবহার করিতে কসুর করি না।

জামাই বেয়াড়া হইলে অথবা শ্বশুর বাড়ীতে কোন রকমে বেসামাল হইয়া পড়িলে জামাইয়ের কদরের পরিবর্তে কাতরানি বাড়িয়া যায়। বোকা জামাইয়ের

www.pathagar.com

লাঞ্ছনার বহু কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। জনৈক জামাই দীর্ঘদিন ধরিয়া শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিল। শ্বশুর বাড়ীর আনন্দের কথা কহিতে গিয়া একদিন সে দেওয়ালে লিখিল, 'শ্বশুর বাড়ী মধুর হাঁড়ি'। দুই তিন দিন পর জনৈক বেরসিক জন সেই লাইনের সহিত লিখিল, 'দুই দিন হইতে তিন দিন অবস্থান করিলে জামাই খাইবে ঝাড়ুর বাড়ি।' নানার বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী পরে হইল পীরের বাড়ী। বৃদ্ধ বয়সে পীরের বাড়ী গমন করিয়াও মানুষ নিস্তার পায় নাই। যৌবনকালেও লোকে পীরের বাড়ীতে গমন করিয়া থাকে, রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান, মন্ত্রী, সাংসদগণ পীরের বাড়ীতে গমনাগমন করিয়া থাকেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো বাংলাদেশে আসিয়া বাংলাদেশী পীরের আস্তানায় গমন করিতে ভুলিয়া যান নাই। মানুষের সভ্যতা কি নানার বাড়ী না শ্বশুর বাড়ী। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব নানার বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী আর পীরের বাড়ীতে হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া সভ্যতা গড়িয়া উঠে নাই।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে কাহার অবদান বেশী–শিল্পী সাহিত্যিকদের না বিজ্ঞানীদের? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। জীবন ও জগতকে আবিষ্কার করা, জীবন ও জগতকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত, রূপময় ও অর্থবহ করিয়া তুলিবার ক্ষেত্রে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকদের ভূমিকা হইতেছে একে অপরের সম্পূরক।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের সাক্ষাতের কাহিনীটি বলা যাইতে পারে। বিশ্ববরেণ্য এ দুই মহান ব্যক্তিত্বের একবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাতের পর সাংবাদিকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা আপনার দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক হিসাবে আইনষ্টাইনের মূল্যায়ন কি?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার উত্তরে কহিয়াছিলেন, আইনষ্টাইন কি বৈজ্ঞানিক? আমি সাক্ষাৎ করিয়াছি একজন কবিকে শিল্পীকে। তিনি শিল্পীর দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন। কবির মত ভাবনালোকে সে জীবনকে জগৎকে রূপ দিতেই তিনি ব্যস্ত।

অপর দিকে আইনষ্টাইনকে চিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার দৃষ্টিতে কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন কি?

উহার উত্তরে বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন কহিলেনঃ উনিত কবি নহেন। উনি বৈজ্ঞানিক। তিনি জীবনকে আবিষ্কারের সংগ্রামে লিপ্ত।

www.pathagar.com

তাই বলিতেছিলাম ইহ জাগতিক জীবনকে অর্থময় করিয়া তুলিবার জন্য কবি, শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিকদের যৌথ ভূমিকা রহিয়াছে। যাহারা মানুষের জীবনকে রূপময়, ঐশ্বর্যময় করিয়া তুলিয়াছেন তাহাদের জীবনকাহিনী দুঃখে ভারাক্রান্ত।

বিগত তিন হাজার বছর ধরিয়া যে মানুষের নিকট হইতে মানুষ সভ্যতার অঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছে তাঁহার নাম হোমার, যিনি ইউরোপীয় সভ্যতার জনক। তিনি তাহাদেরকে দিয়াছেন জাগিবার ও জাগাইবার শক্তি। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ। তিনি জীবিকার অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছেন। কবি শিল্পীগণ যুগে যুগে দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা ও বেদনার নীলে লাঞ্ছিত হইয়া মানুষকে ঐশ্বর্যময় করিয়া তুলিয়াছেন।

কবি দান্তে তাহার প্রিয়তমা বিয়াত্রিচকে আপন করিয়া পান নাই। আমাদের কবি বিদ্যাপতি মিথিলার রাণী লছমী দেবীকে লাভ করিতে পারেন নাই। দূর হইতে তিনি ভালবাসিয়া গিয়াছিলেন। বেদনার জারক রসে সিঞ্চিত হইয়া কবি তাই গাহিলেন-

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ
তবে যৌবন সুপুরুষ সঙ্গ
সুপুরুষ প্রেম কবহু নাহি ছাড়
দিনে দিনে বাদ্রকলা সম বাঢ়।

কবি চণ্ডীদাস অন্ত্যজ নারীর মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন রাধাকে। তাই সামাজিক বিধি নিষেধ তাহার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি ইউরোপীয় রেনেসাঁর হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদের আহবানের বহু পূর্বে বলিয়াছিলেন-

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

বিশ্বের বিভিন্ন কবি শিল্পী রাষ্ট্রযন্ত্রের নিগড়ে নির্যাতিত হইয়াছেন। শত নির্যাতনের মুখে তাহারা স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভুলিতে পারেন নাই। ডক্টর জিভাগোর মত অমর উপন্যাসের স্রষ্টা হইতেছেন বোরিক পাস্তেরনাক। তাহাকে তৎকালীন রুশ সরকারের একনায়ক ক্রুশ্চেভ নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করিতে দেন নাই। তাহাকে দেশ ছাড়িবার জন্য হুকুম জারী করা হয়। তিনি নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশ ছাড়িতে রাজী হন নাই। হিটলারের অভ্যুত্থানের সময়

www.pathagar.com

জার্মানীর বহু কবি শিল্পী সাহিত্যিক নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হন। দেশত্যাগে বাধ্য হন। টমাস মান-গুনটা, যে দু'জন নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন, তাহারা নির্বাসিত হইয়াছিলেন। আরো যারা নির্যাতন ও নির্বাসনের শিকার হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন আলফ্রেড ডবলিন, কাসিসিরি এডসমিভ, জর্জ কাইজার, হাইনবিল, ব্রেখট প্রমুখ।

ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক হইতেছেন ভলতেয়ার। তাঁহাকে দুইবার কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গে বন্দী করা হয়। চিত্রশিল্পী গঁগা, নৃত্যশিল্পী ইসাডোরা ডানকান পাইয়াছেন দুঃখ ও কষ্ট।

আমাদের দেশের মহান শিল্পীদের মধ্যে চরম কষ্ট পাইয়াছেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত, কবি নজরুল ও সুকান্ত। সুকান্ত আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াও এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করিবার আহবান জানাইয়াছেন।

বাংলাদেশে এক সাথে বহু কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হইয়াছে স্বাধীনতার মাত্র ঠিক দুই দিন পূর্বে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বড়ই বিরল। কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের নির্যাতনের ইতিহাস নতুন নহে, কিন্তু একই দিনে এত হত্যার কোন নজির কোথাও নাই।

আমাদের দেশে শিল্পী সাহিত্যিকদের নির্যাতনের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। কিন্তু নিবর্তনের রক্তচক্ষুকে তাঁহারা চিরদিন উপেক্ষা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে নির্যাতন থামিয়া গিয়াছে? এর কোন উত্তর দেওয়া যাইবে না। তবে জীবন ও জগতকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিবার আহ্বানকারী নাই বলিলে চলে।

কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা জীবন ও জগতকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিতে চাহিয়া নিজেরা নির্যাতিত হইয়াছিলেন। নিজেরা বস্তুগত ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী হইতে চাহেন নাই। আমাদের কবি সাহিত্যিকগণ যাহারা রাজধানীতে অবস্থান করেন, তাঁহারা এখন ঐশ্বর্যমণ্ডিত, ঐশ্বর্য ও বিলাসের স্তূপে অনেকে ঢাকায় ঢাকা পড়িয়াছেন। তাঁহারা সম্পদ ও বিলাসে ঢাকা পড়িয়াছেন বলিয়া তাহাদের ডাকে আজ কোন চেতনার উন্মেষ নাই। আজিকার কবি শিল্পীরা কি হোমার হইতে শুরু করিয়া ১৪ই ডিসেম্বরের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করিতে পারিবেন?

জোর করিয়া বলিব, আপনারা ঐশ্বর্যের স্তূপে আটকা পড়িয়াছেন। ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ ঘাটিয়া নির্যাতিতরা আত্মপ্রকাশ করিতেছে আর আপনারা ঐশ্বর্যের স্তূপে ফসিল হইয়া থাকিবেন। অতীতের নির্যাতিতরা হইতেছেন জীবনদিশারী আর আপনারা হইবেন ঘৃণার সামগ্রী।

❐ ৩০শে জুলাই '৯৩

www.pathagar.com

মিথ্যার ঠিকানা

এক গ্রামে এক পণ্ডিত বাস করিত। তাহার নাম ছিল সার্বভৌম মহাশয়। গ্রামের জনগণ ছিল কৃষক, জেলে ও তাঁতী। বেশীর ভাগ লোক ছিল নিরক্ষর। নিরক্ষর হইলে কি হইবে তাহারা সকলে ছিল সহজ-সরল, তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট ছিল।

সার্বভৌম মহাশয় ছিল তাহাদের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন ও আপন জন।

একদা সেই গ্রামে শতফুটি বলিয়া আর এক পণ্ডিতের আগমন ঘটিল। সে কহিল, তাহাদের পণ্ডিত একজন গো-মূর্খ। এই গো মূর্খ পণ্ডিত তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিতেছে। গ্রামের মানুষ ইহা প্রমাণ করিবার জন্য জেদ ধরিল এবং সিদ্ধান্ত হইল যে তর্কে যদি সার্বভৌম মহাশয় পরাজিত হয় তবে তাহার অস্থাবর দ্রব্যসমূহ শতফুটি লইয়া যাইবে। সার্বভৌম মহাশয় রাজী হইল। শতফুটি যে ভক্তি ভক্ত এবং কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ইহা সার্বভৌম মহাশয় ঘুনাক্ষরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

দুই পণ্ডিতের লড়াই দেখিবার জন্য গ্রামের আবাল বৃদ্ধ সমবেত হইল।

শতফুটি উচ্চকণ্ঠে কহিল, 'ওহে, সার্বভৌম মহাশয় বলুন দেখি "ফুন ফুনা ফুন" শব্দের অর্থ কি? সার্বভৌম মহাশয় এমন অদ্ভুত শব্দ কোন শাস্ত্রে খুঁজিয়া পায় নাই। তাই মাথা নীচু করিয়া কহিল, "জানি না।"

গ্রামবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। শতফুটি সার্বভৌম মহাশয়ের সকল অস্থাবর সম্পত্তি পরমানন্দে বোঁচকা বাঁধিয়া লইয়া গেল।

www.pathagar.com

কিছুদিন পর সেই গ্রামে আর একজন আসিয়া এ ঘটনা জানিতে পারিল। সে কহিল, আমিও পণ্ডিত। আমি পণ্ডিতি পাশ করিয়া আসিয়াছি। আমার পদবী হইতেছে সহস্রফুটি।

সহস্রফুটি কহিল, ডাক তোমাদের শতফুটিকে। সে যদি আমাকে পরাজিত করে তবে আমি আমার স্থাবর সম্পত্তির তিনগুণ প্রদান করিব।

শতফুটি তিনগুণ সম্পত্তির লোভে পণ্ডিতের লড়াইয়ে সামিল হইল। সভা শুরু হইল। শতফুটি সভার চারিদিকে মাথা নাড়িতেছিল। এমন সময় সহস্রফুটি দ্রুতবেগে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া শতফুটির গালে এক জোরে থাপ্পর মারিয়া কহিল, ওহে আগে কি ফুন ফুনা ফুন? আগে টুক-টাক-টুক-টাক, তারপর গুন-গুনা-গুন তারপর ফুন-ফুনা-ফুন ...। ইহা শুনিয়া শতফুটি বিমর্ষ হইয়া পড়িল। কোন উত্তর দিতে পারিল না।

গ্রামের লোকজন সহস্রফুটিকে বাহাবা দিতে লাগিল ...। শতফুটি সমস্ত দ্রব্য ফেরত দিয়া মুখ নীচু করিয়া সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

গ্রামের মানুষ শতফুটির ফুন ফুনা ফুন যেমন বুঝে নাই তেমনি টুক-টাক-টুক-টাক তারপর গুন-গুনা-গুনও বুঝিতে পারে নাই।

গ্রামের মানুষ সহস্রফুটিকে কহিল, ওহে সহস্রফুটি, আপনি এই ভেদরহস্য সবিস্তারে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।

সহস্রফুটি কহিল, হে শ্রোতৃমণ্ডলী, এই শাস্ত্রের নাম 'তুলো ধুনা শাস্ত্র'। তুলো ধুনিতে হইলে প্রথমে তুলো ধুনার ধুনোনটি লইয়া টুক-টাক-টুক-টাক করিতে হয়–ইহার পর ধুনোনে শুরু হয় গুন-গুনা-গুন এর পরই তুলো উড়িয়া হয় ফুন-ফুনা-ফুন। গ্রাম্য সহজ সরল মানুষ এই তুলো ধুনা শাস্ত্রের" ভেদ রহস্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইল।

(সরোজকুমার রায়ের তুলো ধুনা শাস্ত্র গল্পের ঈষৎ পরিবর্তন।)

যত আধুনিক প্রযুক্তি আসুক না কেন আকাশ সংস্কৃতির যতই বিস্তার লাগুক না কেন, আমাদের গ্রামের মানুষ এখনো সহজ সরল। বিদ্বান মানুষদের এখনো তাহারা সহজে বিশ্বাস করে। শতফুটির ফুন-ফুনা-ফুনকে যেমন তাহারা বিশ্বাস করিয়া ছিল টুক-টাক-টুক-টাক তারপর গুন-গুনা-গুনকে তেমনি বিশ্বাস করিয়াছিল।

চেয়ারম্যান, মেম্বার অথবা শহর থেকে আসা প্যান্ট পরিধানওয়ালা সাহেবগণ যখন একটু নরম সুরে ইহাদের সাথে একটু কথা বলে তখন তাহারা বিগলিত হইয়া যায়।

তাহাদের জীবনে বিড়ম্বনা আছে, রোগ শোক আছে, বন্যা মহামারী আক্রমণে তাহারা বিধ্বস্ত। তবু তাহাদের জীবনে মিথ্যার বসতবাড়ী নাই, শঠামী বুজরুকী নাই।

www.pathagar.com

স্পষ্টত তাহারা আধুনিক প্রতারণা প্রবঞ্চনার শিকার। কিন্তু তাহারা শঠামী জানে না। প্রতারণা করে না। তাহারা ক্ষেতের সাথে জলের সাথে কি প্রতারণা করিবে?

নাটক উপনাস আর কবিতায় এই মানুষদেরকে এখনো বড় করিয়া দেখানো হয়। কিন্তু উৎপাদনের হাতিয়ার/ শরীকজন হিসাবে কি আমরা বড় করিয়া দেখিয়াছি? এই মানুষদের সহজ সরল আর পরিশ্রমকে সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে উৎপাদনের জোয়ারকে কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। খাদ্য উৎপাদনের ভাত আমাদিগকে ভয়ার্ত করিতে পারিবে না।

গ্রামের সহজ সরল মানুষের বিশ্বাসে ও সরলতায় এখনো ভাটা দেখা দেয় নাই। তাহাদের বিশ্বাস শক্তি এখনো দৃঢ়। মাটির সাথে সম্পৃক্ত ও কৃষি কাজে সমর্পিত জীবনের এই মানুষ একটি দেশের উৎপাদনের বড় সম্পদ। গ্রামের এই মানুষ একদিকে সহজ সরল, অল্পে সন্তুষ্ট, অপর দিকে তাহারা কঠোর পরিশ্রমী।

পাকিস্তান হইতে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত গত ৫০ বৎসরে এই মানুষদের সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় নাই। উৎপাদনের এই শরিকজন "শ্রমিকজন" হইয়া রহিয়াছে, তাহারা ভাগীদার হইতে পারে নাই। এই মানুষরা নেতাদের কথায় শ্রম দিয়াছে কিন্তু ভাগ নিতে পারে নাই। এই মানুষের শ্রম অন্যজন ভাগ করিয়া মহাআনন্দে ভোগ করিয়াছে এবং করিয়া যাইতেছে।

গ্রামের এই মানুষরা অঝোর বরিষণে ভেজা কাকের মত মাথা নাড়ে, গ্রীষ্মে সূর্যতাপে ঘামে ভিজিয়া যায়, মাঘের শীতে টিরটির করিয়া কাঁপে, ছেড়া কাঁথায় শীতকে দমাইয়া রাখিতে পারে না। তবুও এরা মাঠ ছাড়ে না, কৃষি ছাড়ে না, তাহারা শ্রমকে পরিত্যাগ করে না। নিজ বিশ্বাসকে বলি দেয় না।

আমাদের জল আছে, জমি আছে, জনতা আছে। এই জল জমি জনতাকে এক করিতে হইবে। এরই সহিত এই জনতার হাতে দিতে হইবে আধুনিক প্রযুক্তি। এরই সাথে উৎপাদনের সকল প্রকার সহযোগিতা দিতে হইবে।

অন্যান্য দেশ সেই দেশে কৃষি ও কৃষকের জন্য যে যে ব্যবস্থা নিয়াছে আমাদিগকে সেই সেই ব্যবস্থা নিতে হইবে। বিদেশী পচা মাল না আনিয়া বিদেশী বুদ্ধি-যুক্তি-প্রযুক্তি আনিতে বাধা কোথায়?

ফুন-ফুনা-ফুন এর আগে টুক-টাক টুক-টাক তারপরে গুন-গুনা-গুন পরে ফুন-ফুনা-ফুনে যাহারা সহজে বিশ্বাস করিয়াছে এবং এখনো করিয়া চলিতেছে তাহারা কি কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করিবে না? তাহারা অবশ্যই করিবে। ইহারা এখনো 'শিক্ষিত' মানুষদের শ্রদ্ধা করে, তাহাদের কথায় কান দেয়। কিন্তু 'শিক্ষিত' মানুষ এই শ্রমজীবী মানুষের সংলাপে সংহতি প্রকাশ করিতে বারবার ব্যর্থ হইয়াছে। এই ব্যর্থতা আমাদের দুর্ভোগের অনেক কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

❐ ৩১শে জানুয়ারী '৯৭

www.pathagar.com

বিলাতি গরুর জন্য শোক

গরু গোঁয়ার্তুমিতে বিখ্যাত হইলেও গরু আদতেই বোকা প্রাণী। ইঁদুর, শিয়াল হইল চালাক প্রাণী, বাঘ-সিংহ হইল সাহসী প্রাণী।

ম্যাকিয়াভেলী রাজার উদাহরণ দিতে গিয়া কহিয়াছিলেন, রাজার থাকিতে হইবে সিংহের মত সাহস আর শিয়ালের মত বুদ্ধি। তিনি ভুলক্রমেও বলেন নাই গরুর মত বুদ্ধি, গরুর মত মাথা।

বিভিন্ন রূপকথায় সিংহ. বাঘ, ইঁদুর, শিয়াল ইত্যাদি প্রাণীর উদাহরণ আসিলেও গরুর উদাহরণ আসে নাই বলিলেও চলে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে গরুর উদাহরণ আছে।

বৌদ্ধ ও খৃষ্টানধর্ম ছাড়া অন্যান্য বহু ধর্মে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রাণী হত্যার রেওয়াজ আছে। হিন্দু ধর্মে অতি প্রাচীন কালে 'গো-মেধ' যজ্ঞের রেওয়াজ থাকিলেও পরবর্তীতে উহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। মুসলমান ধর্মে প্রাণী হত্যার রেওয়াজ থাকিলেও সকল প্রাণী হালাল নহে, গরুকে হালাল প্রাণী হিসাবে ধরা হইয়া থাকে।

উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাণী হত্যা করিয়া নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ উল্লাস করিতে দেখা যায়। এমন এক আনন্দ উল্লাসে নৃত্যের সহিত বাদ্য যন্ত্রের প্রচলন থাকিলেও গীতের প্রচলন নাই। এই অনুষ্ঠানের নাম 'ছিয়াছত' অনুষ্ঠান।

অতীতে ম্রো, খুমী, বম, পাংখো, লুসাই ও খ্যাং উপজাতীয় সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে গো-হত্যা, নৃত্যানুষ্ঠানের বহুল প্রচলন ছিল। এই সব প্রাণবাদী

www.pathagar.com

প্রকৃতি-পূজারী উপজাতিদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা লাভ করায় তাহারা তাহাদের ঐতিহ্যগত গো-হত্যা নৃত্যানুষ্ঠানটি বর্জন করিয়া চলিয়াছে।

প্রাণবাদী ম্রো ও খুমী উপজাতিরাই অদ্যাবধি ঐতিহ্যবাহী গো-হত্যানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাৎসরিক নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া থাকে।

এই অনুষ্ঠানের নাম হইতেছে 'ছিয়াছত প্লাই'। ম্রো উপজাতীয় ভাষায় 'ছিয়া' অর্থ গরু আর 'ছত' অর্থ বল্লম দিয়া হত্যা করা, প্লাই অর্থ নৃত্য।

জুম চাষের ফসল তোলার পর ম্রো উপজাতির স্বচ্ছল গৃহস্থ বৎসরে একবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এই অনুষ্ঠানের নিয়ম হইতেছে –একটি গরু/গয়াল/মহিষকে বাঁশের তৈয়ারী ঘেরাবেকে আবদ্ধ করিয়া 'লিম্পুতে' গরুর গলা আটকাইয়া বল্লম (রেই) দিয়া খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া গরুকে রক্তাক্ত করিয়া হত্যা করার নাম 'ছিয়াছত' অনুষ্ঠান। 'লিম্পু' হইতেছে গরুর গলা আটকাইয়া রাখিবার জন্য পাশাপাশি ফাঁক করিয়া পুঁতিয়া রাখা দুইটি গাছের খুঁটি।

মঞ্চের চারিপাশে বাঁশের তৈরী ফুল ঝুলানো হইয়া থাকে। ঐতিহ্যবাহী বাঁশী প্লং–এ সুর উঠে আর সেই সুরে তাল মিলাইয়া গরুটিকে ঘিরিয়া তাহারা নৃত্য করে। বাঁশির সুরের মূর্ছনায় এবং ম্রো-যুবতীদের নৃত্যের উদ্দামতায় ম্রো সর্দার গরুকে বল্লম দিয়া খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া হত্যা করে।

বিবাহিত পুরুষগণ এই অনুষ্ঠানে নাচিতে পারিলেও নব–বিবাহিতা রমণী এ নাচে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

ইহা কি পৈশাচিক আনন্দ ? না, এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে তাহাদের ধর্মীয় সংস্কারের ঐতিহ্য রহিয়াছে। ম্রো উপজাতি প্রকৃতি উপাসক, তাহাদের কোন বিশেষ ধর্মীয় রীতিনীতি নাই, সংবিধান নাই।

কথিত আছে, অতীতে ম্রো উপজাতি ধর্মহীন আদিম জীবন যাপন করিতে দেখিয়া তাহাদের দেবতা 'তোরাই' চিন্তিত হইয়া পড়েন। 'তোরাই' দেবতা তাহাদিগকে একটি বিধান-ধর্মে বশীভূত করিবার মানসে কলাপাতায় লেখা একটি ধর্মগ্রন্থ ও কিছু কাপড় গরুর পিঠে করিয়া মর্তে প্রেরণ করেন। প্রেরিত কাপড় দিয়া তাহারা লজ্জা নিবারণ করিবে এবং 'ধর্মগ্রন্থ' অনুসারে ধর্ম পালন করিবে। ইহাই হইবে তাহাদের সংবিধান।

স্বর্গ হইতে মর্তের পথ অনেক দীর্ঘ। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় গরুটি ক্লান্ত হইয়া পড়িল। পথিমধ্যে গরু বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি করিল। এই সময়ে গরুটি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িল। ক্ষুধা নিবারণের জন্য গরুটি কোন

www.pathagar.com

ফলমূল / ঘাস/ লতাপাতা না পাইয়া ধর্মগ্রন্থটি এবং কিছু কাপড় চিবাইয়া খাইয়া ফেলে। ধর্ম গ্রন্থ (সংবিধান) ছাড়া গরুটি অবশেষে ম্রো উপজাতীয় জনপদে আসিয়া উপস্থিত হয়। ম্রো উপজাতি 'তোরাই' দেবতার ধর্মগ্রন্থটির জন্য গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় ছিল।

গরুর পিঠে দেবতা প্রেরিত ধর্মগ্রন্থ (সংবিধান) এবং কাপড় না পাইয়া ম্রো উপজাতিরা গরুটির উপর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। কলাপাতায় রচিত পবিত্র ধর্মীয় সংবিধান কাপড়সহ চিবাইয়া খাইয়া ক্ষুধানিবারণ করিয়াছে বলিয়া জানাজানি হইয়া গেলে ম্রো উপজাতির মধ্যে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠে। সেই হইতে তাহাদের বিশ্বাস একমাত্র গরুর জন্য তাহারা ধর্ম ও কাপড় বর্জিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাই তাহারা প্রতি বৎসর ঘটা করিয়া এই উৎসব পালন করিয়া থাকে। গরুর জিহ্বাটি বাহির করিয়া ত্রিশুলের মাথায় গাঁথিয়া পাড়ার মাঝখানে স্থাপন করা হয়। তাহাদের বিশ্বাস ঐ জিহ্বা দিয়া 'গরুর জাত' তাহাদের ধর্মগ্রন্থটি ভক্ষণ করিয়াছিল।

(সহায়ক গ্রন্থঃ উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতিঃ ডঃ জাফর আহমদ হানাফী)

ইহা হইল জাতি বিদ্বেষী গরুর কাহিনী।

চীন দেশে রহিয়াছে এক গরুর পরাজয়ের বোকামীর কাহিনী। কথিত আছে যে, চীন দেশের ঈশ্বর বর্ষপঞ্জিকা জন্তুদের নামে নির্ধারণ করিবার মানসে সকল জন্তু জানোয়ারের এক দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়াছিল। উহাতে সিংহ ও বাঘ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী অংশগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। এই প্রতিযোগিতায় একটি গরু ষাঁড় অংশগ্রহণ করিয়াছিল। একটি ইঁদুর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আগাইয়া আসিল। 'ইঁদুর' সেই প্রতিযোগিতায় ছিল সব চাইতে চালাক প্রাণী। সে চালাকী করত 'টুপ' করিয়া ষাঁড়ের পিঠের উপর উপবেশন করিল। প্রতিযোগিতার শেষ প্রান্তে যখন ষাঁড় আসিয়া উপস্থিত হইল এমন সময়ে সকলকে বোকা বানাইয়া ইঁদুর পুনরায় টুপ করিয়া লাফ মারিয়া প্রথমে আসিয়া দাঁড়াইল। এইভাবে চীনের প্রথম মাস 'ইঁদুরের' নামে নামকরণ হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়া থাকে।

গরুর অতীত রেকর্ড সম্প্রতি বৃটিশগরু ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। বৃটিশগরু 'উন্মাদগ্রস্ত'। এই বৃটিশ উন্মাদ গরুর মাংস ভক্ষণ করিতে ফ্রান্স সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছে। ফ্রান্সের দেখাদেখি ইউরোপের আরো ২০/২১টি দেশ বৃটিশ গরুর মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত থাকিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

বৃটেনের গরুর মালিকগণ এবং এই পেশার সহিত জড়িত হাজার হাজার মানুষ হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে।

www.pathagar.com

'এই গরু লইয়া তাহারা কি করিবে? তাহাদের উদ্দেশ্যে কহিতে চাহি, এই গরু আপনারা বাংলাদেশে চালান করুন।

হে বৃটিশ বন্ধুবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, ১৭৫৭ হইতে আজ পর্যন্ত বাঙালী বহু কিছু হজম করিয়া বাঁচিয়া আছে। তাহাদের জীবনী শক্তি অত্যন্ত বেশী।

আপনাদের উন্মাদ গরুর 'গোস্ত' একমাত্র আমরাই হজম করিতে পারিব। ১৯৪৩ সালে খাদ্যের মূল্য সঠিক রাখিবার জন্য আমেরিকা লক্ষ লক্ষ টন চাউল/গম সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল আর রাশিয়া তেমনি টনকে টন খাদ্য জমিতে সার হিসাবে মিশাইয়া দিয়াছিল। অপরদিকে তৎকালীন বাংলায় ৫০ লক্ষ লোক না খাইয়া মারা গিয়াছিল। ভাবাবেগবশত অথবা জিদের বশে আমরা নিনিয়ন সাহেব, মেরিল সাহেবের পরামর্শ রাখিতে সমর্থ হই নাই। এ জন্য আপনারা কোন প্রকার উষ্মা প্রকাশ না করিয়া আপনাদের 'উন্মাদ' রোগে আক্রান্ত গরুসমূহকে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে প্রেরণ করুন।

অতীতে আপনারা ছিলেন আমাদের মুনিব, বর্তমানে আপনারা আমাদের প্রিয় বান্ধব।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের কারণে এই দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিবে। চরম দুর্যোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আপনাদের 'উন্মাদ' গরু সমূহ আমাদের সবিশেষ উপকারে লাগিবে।

অতীতে আপনারা আমাদের দেশ হইতে কার্পাস, পাট, পট্টবস্ত্র, মসলিন লইয়া গিয়াছেন। 'নীল' সাহেবরা আমাদের 'চামড়া' 'ফাটাইয়া' দিয়াছে.....উহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

আপনাদের 'গরুর চামড়া' আপনাদের নিকট পৌছাইয়া দিব। বাংলাদেশে বর্তমানে বহু আধুনিক টেনারী রহিয়াছে। সম্প্রতি বন্ধ হইয়া যাওয়া গার্মেন্ট ফ্যাক্টরী শ্রমিকরা অর্থের জন্য স্বল্প পারিশ্রমিকে এই 'চামড়া' শিল্পে নিয়োজিত হইবার সুযোগ পাইবে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর সচল হইবে এবং আপনাদের গরু আসিতে কোন বাধা সৃষ্টি হইবে না।

❐ ২৯শে মার্চ, '৯৬

www.pathagar.com

ভুল ও ভূতের উত্তরাধিকার

একদা এক রাজা তাহার প্রধানমন্ত্রীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মন্ত্রীর ছিল একটি ছোট শিশু। শিশুটি পিতাকে না দেখিয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারিত না।

দণ্ডভোগী প্রধানমন্ত্রী রাজার নিকট আবেদন করিল, হে রাজন, আমার ছোট শিশুটিকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি। আমাকে না দেখিয়া সে একদণ্ডও থাকিত না। জানিতে পারিলাম আমার পরম স্নেহের শিশুটি আমাকে সাথী হিসাবে না পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আহারাদি ত্যাগ করিয়া শীর্ণকায় হইয়া পড়িয়াছে। আমার এই অবোধ শিশুটিকে আমার সহিত কারাগারে রাখিবার জন্য আপনার নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি।

হে মহারাজন! আপনি দয়া পরবশ হইয়া এই দীনের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া আমার স্নেহের শিশুটির জীবন রক্ষা করিয়া বাধিত করিবেন।

www.pathagar.com

রাজা মন্ত্রীর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। শিশুটি কারাগারে তাহার পিতার সহিত লালিত-পালিত হইতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির বুদ্ধিও বাড়িতে লাগিল। বুঝিবার বয়স হইলে শিশুটি তাহার পিতাকে আহার্য সম্পর্কে নানান প্রকার প্রশ্ন করিত।

একদা কারাগারে সে তাহার পিতাকে প্রশ্ন করিলঃ আব্বা হুজুর, ইহা কি?

মন্ত্রীঃ ইহা ছাগ মাংস।

পুত্রঃ ছাগ কি?

ঃ ছাগ হইল এক প্রকার গৃহপালিত পশু। ইহার চারিটা পা, দুইটি কান ইত্যাদি বলিয়া মন্ত্রী ছাগলের বর্ণনা সহ ছাগলতত্ত্ব বুঝাইয়া দিল।

মন্ত্রীপুত্র পিতার বচন ও অঙ্গভঙ্গিমা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ও দর্শন করিয়া কহিল, আব্বা হুজুর, বুঝিয়াছি ইঁদুরের কথা কহিতেছেন।

মন্ত্রী ঃ না না, কোথায় ছাগল আর কোথায় ইঁদুর।

ইহার পরে উট ও গরুর মাংস দেখিয়াও পুত্র জিজ্ঞাসা করিল ইহা কি?

মন্ত্রীঃ যথাক্রমে উট ও গরুর বর্ণনা এবং উটতত্ত্ব ও গরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিল। মন্ত্রীপুত্র এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মন্তব্য করিল, আব্বা হুজুর, আপনি এইবারও ইঁদুরের বর্ণনা করিতেছেন।

মন্ত্রী পুত্রের এই মন্তব্য করিবার কারণ হইতেছে-বুদ্ধি হইবার পর সে ইঁদুর ছাড়া আর কোন প্রাণী দেখে নাই। সুতরাং ছাগ, উট, গরুকে ইঁদুরের বংশধর বলিয়া ভাবিয়াছিল (এই উপাখ্যান ইবনে খলদুনের আল মুকাদ্দিমা হইতে সংগৃহীত)।

সমৃদ্ধ স্বদেশ আর ঐশ্বর্যময় জীবন হইতে আমরা বহুদূরে। অদৃষ্টের/ভাগ্যের কারাগারে আমরা বন্দী, এই বন্দীশালায় আপনার-আমার শিশুও বড় হইয়া উঠিতেছে। সমৃদ্ধ স্বদেশ আর ঐশ্বর্য কাহাকে বলে ইহা যতই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে অবুঝ সন্তানগণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। বুঝাইতেও পারিতেছি না। অন্ন-আনন্দ-নিদান-নিবাসের অভাবে বাড়িয়া উঠা সন্তানকে কি দিয়া বুঝাইব সৌন্দর্য-সাধনা, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম, জীবনবোধ, জীবন চেতনা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

দরিদ্র ঘরের সন্তান জানে দুইটি শব্দ। এই দুটি একবার এইদিক আরেকবার ঐদিক করিয়া কোনক্রমে নিজেদেরকে বাঁচাইতেছে। ভাত আর ক্ষুধা, ক্ষুধা আর ভাত। গরীব মানুষের সন্তানদের এই উপলব্ধিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন মওলানা ভাসানী।

একদা এক ডাক্তার হুজুর ভাসানীকে চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলঃ হুজুর রসিকতা করিয়া কহিলেন, ও হে ডাক্তার, তুমি কি পাশ?

ডাক্তার ঃ এম, বি, বি, এস।

ভাসানী হুজুরঃ এম, বি, বি, এস অর্থ কি?

ডাক্তারঃ ব্যাচেলর অব মেডিসিন ব্যাচেলর অব সার্জারী।

ভাসানী হুজুরঃ অর্থাৎ মেডিসিন আর সার্জারীর তোমরা বি, এ। জান ডাক্তার, ওই বিদেশী কিতাব পড়া তোমাদের ওই ডাক্তারী পুস্তকে এই দেশের গরিবের রোগের নামও নাই, ঔষধও নাই। গরিবের রোগ তোমরা জান না।

ডাক্তার ঃ হুজুর গরিবের রোগ কি?

ভাসানী হুজুরঃ গরিবের রোগের নাম ক্ষুধা আর ঔষধের নাম ভাত।

ডাক্তারঃ ক্ষুধা আর ভাত, ভাত আর ক্ষুধা আর সব কি হুজুর।

ভাসানী হুজুর ঃ আর সব মিথ্যা সংলাপ। ভাত আর ক্ষুধার কারাগার ছাড়া আরো অসংখ্য মিথ্যার কারাগারে আমরা বন্দী হইয়া রহিয়াছি। এই বন্দীশালায় আমার/আপনার অবুঝ শিশুকে কি করিয়া সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, ঐশ্বর্যময় ভবিষ্যৎ বুঝাইব? সে মন্ত্রীর পুত্রের মত সব কিছুকে ইঁদুরের বংশধর বলিয়া মনে করিতেছে।

মিথ্যার কারাগার কি আমরা ভাঙ্গি নাই? আমাদের অতীত ইতিহাস মিথ্যার কারাপ্রাচীর ভাঙ্গার ইতিহাস। ১৯৫২ , ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৮-৬৯, ১৯৭০ এবং অবশেষে '৭১র মুক্তিযুদ্ধে আমরা মিথ্যার বন্দীশালা ভাঙ্গিয়াছি।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। আবার মিথ্যার কারাপ্রাচীর যেন আপনা আপনি গজাইয়া উঠিয়া আমাকে /আপনাকে এবং আমাদের সন্তানকে বন্দী করিয়া রাখিতেছে।

www.pathagar.com

উত্থান পতন সকল দেশে সকল সমাজে রহিয়াছে। এই উত্থান পতনের মধ্যেই নব জাগৃতি জন্মলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু আজ ২৫ বৎসর ধরিয়া পতন ও পচন দেখিতেছি। হতাশা নামক ভাইরাস শয়নে-স্বপনে আঘাতের পর আঘাত হানিতেছে।

আই, এম, এফ আর বিশ্ব ব্যাংকের উন্মাদ গরুর লেজ ধরিয়া স্বনির্ভরতার বিশ্ব বাজারে ছুটিয়া যাইতে চেষ্টা করা হইতেছে। দিন দিন পরনির্ভরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। একদা এই দেশের কবি বিদেশী ঠাকুর হইতে দেশী কুকুরকে অনেক বেশী শ্রদ্ধাবান বলিয়া মনে করিতেন। এখন আমরা স্বদেশের ঠাকুর হইতে বিদেশের সারমেয়কে বড় মনে করিতেছি।

বিদেশী ব্যবসায়ীদেরকে আনিবার জন্য নানান প্রকার আগমনী সঙ্গীত গীত হইতেছে। আর দেশী ব্যবসায়ীরা? পরিতাজ্য হইতেছে। ইহা এই নিবন্ধকারের উর্বর মগজপ্রসূত নহে।

একদা রহমান সোবহান ১৯৬২ সনে পাকিস্তানে দুই অর্থনীতির কথা বলিয়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের মধ্যে চিন্তার বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। সেই দুই অর্থনীতি তত্ত্বের উপর শেখ মুজিব (মুজিব ভাই) দিলেন ছয় দফা। ছয় দফা এই দেশে আগুন ছড়াইয়া দিল। 'ছয়দফার' আগুনে তখনকার বড় বড় মাপের নেতা বড় বড় সংগঠন মাটির সাথে মিশিয়া গেল। মুজিব ভাই হইলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

হে সুহৃদ পাঠক, আপনি কহিবেন আবার অতীত কেন? ইহা ত জানা কথা। আপনি জানা কথা ভুলিতে বসিয়াছেন। ভুল ও ভূতের গলিতে পায়চারী করিয়া আপনি নিজের ভুলের বান্ডিল বাঁধিয়া বসিয়াছেন। ভূতের বেগার খাটিয়াছেন এবং আপনার সন্তানকে ভুল ও ভূতের চাপকান উপহার দিয়া যাইতেছেন। 'কাবুলিরা' তালি দেওয়া সেলোয়ার যেমন বংশধরকে দিয়া যান আপনিও ভুল ও ভূতের তালি দেওয়া চেতনা রাখিয়া যাইতেছেন।

হে বুদ্ধিজীবী ও জননেতাগণ, আমরা এখন বন্দীশালা ভাঙ্গার ইতিহাস জানি না। নতুন বন্দীশালায় আমার সন্তান আমার সহিত বড় হইয়া উঠিতেছে। আমার সন্তানকে বন্দীশালা হইতে মুক্ত করুন। তাহাকে বুঝিতে দিন ছাগল, উট, গরু ইঁদুরের বংশধর নহে।

□ ২৫শে জুলাই, '৯৭

www.pathagar.com

অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী

একদা এক গ্রামে এক কবিরাজ বাস করিত। এই কবিরাজের সুখ্যাতি অনেক গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কবিরাজের গৃহে প্রতিদিন শত শত রোগী আসিত।

ইহা ছাড়াও তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া রোগী দেখিতে দূর দূরান্তরে গমন করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে কবিরাজী মোদক, সালসা, বটি ইত্যাদি প্রস্তুত করা হইত। কবিরাজের বাড়ীতে দীর্ঘদিন ধরিয়া একজন লোক ঔষধ প্রস্তুত করিবার কাজে নিয়োজিত ছিল। কবিরাজের নাম ছিল বেচারাম। আর এই কর্মচারীর নাম কেনারাম। কেনারামের বড়ই বাসনা ছিল যে সেও একদিন বেচারামের মত কবিরাজ হইবে।

একদা বেচারাম কবিরাজ রোগী দেখিবার নিমিত্তে অন্য গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। বেচারামের অনুপস্থিত সময়ে এক রোগী আসিয়া হাজির হইল। রোগী আসিয়া কবিরাজ মহাশয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

www.pathagar.com

রোগী ঃ কবিরাজ মহাশয় কোথায়?

কেনারাম রোগী দেখিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল যে, কবিরাজ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সে নিজেই নিদান দেখিয়া রোগীকে ঔষধ ও অনুপান প্রদান করিবে। মনের এই বাসনা পূরণ করিবার মানসে রোগীকে কেনারাম কহিল, উপবেশন করুন।

(রোগী উপবেশন করিলে) কেনারাম আবার কহিল, আপনার কি রোগ হইয়াছে?

রোগী ঃ অর্শ্ব। মহাশয় আমি এই রোগের যন্ত্রণায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ঔষধ প্রদান করুন।

কেনারাম নিদানের প্রথম খণ্ড লইয়া অনেক ঘাঁটাঘাটি করিল। অর্শ্ব রোগের কোন বিবরণী খুঁজিয়া পাইল না। নিদানের দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিয়া দেখিল গরু–অশ্ব ইত্যাদি। অশ্ব শব্দ দেখিয়া কেনারাম হরষিত হইয়া উঠিল। নিদানে লিখা রহিয়াছে অশ্ব রোগাক্রান্ত হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যবস্থাটি হইল–কর্ণং ছিত্বা কটিং দহেৎ।

কেনারাম বুঝিল যে, অশ্ব রোগের সর্বোত্তম চিকিৎসা হইল কর্ণ ছিদ্র করিয়া দেওয়া এবং শরীরের পশ্চাৎ দেশের কটিতে আগুন দিয়া দগ্ধ করা। কেনারাম বুঝিতে পাইল যে, এই ব্যবস্থা অত্যন্ত দুরূহ এবং যন্ত্রণাদায়ক। ইহাতে রোগী বিচলিত হইয়া পড়িবে। কেনারাম এই চিকিৎসা সহায়তার জন্য আরো দুইজন সহকারীকে লইয়া আসিল। কেনারাম রোগীকে একটি চৌকির উপর শয়ন করাইল।

রোগীর কর্ণ ছেদন শুরু করিলে রোগী চিৎকার দিয়া উঠিল। কেনারামের সহকারীরা রোগীকে শক্ত হাতে ধরিয়া রাখিল। রোগী যন্ত্রণায় গগন বিদারী চিৎকার করিতে লাগিল। ইহার পর রোগীকে উপুড় করাইয়া শরীরের নিম্নাঙ্গের বস্ত্র খুলিয়া লইল। এবং গরম লৌহ শলাকা দিয়া তাহার পশ্চাৎদেশের শিরদাড়ার শেষ প্রান্তে তপ্ত ছেক প্রদান করা হইল। রোগী যতই চীৎকার করিতে লাগিল কেনারাম ততই তাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, ইহা যেমন তেমন রোগ নহে ইহা অর্শ্ব রোগ। নিদানমতে আপনার চিকিৎসা হইতেছে। মনে রাখিবেন নিদান দেখিয়া চিকিৎসা সর্বোত্তম চিকিৎসা।

www.pathagar.com

কয়েক দিবস অতিবাহিত হইল। একদা দৈবাৎক্রমে একটি হাটে কবিরাজ বেচারাম মহোদয়ের সাথে অর্শ্বরোগীর সাক্ষাৎ ঘটিল। রোগী কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করিল। কবিরাজ কহিলেন, ওহে, তুমি কহিয়াছিলা তোমার অর্শ্ব রোগ হইয়াছে। ইহার জন্য চিকিৎসা করাইবা বলিয়াছিলা। চিকিৎসার জন্য তুমি আমার নিকট আসিলা না কেন? অন্য কোন কবিরাজকে কি দেখাইয়াছ?

রোগী ঃ কবিরাজ মহাশয়, বড়ই দুঃখের কথা।

কবিরাজ ঃ কিসের দুঃখ?

রোগী ঃ একদা আমি আপনার বাড়িতে গিয়াছিলাম, তখন আপনি অনুপস্থিত ছিলেন। আপনার বাড়ীর একজন লোক আসিয়া আমার রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিল। অতঃপর সে নিদান দেখিয়া আমার কর্ণ ছিদ্র করিয়া দিয়াছে --অথচ আমার রোগ নির্মূল হয় নাই। বরং যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হে পাঠক! আপনি দেখিয়াছেন কি না জানি না, আমি অধম নিন্দুক দেখিতে পাইয়াছি যে, রোগীর চিকিৎসা কবিরাজ করিতেছে না। এখন চিকিৎসা করিতেছে কবিরাজের কামলাবৃন্দ। এই কামলাবৃন্দের চিকিৎসায় জনজীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু কবিরাজ গৃহে নহে, বিভিন্ন বিভাগে কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতিতে কামলাদের হামলায় সেবার পরিবর্তে শাস্তি নামক দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে।

অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী। অল্পবিদ্যার কামলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শব্দের অর্থ না বুঝিয়া আব্দুলকে 'খালকুল' বানাইয়া ফেলিতেছে। গায়েন বলে এক রকম, দোহারী বলে আরেক রকম। গত দুই দশক ধরিয়া এই দেশে অনেক শব্দ আসিয়া আমাদের অনেক চিন্তা-চেতনাকে তছনছ করিয়া দিতেছে। উল্লেখযোগ্য একটি শব্দ হইল, 'অর্থনৈতিক উদারিকরণ'। সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন বিরোধ নাই। বামপন্থীদের মাঝে মধ্যে ইহা লইয়া হা-হুতাশ করিতে দেখা গিয়াছে। অর্থনেতিক উদারীকরণ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। ইহা জনপ্রিয় হইবার কারণ হইল, এই দেশের হর্তাকর্তাবৃন্দ (সরকারী ও বেসরকারী) বেশির ভাগই হইলেন উদরপরায়ণ/ উদরসর্বস্ব। তাহারা এই উদারনীতিকে উদরনীতিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই উদরপিশাচগণ অর্থনীতির উদারনীতিকে এই ভূধরে না রাখিয়া নিজেদের উদরে রাখিয়াছেন ও রাখিবেন। উদয়াস্ত যাহারা খাটিয়া মরিতেছে তাহাদের উদর শূন্য ছিল, আছে এবং থাকিবে।

www.pathagar.com

আমাদের অর্থনীতিতে কেনারাম অশ্ব রোগের পরিবর্তে অশ্ব রোগের চিকিৎসা চালাইতেছে। ইহা না বুঝিয়া নহে, বুঝিয়া শুনিয়া করা হইতেছে। সত্যিকার অর্থে উদার অর্থনীতি আমাদের দেশে চালু হইলে উদরপিশাচগণের উদরে আঘাত লাগিবে।

গত দুই দশক ধরিয়া উদরবাদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদরবাদীদের এই নীতির নাম হইল উদরনীতি। চলিত কথায় পেট নীতি। এই পেট নীতির তথা এই উদরদর্শনের ফলে দেশে শ্রেয়বোধ, শ্রদ্ধাবোধ, দয়া-মায়া, প্রেম–প্রীতি-ভালোবাসা, সহানুভূতি তথা মানবিক মূল্যবোধসমূহ আজ অনেকাংশে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিরাষ্ট্রীয়করণের কথা হইতেছে। ইহা অত্যন্ত আশাবাদী শব্দ। বিরাষ্ট্রীয়করণের সহিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজনীতিকরণের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু আমরা সর্বক্ষেত্রে রাজনীতিকরণের ব্যবস্থা করিতেছি, যেমন ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি, শ্রমিক রাজনীতি। এইগুলিকে বি-রাজনীতিকরণ করিতে হইবে। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে (এই প্রকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ) বি-রাজনীতিকরণ না করিয়া উৎপাদনের সেক্টরসমূহকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হইলে গুড়ের লাভ পিঁপড়ায় খাইয়া ফেলিবে। অতীতে খাইয়াছে, ভবিষ্যতেও খাইবে। ইহার ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইবে. ধান্দাবাজের সংখ্যা বাড়িবে। মতলববাজরা ঘোলা পানিতে মৎস্য শিকার করিবে। মধুর ভাণ্ডের লোভে ভণ্ডরা অহেতুক ভণ্ডামী শুরু করিয়া দিবে। গত দুই দশক ধরিয়া আদর্শহীন, নীতিহীন ব্যক্তিরা দল ভাঙ্গিয়াছেন ও দল গড়িয়াছেন। একদল ত্যাগ করিয়া অন্য দলে যোগদান করিয়া 'নিন্দিত' না হইয়া 'নন্দিত' হইয়াছেন। দলত্যাগী আদর্শ বিসর্জনকারী নীতিবর্জিত নেতারা (?) কহিয়া থাকেন, রাজনীতিতে শেষ কথা নাই। এই বলিয়া তাঁহারা নতুন মুখোশ পরিধান করিয়া মাঠে ময়দানে এমনকি সংসদে সংবাদচিত্রে আবির্ভূত হন। তাঁহারা তিরস্কারের যোগ্য না হইয়া রাজনৈতিক পুরস্কারে ভূষিত হইয়া থাকেন। তাঁহারাই আমাদিগকে কেনারামের অশ্ব রোগের চিকিৎসা করেন। অর্থনৈতিক উদারীকরণের পরিবর্তে তাঁহারাই দেশের সম্পদ উদরকরণ করিয়া যাইতেছেন। 'রাজনীতির শেষ কথা নাই' বলিয়া যে মিথ্যা সংলাপ তাঁহারা প্রচার করিতেছেন উহাও একপ্রকার বাচনিক সন্ত্রাস। রাজনীতিতে অবশ্যই আদর্শ থাকিবে, দর্শন থাকিবে। আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীহীন রাজনীতি শোষণ ও সন্ত্রাসের জন্মদাতা।

❐ ৮ই আগষ্ট, '৯৭

www.pathagar.com

এখন কবিরা মনে নয়, ভবনে

রাজ রাজড়ার দরবারে থাকে মধুর ভাণ্ড আর সেই ভাণ্ড লুটিয়া লইবার জন্য ভণ্ডের অভাব কোন দিন কম ছিল না। মিথ্যা কথার ফুলঝুরি ছুটাইতে আগাইয়া আসিতেন কবিগণ। এই মিথ্যা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নহে, এই মিথ্যা হইতেছে রাজা বাদশার জীবন বৃত্তান্ত রচনায়।

বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজকবির কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু দালাল কবি–সাহিত্যিক গোপন চুক্তিনামায় অথবা কিছু পাইবার আশায় দালালী করিতে কসুর করেন না। আজকাল আমরা যাহা দালালী নামে আখ্যায়িত করি ইহাকে ইংরেজীতে বলা হয় পেট্রন যুগ। রাজরাজড়ারা কবিদের পেট্রোনাইজ করিতেন। রাজাবাদশারা সহযোগিতা না করিলে কবিরা কি হাওয়া বাতাস খাইয়া কবিতা লিখিবেন?

www.pathagar.com

বৃটেনের রাজদরবারে কবি পোষা হইয়া থাকে। এমনকি আধুনিককালেও রাণীর দরবারে বেতনভুক রাজকবি রহিয়াছেন। তাহারা ঐতিহ্যের বড় নিশান বরদার। ইহাও এক প্রকার রাজকীয় মৌলবাদ। ইদানিং রাণীর পুত্র, কন্যা, পুত্র বধূগণ রাজদরবারের বহুদিনের লালিত মৌলবাদ কেমন যেন ভাঙ্গিতে শুরু করিয়াছে। তাহারাও মানুষ।

বাদশা ফারুক মিসরের সিংহাসন ত্যাগ করিবার সময় কহিয়াছিলেন, পৃথিবীতে ৫টি রাজা বহাল তবিয়তে অবস্থান করিবে। এই পাঁচটি রাজা হইল–তাসের চার রাজা এবং বিলাতে এক রাজা। কবি ব্রাউনিং এর সময়ে একজন বিখ্যাত কবি তাঁহাদিগের দল ছাড়িয়া রাজদরবারে চলিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাউনিং সেই কবিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন- Oh! For a handful of silver he left us. অর্থাৎ আঃ! একমুঠো রৌপ্য মুদ্রার জন্য সে আমাদের ত্যাগ করিয়া গেল।

অতীত যুগের সাহিত্যের ইতিহাস হইতেছে রাজা–বাদশা ও অভিজাতদের কৃপা ও পোষকতার ইতিহাস। যেই কর্তা রুটি যোগাইতেন তিনি রুচিও পরিবেশন করিতেন, সমাজ ছিল তাহাদের হাতে। তাই তাহাদের প্রদত্ত চশমা আঁটিয়া সেই চশমার ভিতর দিয়া কবিগণ জীবন দেখিতেন। বিশিষ্ট গবেষক শ্রীসিদ্ধার্থ বলিয়াছেন, ভারতীয় সুতরা অনেক সময় পেশাদার স্তাবক ও ক্লাউনের মত ছিলেন।

মহাভারতে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় সন্তানগণ সুত নামে পরিচিত হইবে এবং তাহাদের পেশা হইবে রাজরাজড়া ও মহাপুরুষের কীর্তিগাথা গান করা। রাজাদের গুণ কীর্তনে বাঙালী কবি সন্ধার নন্দী (প্রাচীন যুগে) সকলকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন।

সেন যুগে এমন বহু দালাল কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। লক্ষণ সেনের সভাকবিরা রাজার চিত্ত বিনোদনের জন্য তাহাদের কবিপ্রতিভা বিসর্জন দিয়াছিলেন। জয়দেব ছিলেন লক্ষণ সেনের রাজসভার কবি। তাহাকে বলা হয় লক্ষণ সেনের কালিদাস। তিনি গীতগোবিন্দের পদ আওড়াইতেন আর সুন্দরী পদ্মাবতী তালে তালে নাচিত। এই জনশ্রুতিকে স্বীকার করিয়া জনৈক কবি লিখিয়াছেন-

জয়দেব মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে
পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে
কৃষ্ণর গীতক জয়দেব নিগদতি
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মুসলমান শাসনকর্তাগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। সনাতন ও রূপ নামক দুই কবি ভ্রাতা ছিলেন সুলতান হোসেন শাহের ডান হাত বাম হাত। একজন ছিলেন দবির খাস বা প্রাইভেট সেক্রেটারী অপরজন ছিলেন সকের মল্লিক বা চীফ সেক্রেটারী। ইহা ছাড়াও আরো বহু কবি তাহাদের কর্মচারী ছিল। হোসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁ ও ছুটি খানও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। কবিরা তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন, যাহারা তাহাদের জাত ভাই লক্ষণ সেনকে বিতাড়িত করিয়াছেন সেই কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সোহয়ং শ্রীমশনন্দ এল্লিনৃপতি জীয়াচ চিরং ভূতলে।–এই সেই মসনদ আলি নৃপতি পৃথিবীতে চিরজীবী হোন।

বাংলাদেশের মুসলিম রাজসভায় মহাভারত পাঠ করা হইত। পরমেশ্বর দাস, শ্রীকর নন্দী, রামচন্দ্র খান, কাশীরাম সকলেই রাজ অনুগ্রহে ধন্য ছিলেন। পরমেশ্বর দাস কহিয়াছেন-

ভূপতি হোসেন শাহ হ'এ মহামতি
পঞ্চম গৌড়েত যার পরম যে খ্যাতি
অস্ত্রেশস্ত্রে বিশারদ প্রতাপে অপার
কলিযুগে এই ভোল পৃথিবীর সার

কবি মুকুন্দ দাস পৃষ্ঠপোষকের গুণকীর্তন করিতে দ্বিধাবোধ করেন্ নাই। কৃষ্ণ নগরের মহারাজা কবি ভারতচন্দ্রকে প্রতি মাসে মাত্র ৪০ টাকা বেতন এবং একটি বাসা দিয়াছিলেন। আর রাজা বলিয়াছিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যা ও সকালে আমার সহিত দেখা করিবেন। মহারাজার নির্দেশে কবি ভারতচন্দ্র প্রতিদিন রাজদরবারে যাইয়া ছোট ছোট কবিতা পাঠ করিয়া শোনাইতেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিতায় প্রীতি হইলেন এবং বড় আকারের কবিতা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন। কথিত আছে এই প্রেরণায় কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজতায়/অন্নদামঙ্গল গায় নীলমনি প্রথম গায়ন।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশংসা করিতে যাইয়া কবি লিখিলেন-

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়

www.pathagar.com

দুই পক্ষে চন্দ্রের অসিত সিত হয়

কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়।

কবি আলাওলের মত বড় মাপের কবিও জঘন্যতম চরিত্রের অধিকারী বলিয়া কথিত আরাকানের রাজা মাগন ঠাকুরের গুণ কীর্তন করিয়াছেন।

অন্যান্য দেশের কবিগণ যতখানি রাজকীর্তি কীর্তন করিয়াছেন বাংলাদেশের কবিরা সে মাত্রায় খুব বেশী দালালী করেন নাই। এর কারণ হইল বাংলাদেশে বাঙ্গালীরা শাসক ছিলেন না। বাংলা লোকসাহিত্যে রাজা–বাদশার গুণ কীর্তন নাই।

ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় যে গাথা বাক্য রহিয়াছে সে কালজয়ী সাহিত্যে মানব বন্দনা আছে। মানবতার জয়গান আছে। আছে সংগ্রাম ও সাধনা। একবাক্যে বলা যায় দালালী নাই। গ্রাম্য কবিওয়ালারা খুব বেশী তোষামুদির পরওয়া করিত না। জনৈক কবি তার প্রতিপক্ষকে তাই শুনাইয়াছিল-

ওরে বেটা কবি গাবি, পয়সা লবি,

খোশামদি কি কারণ।

বাংলাদেশে ৪০ দশকের পর মুসলিম তরুণ সাহিত্যিকবৃন্দ উদার মনোভাব লইয়া সাহিত্য চর্চা শুরু করিয়াছিলেন।

কিন্তু পাকিস্তান আমলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার জন্য অনেকে কবিত্ব শক্তি বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন নাই। অনেকে ধানক্ষেতের হাতছানি হইতেও নব নির্মিত ধানমণ্ডির পাকা দালানের হাতছানি বেহতর মনে করিতেন। বাংলাদেশ হইবার পরও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার জন্য অনেকে অনেক প্রকার নতুন নতুন নোছকা লইয়া সরকারী ভবনে আনাগোনা করিয়া নিজেদেরকে ধন্য করিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন। বর্তমানের কবিরা ইটের ভবন নির্মাণ করিতেছেন কিন্তু মানুষের মনের ভুবন হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভবন্ নির্মাণ করিয়াছেন নিজের জন্য নহে শান্তি নিকেতনের জন্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত পাকা ভবন নির্মাণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা মানুষের মনে আগামী দিনেও পাকাপাকিভাবে বাস করিবেন।

গ্রন্থসহায়ক ঃ জনসভার সাহিত্য–বিনয় ঘোষ।

www.pathagar.com

জল, পানি, ঝোল, সুরুয়া

ডন কুইকজট দিগ্বিজয় করিবার জন্য বাহির হইল। তাঁহার যাত্রাপথে ঘুর্ণি হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল। ঘুর্ণিবায়ুর এমনতর বেয়াদবি ডন কুইকজটকে রাগান্বিত করিয়া তুলিল। বেয়াদব ঘুর্ণিবায়ুকে শায়েস্তা করিতে প্রথমে এলোপাতাড়ি ঘুষি মারিতে লাগিল। অজস্র ঘুষি বর্ষিত হওয়ার পরও ঘুর্ণি বায়ু এতটুকুও কাতর হইল না। ঘুষিতে তুষ্ট না হইয়া ডন কুইকজট তলোয়ার লইয়া ঘুর্ণিবায়ুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ঘুর্ণি বায়ুর উপর এলোপাতাড়ি তলেয়ার চালাইয়াও এক কেশাগ্র কর্তন করিতে পারিল না। ঘুর্ণি বায়ুর সহিত যুদ্ধ করিয়া ডনকুইকজট হাওয়াকল প্রান্তরে পরাজয় বরণ করিল। আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন ডনকুইকজট হঠাৎ অবতারের মত আবির্ভূত হইতেছেন।

www.pathagar.com

এই নব্য ও প্রাচীনপন্থী বাংলাদেশীয় ডনকুইকজটবৃন্দ আমাদের দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মিমাংসিত বিষয়ের উপর অহেতুক হাওয়াই ঘুষি মারিতেছেন।

পত্রিকার পৃষ্ঠায় পাণ্ডিত্যের আলখিল্লা পরিধান করিয়া অলীক কাহিনী প্রচার করিয়া দাদের চুলকানীর মত চুলকাইয়া চুলকাইয়া আরামবোধ করিতেছেন। পড়িয়া টপ করিল না টপ করিয়া পড়িল এই চিন্তা করিতে করিতে দিনের আরাম রাত্রির বিশ্রামকে হারাম করিয়া হাওয়ার সাথে মল্ল যুদ্ধ করিয়া যাইতেছেন। কম্পিউটার ও কনজিউমার্স, ডিমান্ড সাপ্লাই মতবাদের যুগে বাস করিয়াও ডনকুইকজটগণ জল না পানি, ঝোল না সুরুয়া, গোস্ত না মাংস লইয়া নতুন বিতর্ক শুরু করিয়া দিয়াছেন। এই বিতর্কের নাম দেওয়া যাইতে পারে ঝোল-সুরুয়া বিতর্ক।

ঝোল, সুরুয়া বিতর্কওয়ালা ও ওয়ালীদের সমীপে সবিনয়ে বলিতে চাহি যে-

"জলেতে নামিয়া কন্যা
গায়ে হলুদ মাখে"

এখানে জল অথবা জলবায়ু অশ্রুসজল নয়নের জল শব্দগুলি কি ফেলিয়া দিতে হইবে?

আমার বাড়ী আইস বন্ধু
বসতে দিব পিঁড়ে
জলপান করতে দিব
শালি ধানের চিড়ে।

প্রাণের বন্ধুকে আহ্বানকারী আবহমান বাংগালীর এই হৃদয়ছোঁয়া আহবানের জলপান শব্দটি উঠাইয়া নির্বাসন দিতে আহ্বানকারীকে কোথায় খুঁজিয়া পাইব।

শহরের নতুন এলিটদের বাড়ীতে ঝোল-সুরুয়া-মাংস-গোস্ত শব্দগুলি প্রায় উধাও হইয়া গিয়াছে। চাটগাঁইয়া বদাখোলা যেমন শহরে আসিয়া (অমলেট) মামলেট হইয়াছে তেমনি ডাইনিং টেবিলের উপর লাঞ্চ বা ডিনারে ঝোল বা সুরুয়ার স্থলে ভেজিটেবল সুপ, চিকেন সুপ, গোস্ত বা মাংসের পরিবর্তে চিকেন মটন আর বীফ আসিয়াছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাগলের গোস্ত আর গরুর মাংস এখনো প্রচলিত আছে। ইলিশ মাছ, মাগুর মাছ, পাংঘাশ, রূপচাঁদা শুটকী খাঁটি বাঙ্গালীত্ব লইয়া স্বীয় আভিজাত্য বজায় রাখিতে এখনো সক্ষম

www.pathagar.com

রহিয়াছে। দস্তরখানা ডাইনিং টেবিলে বেমানান হইয়া নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে। গ্রাম্য গোস্ত বা মাংস ঝোল বা সুরুয়া অনেকের বাড়ীর বারান্দায় প্রবেশ করিতে সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছে।

জল বা পানি বাথ রুম ও রান্নার জন্য আর পানের নিমিত্ত আসিয়াছে মিনারেল ওয়াটার, সেভেন আপ, ফান্টা, কোক, পেপসি ইত্যাদি। জল শব্দটি একমাত্র বাংলাদেশী শব্দ, সমগ্র ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান উপমহাদেশে পানি সর্বত্র বিরাজমান।

জল, পানি, ঝোল, সুরুয়া, গোস্ত, মাংস ছিল ত্রিশ/চল্লিশ দশকে হিন্দু-মুসলমানের বেহুদা ঝগড়া। '৯০ দশকে এই ঝগড়া নব্য ভূত হইয়া আসার অর্থ হইতেছে ডনকুইকজট মার্কা হাওয়াতে ঘুষি মারার বিকৃত আর্ত চীৎকার। এই নব্য কুইকজটগণ জল-পানি ঝোল-সুরুয়া গোস্ত-মাংসের সাথে ঘুষি মারিতেছেন।

অপর একদল ধর্ম লইয়া নিদ্রা হারাইয়া নিন্দা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

মসজিদে আজানের ধ্বনি, মন্দিরে দেবতার আরতী–এইত বাংলাদেশের আবহমান কালের চিত্র। কাহারো ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কেহ ধর্মানুষ্ঠান পালন করে নাই। ধর্মের বিরুদ্ধে এক চোট বলিলে বা দুই কলম লিখিলেই প্রগতিশীল বলিয়া খ্যাত হওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় ধর্ম যে দিন ছিল না, ইংরেজের অধীনে আমরা যখন ছিলাম তখনও এই বাংলার মসজিদ হইতে আজানের ধ্বনি শোনা গিয়াছে, মন্দিরে কাঁসার ঘন্টা বাজিয়াছে। রাষ্ট্রীয় নির্দেশ বা নিষেধের উপর বাঙ্গালীর ধর্মানুষ্ঠান পালন কখনো নির্ভর করে নাই।

আগামীতেও কোন ডনকুইকজট আসিয়া বাঙ্গালীর আবহমানকাল ধরিয়া লালিত পালিত বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানকে হাওয়াতে ঘুষি মারিয়া স্তব্ধ করিতে পারিবে না।

বিশ্ব এখন হাতের মুঠায় আসিয়াছে। বিশ্বের দরবার হইতে আমরা নতুন চিন্তা, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ বর্জনের এই মহা লীলাখেলায় ঝোল-সুরুয়া গোস্ত-মাংস ধর্ম-অধর্ম বিতর্ক নির্বোধের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই বিতর্কে নব্য কুইকজটগণ কখনো উদীয়মান সূর্যের প্রত্যয়ভরা যাত্রাপথে জয়লাভ করিতে পারিবে না। খয়াল কানপুরীর ভাষায় – নিগাহে জিন কি নেহিঁ হ্যায় উৎরভে সুরুযপর ওড়ুবতে হয়ে তারো কি বাৎ করতে হ্যায় অর্থাৎ উদীয়মান সূর্যের দিকে যার চোখ নেই সে ডুবন্ত তারার কথা বলে।

www.pathagar.com

অথবা আরো বলা যায়–

চমনমে যব কহিঁ হোতা নিহি বাহার কা

তো লোগ বিডি বাহারোকা জিকর বাৎ করতে হ্যায়।

অর্থাৎ নিজের বাগানে যার ফুল ফুটাবার ক্ষমতা নেই, সে অতীত বসন্ত বাহারের বর্ণনায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখে। নির্বোধ ডনকুইকজটবৃন্দের কখনো কি বোধোদয় ঘটিবে না? তাহাদের অন্ধত্ব কি দূরীভূত হইবে না?

যুক্তি ও প্রযুক্তির মহড়া মহামুক্তির সোপানতলে তাহারা একবারও কি পদচারণ করিবে না?

এই দেশের নিরন্ন মানুষের পাতে ঝোল-সুরুয়া কোনটিই নাই। একবেলা বা একদিন পর পর যাহারা ভাত, আলু, কচু, ঘেচু, শাক, লতাপাতা সিদ্ধ করিয়া বা একটি লংকা পুড়িয়া কোন রকমে এক বাটি আধাবাটি ভাত গিলিয়া মানবেতর জীবন যাপন করিতেছে তাহাদের কাছে ঝোল সুরুয়ার বিতর্ক নাই। গরীবের পান্তা ভাত কখনো জল ভাত হয় না।

যে নিরন্ন মানুষ দুইবেলা ভাত খাইতে পারে না, তাহারা ঝোল দিয়া ভাত খাইতে দ্বিধা করিবে না। ভাত খাইতে পারিলেই হইবে। ঝোল সুরুয়া বাংলা অভিধানে থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

গোস্ত বা মাংস দিয়া ভাত এ দেশের অধিকাংশ মানুষের সাধ্যের বাহিরে। খানা মেজবানীতে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহকারীদের শুমার করিলেই এই সত্য দিবালোকের মত ধরা পড়িবে।

অন্ন কোথায়? কোথায় অন্ন? অন্ন যাহারা উৎপাদন করিতে হন্য হইয়া চরাঞ্চলে যায়, গর্কির পানিতে তাহারাইত লাশ হইয়া সংবাদচিত্র হয়। নিরন্ন মানুষের জন্য অন্নের ভাষা চাই। ঝোল–সুরুয়ার বিতর্ক নয়। ধর্মের বিরুদ্ধে বা ধর্মীয় রাষ্ট্র করিবার মধ্যযুগীয় চিন্তা নয়। অন্ন চাই। আমাদের জন্মলগ্নের ক্ষুধা পৈচানো প্রাণ অন্নেই একমাত্র সমর্পিত। গরীবের রোগের নাম ক্ষুধা আর ঔষধের নাম ভাত, আর সব মিথ্যা সংলাপ।

গোস্ত বা মাংস নয়, ঝোল বা সুরুয়া দিয়া নয়, চিকন মোটা রিলিফের রেশনের আতপ বা সিদ্ধ কোন চাউলেই নিরন্নের বিতর্ক নাই। ক্ষুধার রাজ্যে পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো-রুটি, ঝোল বা সুরুয়া যাহা দিয়া হউক ভাত চাই, দুই বেলা দুই মুষ্টি ভাত চাই-ভাত-ভাত-ভাত চাই ...।

www.pathagar.com

টেন্ডলের ঈদ উদযাপন

হেঃ হেঃ টেন্ডল বড়ই মুসিবতে পড়িয়াছে। তাহার মুসিবতের কারণ হইল এইবার সে কিভাবে ঈদ উদযাপন করিবে।

হেঃ হেঃ টেন্ডল সন্ন্যাসীও নহে, সন্ত্রাসীও নহে। তবে সে নিতান্তই জি, জি ও হেঃ হেঃ।

জনৈক ব্যক্তি কহিলঃ ওহে, তুমি কি আওয়ামী লীগ?

টেন্ডলঃ জিঃ জিঃ, হেঃ হেঃ।

আর একজনঃ তুমি কি বি, এন, পি?

টেন্ডলঃ জিঃ জিঃ, হেঃ হেঃ।

তৃতীয় জনঃ অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়া যখন তাহাকে সম্বোধন করিল তখনো সে কহিল, জি জি, হেঃ হেঃ।

টেন্ডলের এহেন নির্বিকার ও সহাস্য উত্তর শ্রবণে তৃতীয় জন কহিল, হে টেন্ডল, তোমার কি নীতি নাই?

টেন্ডলঃ নিশ্চয় আছে, চোরের নীতি আছে, ঘুষখোরের নীতি আছে, মস্তানদের নীতি আছে–আমার থাকিবে না কেন?

তৃতীয় জনঃ তোমার নীতি কি?

টেন্ডলঃ আমার নীতি হইল, যখন যেমন তখন তেমন। আমি সাপকে লম্বা বলিব না, ব্যঙ্গকে বেঁটে বলিব না। আমি সত্য বলিব, অপ্রিয় সত্য বলিব না।

তৃতীয় জনঃ তোমার সত্যের স্বরূপ কি?

টেন্ডল ঃ আপনি বাঁচিলে বাপের নাম। নিজে বাঁচিবার জন্য যাহা করিব, তাহাই আমার জন্য সত্য।

তৃতীয় জন ঃ তুমি সত্যবাদী মিথ্যুক।

টেন্ডলঃ জি জি, হেঃ হেঃ।

www.pathagar.com

টেন্ডল গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছে। শহরে আসিবার বয়স আজ ৭ বৎসর। সে আর গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারে না। শহরেও গত বৎসরের শেষ দিক হইতে তাহার অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে।

গত ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনে টেন্ডলের খুব কদর ছিল। এইবার তাহাকে কেহই পাত্তা দিল না। এই দুঃখ কোথাও রাখিবার স্থান নাই।

গত কয়েক বৎসর রমজান মাস তাহার খুবই ভাল কাটিয়াছিল। বিশেষ করিয়া ইফতার মাহফিলে কাচ্চি বিরিয়ানী তাহাকে মোটা তাজা করিয়া দিয়াছিল। তাহার নির্দিষ্ট দল নাই, সে সকলের হেঃ হেঃ।

এইবার ইফতার পার্টি তাহাকে হতাশ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ শৈত্য প্রবাহ। হেঃ হেঃ টেন্ডল গত ৫০ বৎসরে এমন শীত দেখে নাই। কতজনের ভাগ্যে কম্বল জুটিয়াছে। হতভাগা যে দিকে যায় সাগর শুকাইয়া যায়। তাহার ভাগ্যে শীতের কম্বল অথবা নিমন্ত্রণের আশ্বাস কোনটাই জুটিল না।

টেন্ডল শহরে হাঁটিতেছে। আলোয় আলোয় শহরের বিপনী বিতানসমূহ ঝলসিয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তান আমাদেরকে ২৪ বৎসর ধরিয়া খাইয়াছে। আমি এইবার পাকিস্তানী সেমাই খাইব। টেন্ডলের পয়সা নাই। পাকিস্তানী চিকন সেমাইয়ে একবার হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা লাভ করে।

পাজেরো ইত্যাদি দামী গাড়ীর পাশে দাঁড়ায় টেন্ডল। গাড়ীর চকচকে রঙে নিজের দেহ প্রতিবিম্বিত হয়। গাড়ীর চকচকে রঙে তাহাকে আরো লম্বা ও সুদর্শন দেখায়। এমন একটি গাড়ি----। তওবা তওবা, এমন কুচিন্তা কেন---।

টেন্ডল আবার হাঁটে। লাল-নীল-সবুজ-হলদে রঙের ফল আপেল, আঙ্গুর, কমলা, আনার আহা, কি মনোরম রঙ, খোসাটা পর্যন্ত খাইতে ইচ্ছা করে। ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনং। এই ফলের ঘ্রাণ শুঁকিয়া ফলের রঙ দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করে।

টেন্ডলের ক্ষোভ হয় চক্ষু দুইটি লইয়া, যত দোষ এই চোখের। এই দুইটি চক্ষু যদি না থাকিত তবে লোভ ঈর্ষা বলিয়া কোন কিছুই উদিত হইত না।

টেন্ডল গরিব নহে, ভিখারী নহে, ফুটপাথের বাসিন্দাও নহে। আহা, ফুটপাথের বাসিন্দারা কতই না আরামে রহিয়াছে। তাহাদের ঘর ভাড়া নাই, ইলেকট্রিক বিল, পানির বিল, গ্যাসের বিল নাই---।

টেন্ডল হেঃ হেঃ করিয়া নেতাদের মন যোগাইয়া আসিয়াছিল। নেতারা (সিকি-আধুলি) তাহাকে দশ-বিশ টাকা ধরাইয়া দিত।

আকাল, আকাল। দেশে যেন নেতার আকাল পড়িয়াছে। টেন্ডলের হেঃ হেঃ শুনিবার অবকাশ আজ নাই---। নেতাদের দেখা হইলে সবাই বলে, আর একদিন এস টেন্ডল।

www.pathagar.com

টেন্ডল মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেয়। শবে বরাতের রাত্রে ওই বিকলাঙ্গ মানুষের যে মূল্য, সে মূল্যও আজ তাহার নাই। বিকলাঙ্গ মানুষটির পাশে টাকার স্তূপ পড়ে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় '৯৮ সালের ঈদ ফ্যাশনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র-পত্রিকায় ঈদের বিশেষ রান্নার বিবরণীও থাকিতেছে।

১২ কোটি লোকের কতজনের ভাগ্যে এই ফ্যাশন ও রন্ধন তালিকা? টেন্ডলের মাথা ঘুরিয়া উঠে---। টেন্ডলের সান্ত্বনা, দেশের অধিকাংশ মানুষের জন্য ওই ফ্যাশন আর রন্ধন শিল্প নহে। না পাওয়ার মধ্যে এক মধুর স্বাদ আছে। হেঃ হেঃ টেন্ডল কি কবি হইয়া উঠিয়াছে?

অর্থই যত অনর্থের মূল। টেন্ডলের অর্থ নাই--- তাই তাহার জীবন অনর্থক নহে---। টেন্ডল আবার ভাবে, আমি কি শুধু হেঃ হেঃ। না আমি একা হেঃ হেঃ নহি---। অনেকেই আজ হেঃ হেঃ। রাজনৈতিক দলের নেতারা যতই হম্বি তম্বি করুক দলের হাই কমান্ডের কাছে সকলে হেঃ হেঃ। হাই কমান্ডের কাছে হেঃ হেঃ না হইলে ষড়যন্ত্রকারীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইনকামটেক্স অফিসার, ভ্যাট অফিসারের নিকট ব্যবসায়ীও হেঃ হেঃ। ঘরে স্ত্রীর নিকট স্বামী হেঃ হেঃ। পুলিশের নিকট ধরা পড়া আসামী হেঃ হেঃ। বড় অফিসারের নিকট ছোট অফিসার, দপ্তরী, পিওন সকলে জি, হেঃ হেঃ।

তাহাদের কাহারো পদবী হইল না জি, হেঃ হেঃ। অথচ আমি টেন্ডল ভাগ্যদোষে হইলাম হেঃ হেঃ টেন্ডল। তবু আশায় আশায় টেন্ডল এখনো ধরাধামে বাস করিতেছে। ধন্য, ধন্য হে আশা।

তারাবী পড়িয়া টেন্ডল ঘুমাইয়া রহিল। ঘুমে টেন্ডল স্বপ্নে দেখিল, পুত্রদের লইয়া সে ঈদগাহে গিয়াছে। নামাজ শেষ হইল। মাঝারী ধরনের এক নেতা টেন্ডলকে জড়াইয়া ধরিল। জোর করিয়া টেন্ডলকে গাড়ীতে করিয়া লইয়া গেল। টেন্ডল টেবিলে বসিয়া খাইতে লাগিল। ঈদের খাওয়া, কত রকমের খাওয়া টেবিলে, ইহার ইয়ত্তা নাই। টেন্ডল একখানা মুরগীর রান লইয়া চিবাইতে লাগিল।

আহা, মুরগীর মাংস এতই স্বাদের! ইহা সে ইতিপূর্বে কল্পনা করিতে পারে নাই।

এমন সময় সেহরীর জন্য ডাক পড়িল, টেন্ডলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ভঙ্গ হইল ঈদের দিনে মুরগীর রান খাওয়ার স্বপ্ন। টেন্ডল দেখিল, তাহার মুখের মধ্যে বালিশের তুলা গুঁজিয়া রহিয়াছে।

হায়রে হেঃ হেঃ টেন্ডলবৃন্দ! তোমাদের জন্য স্বপ্নে মুরগীর রান মুখে থাকিলেও বাস্তবে বালিশের তুলাই জুটিবে। ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য ২০ হাজার মানুষ যখন লুটিয়া লয় তখন টেন্ডলগণের মুখে বালিশের তুলা না ঢুকিয়া কি মুরগীর রান ঢুকিবে?

❐ ২৩ জানুয়ারী, '৯৮

www.pathagar.com

মেঘ কেন সূর্য ঢাকে?

পিটা ও পিঠা দুইটি পার্থিব বস্তু। এই দুইটির স্বাদ আমরা বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন যুগে আস্বাদন করিয়াছি, করিয়াছিলাম, করিতে থাকিব বলিয়া মনে করিতেছি।

একদা টুনটুনি পাখী পিঠা খাওয়াইবার জন্য অনেককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। টুনটনি পাখী অবশেষে সকলকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করিল।

আমরা বিশেষ করিয়া এই বাঙ্গালীগণ বিভিন্ন সময়ে টুনটুনি পাখীর আমন্ত্রণে পিঠা খাইবার লোভে গাছের তলায় সমবেত হইয়াছি, কিন্তু পিঠার পরিবর্তে পিটা খাইয়া মজবুর হইয়া পড়িয়াছি।

অপরের ছলনায় প্রলুব্ধ হইয়া আমরা যুগে যুগে কিভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছি ইহার বয়ান শেষ করা যাইবে না।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে আমরা আমাদের লাঞ্ছনার বহু কাহিনী দেখিতে পাইব।

এই দেশে নানান বেশে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফ্রান্স, ইংরেজ ইত্যাদি বিদেশীগণও গমন করিয়াছিল। ভাস্কোদাগামা দুইবার এই ভারত উপমহাদেশে আসিয়াছিল। ভাস্কোদাগামার ধারণা ছিল এই দেশে সকলেই খৃষ্টান নয়ত মুসলমান। উঁচু উঁচু মন্দিরগুলোকে তিনি গীর্জা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি এহেন গীর্জায় পূজাও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে সিরীয় দেশের খৃষ্টানগণ তৃতীয় শতকে এই উপমহাদেশে আগমন করেন। সিরীয় দেশের খৃষ্টানগণের ধর্মীয় মতবাদ রোমান ক্যাথলিক ধর্মের

www.pathagar.com

সহিত সম্পৃক্ত ছিল না। খৃষ্টান ধর্মের আগমন তাই বৃটিশ রাজের বহুপূর্বে এই উপমহাদেশে আসিয়াছিল। পর্তুগীজগণ আসিয়াছিলেন সোজা বঙ্গোপসাগর দিয়া চট্টগ্রামে। তাই তাহারা এই চট্টগ্রাম বন্দরকে 'পোর্টো গ্র্যান্ডে' বা বড় বন্দর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

এই পর্তুগীজগণ যখন পারিত তখন লুটপাট করিত। পরে তারা বুঝিল লুটের মজা সাময়িক, কিন্তু 'বুটের' (Boot) মজা তথা ক্ষমতার স্বাদ থাকে দীর্ঘদিনের। এই 'বুট' আর লুটের খেলায় বৃটিশদের সহিত কেহ পারিয়া উঠে নাই।

বৃটিশরা মিষ্টি কথার বুলি ছাড়িয়া মোগল দরবারে প্রবেশ করিল। তাহারা বাঙ্গালা মুল্লুকে ব্যবসা করিবার সনদ আদায় করিল। তাহারা বাণিজ্য করিতে আসিল। পর্তুগীজদের মত শুধু লুট করিতে নহে।

বুদ্ধি থাকিলে ভাত আর বুদ্ধিহীন হইলে হা-ভাত। বৃটিশ হইল বুদ্ধির রাজা তাহারা একবারে মূলা তোলা না করিয়া 'বেগুন' তোলার মত দীর্ঘস্থায়ী লুটপাটের ব্যবস্থা করিল।

টুনটুনি পাখীর মত মির্জাফরকে পিঠা খাওয়াইবার লোভ দেখাইয়া বাংলার মসনদ বৃটিশরা ১৭৫৭ সনে দখল করিল।

মির্জাফর ও তাহার বেটাকে ক্ষমতার লাভ-লোভের ভেল্কী দেখাইয়া অবশেষে সকল কিছু হাতড়াইয়া লইল।

বাংলার সিংহাসন বৃটিশদের হাতে চলিয়া যাওয়ার মাত্র ১৩ বৎসরের মধ্যে ১৭৭০ খৃঃ (১১৭৬ বাংলায়) ১ কোটি লোক না খাইয়া মারা গিয়াছিল। তখন বাংলার লোকসংখ্যা ছিল মোটামুটি ৪ কোটি। বঙ্গীয় এগারশ ছিয়াত্তরের এ মন্বন্তরের সময়ে বাংলাদেশ হইতে কোটি কোটি টাকা সাত সমুদ্রের অপর পাড়ে চলিয়া গিয়াছিল।

শুধু বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন হইতেছে চিঠিপত্র। প্রাচীন এই চিঠিপত্রের মধ্যে রহিয়াছে ক্রয়-বিক্রয়, হুকুমনামা, শাসন সংক্রান্ত, দাসদাসী ক্রয় বিক্রয়, মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় ও আত্ম বিক্রয় কর্জপত্র।

আবিষ্কৃত পুরাতন চিঠিপত্রে আত্মবিক্রয়ের করুণ কাহিনী খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই সমস্ত চিঠিপত্রে গত্ব বিধান, ষত্ব বিধান, দাড়ি কমা, নাই–আছে সকরুণ বিলাপ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে সপ্তম দশকের মধ্যে লিখিত আত্মবিক্রয় পত্রের মধ্যে দেখা যাইবে যে কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে লোকে গো মহিষাদির মত নিজেদের ক্রয় বিক্রয় করিয়া দিত। সামান্য দুই চার টাকা হাতে পাইলে সন্তানকে বিক্রয় করিতে দ্বিধাবোধ করিত না।

www.pathagar.com

মুচিরাম চঙ্গ নামে জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী শ্রীমতী তপী, পুত্র পঞ্চা চঙ্গ, বারু চঙ্গ, রনজিত চঙ্গ ও কন্যা কালিন্দী বালাকে দেনার দায়ে অন্নহীন অবস্থায় জয় কৃষ্ণ গুহের নিকট মোট এগার টাকা নিয়া স্বইচ্ছা পূর্বক আত্মবিক্রয় করিয়াছিল।

শ্রী বাসিবার শূদ্র, স্ত্রী পুত্র, ভগ্নিগণ ২১ একৈশ রুপাইয়া দস্তবস্ত পাইয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছিল।

মহা দুর্ভিক্ষের প্রেতহানার দেনার দায়ে ও অন্যভাবে সপরিবারে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে দাসত্ব করিতে হইত। এই ক্রীত দাসদাসীর ঘরে যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিত তবে তাহারাও আপনা আপনি 'বিক্রয়' হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইত।

১১৭৬ সনে (১৭৬৯-৭০ ইংরেজী) যে মন্বন্তর হইয়াছিল তখন লোকে কি ভাবে আত্মবিক্রয় করিয়া সপরিবারে দাস হইয়া যাইত উহার মর্মন্তুদ বিবরণ নিম্নে বর্ণিত চুক্তিপত্র হইতে পাঠক লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

চিঠির নমুনা

শ্রী চারু বেওয়া আওলাদে তীতু গোপ ইবনে গঙ্গারাম গোপ বন্দা আটবি পত্র মিদং সন ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তর অব্দে লিখং কার্যঞ্চ আগে অকালে অন্নাভাবে মরি মহাশয়ের নিকট আত্মবিক্রয় হইলাম ভরণ-পোষণ করিয়া দাস্যে দাখিল করিবেন একরার বিকাইলাম ইহাতে পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন। (দাড়ি, কমা নাই)

যুগে যুগে অন্ন চিন্তা ছিল মহাচিন্তা, এই চিন্তার জন্য দায়ী হইতেছে বৈদেশিক লুণ্ঠন, উদ্ধৃত পত্রটিই আমাদের বঞ্চনার করুণ চিত্র। এই বঞ্চনা ১১৭৬ সালেই শেষ হয় নাই। এই বঞ্চনা বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করিয়াছে। ইহার উপর বৈরী প্রকৃতি কষ্টে দুঃখে সাজানো ক্ষুদ্র নীড়কে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছে, বহু প্রাণকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে।

যাহার পিতাকে একবার নহে বহুবার কুমিরে ভক্ষণ করিয়াছে, সে কি একবারও ঢেঁকি দেখিয়া ভয়ে আঁত্কাইয়া উঠিবে না?

শত শতাব্দীর বঞ্চিত বাঙ্গালী তাইত বিভিন্ন সময়ে গর্জিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালীর শেষ গর্জনের সন হইল ১৯৭১। আমাদের নতুন প্রজন্মকে তাই জানাইতে হইবে আমাদের প্রবঞ্চনার ইতিহাস এবং ইহারই সহিত আর যাহাতে প্রবঞ্চিত না হইতে হয় উহার জন্য চাহি সতর্ক সংকেত।

হে আমাদের আঁতেলবৃন্দ, আপনারা কি পুরাতন দিনের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? আমাদের মুক্তি সংগ্রামের দীপ্র গাথা কি অন্তরে মন্তরে সঞ্চার করে না? যদি করে, তবে সতর্ক বাণী কোথায়? কেন মেঘ সূর্য ঢাকিতে চাহে?

❐ ১০ই জুন, ১৯৯৪

www.pathagar.com

লাথি সংঘ

পৃথিবীতে মানব জাতি কিভাবে সৃষ্টি হইয়াছে ইহার বিতর্ক নতুন নহে। এই বিতর্ক সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে না।

গ্রীকগণ মনে করিতেন যে প্রমিথিয়াস প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেন। ইহা লইয়াও গ্রীকদের মধ্যে দ্বিমত রহিয়াছে। তাহারা বলিয়া থাকেন যে বিরাটাকার সাপের দাঁত হইতে প্রথমে মানুষের জন্ম হয় এবং এই মানুষের কল্যাণের জন্য প্রমিথিয়াস স্বর্গ হইতে আগুন চুরি করিয়া লইয়া আসে। এই জন্য প্রমিথিয়াসকে পৃথিবীতে বহু দিবস-রজনী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পৃথিবী ভূগর্ভ হইতে স্বাভাবিকভাবে বৃক্ষের ফলের মত মানুষ প্রসব করিয়াছে।

মানুষের জন্ম যেমনিভাবে হউক না কেন মানুষ জাতি বহু বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে বিচরণরত আছে। পৃথিবী নামক খাঁচাটি ছাড়িয়া মানুষ অন্যত্র এখনো বাস করিতে সক্ষম হয় নাই।

www.pathagar.com

দীর্ঘ দিবসব্যাপী মানুষের এই বাসের সময়কে বিভিন্ন যুগে ভাগ করা হইয়াছে।

ভারত উপমহাদেশে মানুষেরা এই যুগ বিভাগ করিয়াছে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ। আমরা বর্তমানে কলিযুগে বাস করিতেছি। কলিযুগের ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে গ্রীক মতে যুগ বিভাগ কি ছিল উহা আলোচনা করা যাইতে পারে। তাহাদের মতে মানুষের যুগ হইল পাঁচটি। আদিযুগ হইল সুবর্ণ যুগ, এই যুগে দুঃখ বলিয়া কোন পদার্থের/জিনিষের বা অনুভূতি ছিল না। তখনকার দিনের মনুষ্যগণ কোন প্রকার কায়িক পরিশ্রম করিত না। তাহারা বনে বনে বিচরণ করিয়া বৃক্ষের ফল আর ভেড়া বা ছাগ দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিত। তাহাদের জরামৃত্যু ছিল না। তাহারা সব সময় নৃত্য গীত তথা আনন্দ করিয়া জীবন কাটাইত। কালক্রমে এই ধরনের মানব জাতি বিলোপ হইল।

স্বর্ণযুগের পর শুরু হইল রৌপ্যযুগ। এই যুগে মানুষ রুটি ও মাংস ভক্ষণ করিত। মনুষ্যগণ ছিল সকলে শতায়ু। এই সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মায়ের আদেশ কেহই অমান্য করিত না। নিজেরা কখনো কখনো ঝগড়া করিলেও জখম ও হত্যাকাণ্ডে জড়াইয়া পড়িত না।

এই কাল রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়িল। গ্রীকদের ধারণা জিয়াসের অভিশাপে তাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর আসিল পিতলের যুগ। এই যুগের মানুষ পিতল দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিত বলিয়া ইহাকে পিতলের যুগ বলা হইয়া থাকে। ইহারা ছিল নিষ্ঠুর ও যুদ্ধবাজ। তাহারাও মাংস ও রুটি ভক্ষণ করিত। যুদ্ধ করিয়া তাহারাও ধরা পৃষ্ঠ হইতে অবলুপ্ত হইল।

ইহার পর শুরু হইল মানব জাতির চতুর্থ যুগ। এই যুগে মানুষ দেবতার ঔরসে মানবীয় গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিত। তাহারা যুদ্ধবাজ হইলেও মানসিকভাবে উদার ছিল। তাহারা থীবস ও ট্রয়যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

সর্বশেষ আধুনিক যুগ হইল লৌহযুগ। ইহাই মানব জাতির পঞ্চম স্তর। গ্রীকদের ধারণা বর্তমানের মনুষ্যগণ পূর্ববর্তী স্তরের অযোগ্য বংশধর। ইহারা নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ, কামপ্রবণ, বিশ্বাসঘাতক ও পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীন।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগে মানুষ গ্রীক দেশের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মত ছিল।

গ্রীকের লৌহযুগের মত অবস্থা হইল কলিযুগের।

www.pathagar.com

আমরা কলির সন্ধ্যা দেখিতেছি। ঘোর কলি এখনো বাকী রহিয়াছে। কলিযুগের আগমনের পূর্বে যুধিষ্ঠির স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে ঃ

যুধিষ্ঠির বলেন যে শুন লীলাবতী
নিঃশত্রু করিয়া আমি ছাড়িলাম ক্ষিতি।
কলি আগমনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ
রাজ্য ত্যাজি কর গিয়া স্বর্গ আরোহণ।

কলিকালের মনুষ্যগণ আকারে ছোট হইবে। বর্ণ অইব কালা/বাপেরে ডাকবো হালা।

এইকালে ছেলে পিতাকে মান্য করিবে না। কলিকালের পোলাপান/বাপেরে কয় তামুক আন।

কলিকালে ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতি থাকিবে না। পুত্রবধূ শাশুড়ীকে মারধর করিবে।

ভাইয়ে ভইয়ে কাইজ্যা কইরা/দুয়ারে বানবো ঝাঁটা
কলিকালে পুতের বউয়ে /হরীরে মারবে ঝাঁটা।

কলিকালে পথঘাটের জায়গা জমির পরিবর্তন হইবে।

কলির কাল পড়বো
অ-পথে পথ অইবো
অ-ঘাটে ঘাট অইবো
অ-ক্ষেতে ক্ষেত অইবো
অ-মানুষে মানুষ অইবো।

কলিযুগে ভাল খাদ্য অখাদ্য হইবে, অখাদ্য খাদ্য হইয়া উঠিবে। অযোগ্য ব্যক্তিগণ সমাজে মান্যবর হইবে। যোগ্যতর ব্যক্তিগণ তীর্থের কাকের মত হা করিয়া থাকিবে ..... অবাক কলির অবতার/ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

কলির আগমন দেখিয়া নীতিবানগণ ভড়কাইয়া গিয়াছেন। দেখে ঘোর কলি/ হাড়ে মাংসে জ্বলি।

আসল কলিযুগ এখনো দূরে রহিয়াছে। এইখানে কলিযুগের সে প্রবাদসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছি উহা কলিযুগের পূর্বাভাস।

যদি ইহা পূর্ণ কলি না হইয়া থাকে তবে ইহাকে কোন যুগ বলিব। পণ্ডিতগণ এখনো ঠিক করিতে পারে নাই ইহা কোন যুগ?

ইহা কি আনবিক যুগ? ইলেকট্রনিক যুগ। শান্তির না অশান্তির যুগ।

কেহ কহিবেন, ইহা হইল মরণযুগ, মস্তানীযুগ।

www.pathagar.com

যুগ বিন্যাস করা বড়ই দুস্কর হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান যুগ হইল লাঠালাঠি ও লাথালাথির যুগ। এই দুইটি হইল এই যুগের উৎকৃষ্ট পরিচয়। লাঠালাঠির কাহিনী অন্য সময় বয়ান করিতে চেষ্টা করিব। এইবার লাথালাথির যুগের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। বর্তমান যুগ লাথির যুগ। বহুপূর্বে ল্যাং মারামারিকে আমাদের দেশের একমাত্র জাতীয় ক্রীড়া হিসাবে ঘোষণা দেওয়া উচিৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। ল্যাং মারামারি ও লাথালাথি এক কথা নহে।

'লাথি নৃত্য' এখন এক বিশ্বনন্দিত কথা। বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা আদতেই উচ্চাঙ্গের লাথির এক 'নৃত্য'। ২২ জন খেলোয়াড় একটি বলকে লাথির পর লাথি মারিতেছে আর দুনিয়া জোড়া মানুষ বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের মানুষ রাত্রির সুখ নিদ্রা হারাম করিয়া উহা দেখিতেছে। ফুটবল খেলায় বলকে লাথি মারিতে হইবে। একমাত্র গোলকিপার বল ধরিতে পারিবে তাও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। 'বলে' লাথিমারা শিক্ষা দিয়া ছিল বৃটিশ। বৃটিশরাজ শুধু ফুটবলে লাথি মারিয়াছে উহা নহে তাহারা বিভিন্ন দেশে দীর্ঘদিন ধরিয়া মানুষের বুকে-মুখে-নিতম্বে, রাজত্বে ও রাজাকে যুৎসই করিয়া ছোট, বড়, মাঝারী সাইজের লাথি মারিয়াছে।

কিন্তু ইতিহাস কাহাকেও ক্ষমা করে না। বলে লাথি মারার পিতা বৃটিশ সিংহ বিশ্ব ফুটবল খেলা হইতে এইবার ছিটকাইয়া পড়িয়াছে।

পা দিয়া আঘাত করিলে লাথি হয় না। কোন গৃহ শিক্ষক যখন ছাত্রীর পায়ে পা দিয়া ঘষিয়া থাকেন তখন উহা লাথি নহে, উহা গোপনে প্রেম নিবেদন।

মুখে লাথি মারা, বুকে লাথি মারা, পাছায় লাথি মারা, লাথির কাঁঠাল লাথি ছাড়া পাকে না, লাথি মারিয়া কাঁঠাল পাকানো ইত্যাদি লাথি নিয়া প্রবচন চালু রহিয়াছে।

অখণ্ড রাশিয়াকে আমেরিকা ভয় করিত, কারণ দুইজনেই লাথি মারিবার সমান শক্তি রাখিত।

আমেরিকা লাথি না মারিয়া রাশিয়ানদের মুখে 'চুমো' দিয়া রাশিয়াকে ভাঙ্গিয়া দিয়া সারা দুনিয়াকে একাই লাথি মারিবার অধিকারী হইয়াছে এবং একাই লাথি মারিয়া যাইতেছে। যাহার বিবাহ তাহার খেয়াল নাই, অন্যদিকে পাড়া পড়শীর ঘুম নাই। মার্কিন মুল্লুকে 'লাথিমারা'র বিশাল আয়োজন হইলেও সেই দেশে উহা নিয়া বিশেষ কোন মাথাব্যথা নাই।

এই যে আমরা লাথি দেখিতেছি উহা যেমন তেমন লাথি নহে। ইহা গরু ছাগল ভেড়ার লাথি নহে। ইহা মানুষের লাথি 'পায়ের' শক্তিশালী চলমান নৃত্য। এই নৃত্যে সূক্ষ্ম কদর রহিয়াছে। লাথির প্রতি মুহূর্তে শিহরণ সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

লাথি যদি ফুটবলের মাঠে সীমাবদ্ধ থাকিত, তবে ইহাকে লাথির যুগ বলা যাইত না। লাথি এখন ফুটবলের মাঠ ছাড়িয়া সকল প্রান্তরে ছুটিয়া আসিয়াছে।

বড়দেশ ছোটদেশকে লাথি মারিতেছে। উন্মুক্ত বাজারের লাথিতে অনুন্নত দেশ উচ্ছন্নে যাইতেছে।

ফুটবলের লাথি একবার ব্যর্থ হইলে পুনরায় প্রতিপক্ষ নতুন লাথি মারিতে শক্তি অর্জন করে।

কিন্তু একদেশ যখন লাথি খাইয়া কাবু হয় তখন সে সোজা হইতে পারে না। ইহার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হইল রাশিয়া। মার্কিন মুল্লুকের চুমু খাইয়া রাশিয়ার বুকে যে লাথি পড়িয়াছে উহাতে রাশিয়া দিনের পর দিন বাঁকা হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেছে।

ফুটবলে লাথি মারিতে আমেরিকা ওস্তাদ হইতে পারে নাই এবং পারিবেও না। কিন্তু তাহাদের না-পছন্দ কাজ কারবার যাহারা করিবে, সে উহাকে লাথি মারিবে। পায়ের চোখ নাই, প্রাণ নাই, এই লাথি সব সময় 'অন্ধ'। এই অন্ধ লাথি কখন কাহার মুখে-বুকে ও পাছায় পড়িবে ইহা কেহ জোর হিসাব করিয়া বলিতে পারিবে না।

একদা এক জমিদার তাহার চাকরকে কহিল, 'ওহে, তোমাকে একটি লাথি মারিব।

চাকর কহিল, আমারও পা আছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া জমিদার কহিল, বেতমিজ. আমাকে লাথি মারিবা?

চাকর কহিল, হুজুর উহা নহে.. আপনি লাথি মারিলে আমি পায়ের জোরে পলাইয়া যাইব।

বড় বড় দেশ ছোট ছোট দেশকে লাথি মারিবে তাই ছোট ছোট দেশ লাথি না মারিয়া পায়ের জোরে পলায়ন করা হইবে সর্বোত্তম কাজ।

পলায়নের অপর নামই জীবন। ইহাই হইবে ছোট ছোট দেশের জীবনাদর্শ। আর শক্তিশালী দেশের কাজ হইবে লাথি মারা ও লাথি মারা দেখানো। লাথি খাইয়া ও লাথি দেখিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি. তাই এই যুগের নাম লাথির 'যুগ'।

দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পর লাথি না মারিবার ঘোষণা দিয়া জাতিসংঘ নামক শান্তি ক্লাব সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার পর কি লাথি কমিয়াছে? বরং লাথির গতি ও পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

তাই এই লাথির যুগে জাতিসংঘের নাম 'লাথি সংঘ' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

❐ ২৪শে জুন, ১৯৯৪

www.pathagar.com

মেধা গাধার রুহে অনুপ্রবেশ

ওমর খৈয়ামকে হাকিম বলা হইত, তবে তিনি এলাজের/ঔষধের হাকিম ছিলেন না, তিনি হাকিম অর্থাৎ জ্ঞানী হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

কবি ওমর খৈয়ামকে কেউ বলেন মিষ্টিক, কেউ বলেন অদ্বৈতবাদী, চরমপন্থী, যুক্তিবাদী, ভোগবাদী ইত্যাদি। কিন্তু তিনি চরম রসিকজন ছিলেন। তাঁহার রসপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গাধা বিষয়ক তাঁহার রুবাই'তে। এই রুবাই রচনার পশ্চাতে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

কথিত আছে যে, একদা হাকিম ওমর খৈয়াম নিশাপুর মহাবিদ্যালয়ে কতিপয় ছাত্রের সহিত পায়চারী করিতেছিলেন? এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে গাধারা গাদা গাদা ইট বহিয়া আনিতেছিল। গাধারা ইট লইয়া মহাবিদ্যালয়ের সদর দরওয়াজা দিয়া কলেজের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। এমন সময় একটি গাধা সদর

www.pathagar.com

দরওয়াজার সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সে মহাবিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে যেন সংকোচ বোধ করিতেছিল। এমন সময় ওমর খৈয়াম একটি রুবাই রচনা করেন।

হারিয়ে যাওয়া ফিরিয়ে পাওয়া ভ্রান্ত পথিক সে।
নামটি তোমার কেউ জানে না নাইকো স্মৃতি কোনো–
তোমার নখ রূপ নিয়েছে গাধার ক্ষুরে আজ
তোমার দাঁড়ী পিছন দিকে লেজ হয়েছে জেনো।

এই রুবাইটি শ্রবণ করিয়া ওই গাধাটি চুপিসারে কলেজে ঢুকিয়া পড়িল। কারণ সে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল।

ওমর খৈয়ামের সহিত পায়চারীরত ছাত্ররা অবাক হইয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

ওমর খৈয়াম কহিলেন, এই গাধাটির বর্তমান আত্মা পূর্বে এই কলেজের জনৈক অধ্যাপকের আত্মা ছিল। অধ্যাপকআত্মার অধিকারী গাধাটি তাই কলেজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিল। এখন সে দেখিল যে তাহার স্বরূপ তাহার গর্দভ আত্মীয়দের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে–তখন সে চুপিসারে কলেজে প্রবেশ করিয়াছে।

যুগে যুগে শিক্ষক মহোদয়গণ ছাত্রদিগকে গাধা সম্বোধন করিয়াছেন। বর্তমানে 'গর্দভ' সম্বোধন যেমন নাই, গাধার সংখ্যাও (তৃণভোজী) কমিয়া গিয়াছে। শিক্ষক সম্প্রদায়কে 'গাধা' আত্মায় প্রবেশ করাইবার দুঃসাহস করিয়াছেন একমাত্র ওমর খৈয়াম।

অতীতের অনেক উপদেশ 'গাধা'কে লইয়া রচিত হইয়াছে– 'বোকা'রা হইল গাধা চরিত্রের প্রকাশ। কোন শিক্ষককে কি গাধা বলা যাইবে? নিশ্চয় নহে। ছাত্ররা গাধা, না শিক্ষক গাধা কোন শ্রেণীকে গাধা বলিব। ইহার উত্তর হইবে কোন শ্রেণীকেই নহে। গাদা গাদা ছাত্রদের 'গাধা' বানাইয়া ফেলিলে ছাত্রদের গাধা বলা যাইবে না। অপর দিকে ছাত্রদের এহেন শিক্ষকদের গাধার শিক্ষক বলা যাইতে পারে।

ওমর খৈয়াম 'গাধার' উপর রুবাই রচনা করিয়াছেন তাই বলিয়া তাঁহাকে কি 'গাধার' কবি বলা যাইবে? শুধু 'গাধার' উপর রুবাই লিখিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই।

www.pathagar.com

আমলহীন জ্ঞানীবৃন্দকে গাধার পিঠে বোঝাইকৃত পুস্তকের সমান বলিয়া উদাহরণ টানিয়াছেন।

আমাদের সন্তানগণ যেন গাধার পিঠে পুস্তক বহন করিয়া কোন উদাহরণ যাহাতে সৃষ্টি করিতে না পারে উহার জন্য আমরা গবেষণা করিতেছি। লাঙ্গলের ঈষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংযোগ না করিয়া কলমের শীষে আধুনিক প্রযুক্তি সংযোগ করিয়াছি।

পরীক্ষার দুর্নীতি রোধকল্পে আংশিক কম্পিউটার চালু করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে অনেক গাধা দাদা হইয়াছেন এবং অনেক দাদা গাধা হইয়া ক্রন্দন করিয়াছে। এই ব্যবস্থা চালু করিতে পরীক্ষার খাতার মলাট 'বিলাত হইতে' মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে। ক্যাডেট কলেজের মেধা তালিকায় অবস্থানকারী ছাত্র 'ফেল' করিয়াছে।

পাত্রের আকার লইয়া গবেষণা করিতেছি। কিন্তু পাত্রের অভ্যন্তরে কি রাখিব চিন্তা করিয়াছি কি? পরীক্ষার হলে নকলবাজী রোধ না করিয়া পাত্রের 'চকচকীতে' বাঙ্গালীর মেধা গাধার আত্মায় পরিণত হইতেছে।

ফল ছাড়া অন্যান্য খাদ্য, যেমন চাউল, ডাইল ইত্যাদি রন্ধনে রূপান্তর করিয়া মনুষ্য সান্তানগণ ভক্ষণ করে। অপরদিকে গাধা এই সমস্ত রূপান্তর ছাড়াই ভক্ষণ করে।

রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিলে যে গুণ রন্ধন না করিয়া ভক্ষণ করিলেও উহার গুণ কমিবে না। কিন্তু মানুষের পাকস্থলীর ক্ষমতা কম বলিয়া খাদ্য রূপান্তর করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়।

মানুষ রূপান্তর করিয়া শুধু ভক্ষণ করে না, চিন্তা-চেতনা, খাদ্য-বাদ্য পরিধেয় বস্ত্র রূপান্তর, পরিবর্তন করিয়া ব্যবহার করে, তাই বলা যাইতে পারে অন্নভোজী মানুষ তৃণভোজী গাধার উপর উপবেশন করে।

এই মনুষ্যগণের মধ্যে মেধাবানগণ উপাস্য এবং গাধাগণ উপহাসের পাত্র। মেধাবানদের জীবন হয় ইতিহাস আর গাধাদের ইতিহাস হয় নির্মম পরিহাস। মেধা সম্মান ও গৌরবের আর গাধা করুণার।

বাংলাদেশে তৃণভোজী গাধার সংখ্যা কোনদিন বেশী ছিল না। এই দেশে ছিল মেধাবান মানুষের বাস। বাংলাদেশের মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এর বড় পরিচয়।

www.pathagar.com

বাঙ্গালীর এই মেধা কি টিকিয়া আছে না টিকিয়া থাকিবে? সাধারণ মানুষের সন্তানদের নিকট হইতে মেধা চলিয়া যাইবে। ধনী লোকদের গাধাদের মুখে সোনার চামচ/রূপার চামচে 'মেধার' বড়ি 'গিলাইবার জন্য' বিদেশ পাঠানো হইবে। কিন্তু 'গাধা' পিটাইয়া কখনো ঘোড়া বানানো যাইবে না।

'মেধা' বাজারে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য কোন পদার্থ নহে। ইহার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। জেলে/ভবঘুরে ইত্যাদি ঐতিহ্যের মানুষগণও মেধাবান জাতিতে পরিণত হইয়াছে। অপরদিকে সাহিত্য সংস্কৃতির হাজার বছরের ঐতিহ্যশালীরা ক্রমান্বয়ে 'গাধার' শ্রেণীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। গাধার মত নির্বোধের পরিচয় দিয়া সম্প্রতি কতিপয় রাষ্ট্র/জাতি বিলুপ্ত হইবার পথে রহিয়াছে। কাহারো নাম প্রকাশ করিলাম না। কারণ, ইহাতে অনেকের কষ্ট হইতে পারে।

বোকা ও মাতাল রাগিয়া অবশেষে ধোঁকা খাইয়া সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। মেধাবীগণ কৌশলে সমস্ত কাজ আদায় করিয়া লন।

'বলে যাহা করা যায় না কৌশলে তাহা করা যায়' রাম সুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষার এই সুবচন গাধার জন্য নহে, মেধার জন্য।

যাহারা জাতিগতভাবে যুক্তি ও বিজ্ঞানকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে তাহারা মেধাবান আর যাহারা যুক্তি ও বিজ্ঞানকে জীবনের কণ্ঠলগ্ন সহচর করিতে পারে নাই তাহারাই প্রকৃত 'গাধার' আত্মা লইয়া বিচরণ করিতেছে। ওমর খৈয়ামের গাধার মত তাহারা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষায় ভয় পাইবে।

সম্প্রতি দেখা গিয়াছে, আমাদের দেশে ডিগ্রী ও অনার্স পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। জানা গিয়াছে যে আসন্ন ডিগ্রী পরীক্ষায় বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গত বছরের চাইতে কম। তদুপরি বর্তমানে বিভিন্ন কলেজে ডিগ্রী পর্যায়ে বিজ্ঞানের সিলেবাসে ভূগোল মনোবিজ্ঞান রহিয়াছে। বিজ্ঞান শিক্ষা বাঙ্গালী ছাত্রদের জন্য এমন কঠিন হইল কেন? ইহা কি কঠিন না চরম হতাশা? একদিকে বিজ্ঞান শিক্ষার এই হতাশা আমাদের মেধাকে 'গাধার' আত্মায় রূপান্তর করিবে। আমরা মেধার চর্চা করিব, না গাধার চর্চা করিব?

❐ ১৮ই নভেম্বর, '৯৪

www.pathagar.com

অমরত্বের দাওয়াই

একদা আমাদের দেশের মানুষ ছিল অত্যন্ত বিনয়ী। এই বিনয়কে ব্যঙ্গ করিয়া একটি কাহিনী প্রচলিত ছিল।

এক লোক অপর লোককে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ইছমে শরীফ?

লোকটি হাত জোড় করিয়া বিনয়ের বিশেষণ যোগ করিয়া কহিল, ম্যারা নাম খাক ছে খাক (মাটি হইতে মাটি) দরখাক, তেরিয়াখাক ম্যারা নাম মোহাম্মদ ইছহাক।

অতঃপর কহিলেন, আপনার ইছমে শরীফ?

অপর লোকটি বিনয়ের বিশেষণ খুঁজিতে বিব্রত হইয়া পড়িল। তিনি আরো বিনয় হইবার জন্য মাটি হইতে 'গু' য়ে নামিয়া আসিলেন। তিনিও হাত জোড় পূর্বক কহিলেন, গু ছে গু, দরগু,কালোকুত্তাকি গু ম্যারা নাম মোহাম্মদ বগ্‌গু।

হায়রে বিনয়! একজন মাটি হইতে মাটি হইলেন, অপর জন বিনয়ী হইতে যাইয়াও গু হইতে 'গু' য়ে পযন্ত গড়াইলেন।

বিনয়ের ভাষা এমন হইবে, তেমন কোন বিধান নাই। এমনকি এমনতর বিনয়ের ভাষা প্রয়োগে কেহ রাজী হইবেন না। রাজী হইতেও অনুরোধ করিব না। এখন হইল জিদের ভাষা, তেজী ভাষা, তর্জন গর্জনের ভাষা।

অতীতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের পরিচয় দিতেন খাদেম বলিয়া। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী প্রচারপত্রের শেষে লিখিতেন, 'খাদেমে কওম'।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ঐতিহাসিক ছ'দফা প্রচার করিলেন তখন সেই প্রচার পত্রের শেষে মুদ্রিত ছিল– 'খাদেম শেখ মুজিবুর রহমান।'

www.pathagar.com

বিনয়ের ভাষা দুশ্চরিত্র এই সময়ে আহম্মকের প্রলাপে পরিণত হইয়াছে। প্রবঞ্চিত, প্রতারিত, অসময়ে আগত মানুষদের মধ্যে বিনয় খুঁজিয়া পাওয়া গেলেও নব্য সম্রাটদের ভাষায় বিনয় বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই।

নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা যখন দরবারে হাজির হইতেন তখন তাঁহার নকীব ডাক দিয়া কহিত, 'নবাব মনসুরুল মুলক সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলি খাঁ মির্জা মোহাম্মদ হযরত জঙ্গ বাহাদুর বা-আদাব আগাহ বাশেদ'।

বড় বড় বানরের যেমন বড় বড় পেট, বড় বড় মানুষেরও তেমন বড় বড় 'ডাক' থাকিবে। বড় মানুষ কেন, বড় সমুদ্রেরও ডাক আছে।

নতুন যুগের 'নবাব'ও হইতেছেন বড় লোক, 'আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়' ইহা অতীত হইয়া গিয়াছে। আপনাকে বড় বলাইয়া ছাড়িতে হইবে। আপনি 'বড়' কত প্রকার এবং কত রং ও ঢঙের ইহাও বুঝাইয়া দিতে হইবে।

নব্য নবাববৃন্দ 'দানবীর' 'শিক্ষানুরাগী' মানবদরদী' 'সমাজ হিতৈষী' ইত্যাদি বিশেষণ ক্রয় করিবার জন্য হন্য হইয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি 'দানবীর' ও 'শিক্ষানুরাগী' শিক্ষাদরদীদের বান ডাকিয়াছে।

উন্মাদ বিশ্ববিদ্যালয় যেমন রাতারাতি লোকজনকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে বগল বাজাইতেছে, উন্মাদ বাজার (উন্মুক্ত বাজারের নিন্দুকের ভাষা) যেমনি অর্থনীতির জোয়ার আনিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে চাউল ও আটার মূল্যে সাম্য বিধান করিয়াছে, তেমনি নব্য 'শিক্ষাদরদী'র দরদের ঠ্যালায় শিক্ষা লাভ এখন অতি সহজ হইয়া পড়িবে।

এখন বাংলাদেশে কোটিপতির অভাব নাই। ইহাদিগকে কোটিপতি না কহিয়া অর্থসাগর বলিয়া ভূষিত করা যাইতে পারে। বিদ্যা থাকিলে যদি বিদ্যাসাগর হওয়া যায় তবে অর্থ থাকিলে তাহারা অবশ্যই অর্থসাগর হইবে না কেন?

সাগর হইতে এক কোষ পানি ছুঁড়িয়া মারিলে যেমন সাগরের খবর হয় না, হাতির পিঠে মাছি বসিলে যেমন হাতি মাছির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, তেমনি অর্থ সাগরবৃন্দের অর্থসাগর হইতে দশ/পনের লক্ষ টাকা ছুঁড়িয়া মারা এমন কোন ব্যাপার স্যাপার নহে। নব্য ধনীরা বুঝিয়াছেন টাকা দিয়া 'দানবীর' 'শিক্ষাদরদী' হইবে। সম্প্রতি মাত্র পনের লক্ষ টাকার বিনিময়ে দানবীর ও শিক্ষাদরদী হইবার মহাসুযোগ আসিয়াছে। অনেকে ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না।

হে সুহৃদ পাঠক, আপনারা কহিবেন, এই অমরত্বের ঔষধের নাম কি?

www.pathagar.com

২৫ লক্ষ টাকা ছাড়ুন, আপনার নামে একটি কলেজ গড়িয়া উঠিবে।

অতীতে লোকে নিজ গ্রাম/থানাকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য অর্থ দিয়া কলেজ করিতেন। মহৎ মানুষদের আদর্শকে প্রসূত করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের নাম প্রদান করিতেন।

কানুনগোপাড়া ছিল একটি অজপাড়া গাঁ। সে পাড়াগাঁয়ের 'দত্ত পরিবার' নিজ গ্রামকে বড় করিয়া তুলিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজ। তাহারা নিজ পরিবারের নাম না দিয়া নিজেদের গ্রাম এবং স্যার আশুতোষের মত মনীষীর নাম দিয়াছিলেন।

তেমনিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল নাজিরহাট, সাতকানিয়া, রাউজান, হাটহাজারী কলেজ। আনোয়ারায় আখতারুজ্জামান বাবু এবং আতাউর রহমান খান কায়সার ইচ্ছা করিলে নিজেদের নামে কলেজ করিতে পারিতেন। তাহারা নিজেদের নামে কলেজ না করিয়া নিজেদের জন্মস্থান আনোয়ারার নামে আনোয়ারা কলেজ করিয়াছেন। এই রকম উদাহরণ দিতে চাহিলে আমি উদাহরণের বস্তা লইয়া হাজির হইতে পারিব।

যাহারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য আগাইয়া আসিতেছেন তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। আপনারা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা থাকুন, আপনাদের মহত্ব আপনারা প্রদান করুন। কিন্তু নিজের নামটি এত বড় করিয়া তোলা কেন? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার মধ্যে এহেন মহৎ শিক্ষার ভেদ রহস্য জানাইলে চির বাধিত হইব। '৯৫ সালে কলেজ স্থাপনের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। অতীতে ১৯৪৬-৪৭ সালে, পরে ১৯৭২-৭৩ সালে কলেজ স্থাপনের হিড়িক পড়িয়াছিল। কয়েকটি দেওয়াল, কতিপয় ছাত্র/শিক্ষক ইহাই কি কলেজ? 'কনসেপ্ট' বলিয়া কি কোন পদার্থ থাকিবে না? বিভিন্ন থানায় বড় বড় ঐতিহ্যবাহী কলেজ রহিয়াছে। সে কলেজের বহুমুখী উন্নয়ন কি নব্য শিক্ষা দরদীগণ করিতে পারিতেন না? কলেজের হাটবাজার বসাইলে কি শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটিবে?

ঐতিহ্যবাহী কলেজ হইতে গ্রামের ছাত্রদের টানিয়া আনা 'মেধা' ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির সহায়ক নয়। 'শিক্ষানুরাগী' তাহাদিগকে কহিব, যাহারা আগামীর সন্তানদিগকে মেধা ও দক্ষতার শক্তিতে শক্তিবান করিবেন। অন্যথায় গুড়ের লাভ পিঁপড়ায় গিলিয়া খাইবে।

www.pathagar.com

চর্চা নহে ঃ অনধিকার চর্চা চাহি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-বাংলা নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন করিতে যাইয়া প্রায় ১২/১৩টি উপদেশ ১২৯১ সালের মাঘ মাসে প্রচার করিয়াছিলেন। উপদেশ সমূহের শতবর্ষ গত হইয়াছে। নীতিবাগীশবৃন্দ এই উপদেশমালার মধ্যে অনেক গভীর তত্ত্ব এমনকি লেখার ব্যাপারে মোটা আদর্শ খুঁজিয়া পাইবেন।

গত দুই এক দশক ধরিয়া আমরা আমাদের অনেক কিছু হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং ফেলিতেছি । বঙ্কিমচন্দ্রও যে হারাইয়া যাইবেন ইহাতে বৈচিত্র্যের কিছু নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত ইহা বুঝিয়াছিল। তাই কমলাকান্ত বিদায় নিবার পূর্বে কহিয়াছিল, 'বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে বনিল না, আপনার সঙ্গে আমার বনিল না।

কমলাকান্তের বিদায় পত্রে আরো অনেক কথা ছিল, কিন্তু শেষ হইল এইভাবে, 'তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম। কাঁদিয়া মরিব, এখন কাঁদিব, লিখিব না।'

অনুগত, স্বগত, বিগত,

শ্রী কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের বেদনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কমলাকান্ত আর লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের উদ্দেশ্য যে ১২/১৩টি উপদেশ দিয়াছিলেন, আমরা সেই উপদেশমালা লইয়া

www.pathagar.com

বাঁচিতে পারিব না তাই তাঁহার প্রচণ্ড উপদেশাবলি কেন কি কারণে আজ ছাড়িতে বসিয়াছি উহার যুক্তি প্রদান করিতেছি। তাঁহার সব উপদেশ প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। অত্যন্ত জরুরী উপদেশসমূহ প্রকাশ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রথম উপদেশ হইল, যশের জন্য লিখিবেন না, তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

বর্তমানে যশ ও অপরকে বশ করিবার জন্য লিখিতে হইবে। অন্যজন না পড়িতে চাহিলেও লিখিতে ও ছাপাইতে হইবে। নিজের যশের ঢোল নিজেকে বাজাইতে হইবে।

তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাব, টাকার জন্য লিখিবেন না। ইহা একেবারে ফেলিয়া দেওয়া যাইবে না। যাহারা বনেদি লেখক তাহারা টাকা ছাড়া লিখিবেন না, আর যাহারা নতুন 'এলিট' হইবার জন্য অস্থির হইয়াছেন তাহারা টাকা দিয়া লেখা ছাপাইবেন। সুন্দর ছাপার জন্য সর্বাধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থা এই কাজে ব্যবহার করিতে হইবে।

তাঁহার তৃতীয় প্রস্তাব হইল, যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের ও মানুষ জাতির মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন তবে অবশ্যই লিখিবেন।

মনুষ্য জাতি বা দেশের মঙ্গল হউক বা না হউক নিজের মঙ্গলই এখন একমাত্র কাম্য। তাই লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে না পারিলেও ঝগড়া সৃষ্টি যে সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম উৎস ইহা সাহিত্যে নতুন তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে ঝগড়া সাহিত্য বলিয়া আলাদা একটি সাহিত্যধারা চালু হইতেছে।

অসত্য, পরনিন্দা, পরপীড়ন, স্বার্থ সাধন যাহার প্রবন্ধে রহিয়াছে সে সকল প্রবন্ধ তাহার মতে হিতকর নহে। এই সমস্ত একেবারে পরিহার্য বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। বর্তমানে সে দাবী কোন প্রকারে মানা সম্ভব হইবে না। অসত্যে ভরপুর থাকিতে হইবে, পরনিন্দা, পরপীড়ন না করিলে প্রবন্ধের জাত নষ্ট হইয়া পড়িবে। কারণ আমরা বাঙ্গালী আবহমান কালের আদর্শ শ্রদ্ধাবোধ, শ্রেয়বোধ, মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌন্দর্যবোধকে বিসর্জন দিয়াছি। নতুন আভিজাত্যের দৌড়ে আমাদের অনেক আদর্শ পিঁপড়ার মত পিষিয়া মরিয়া যাইতেছে। কিন্তু যাহারা দৌড়াইতেছে তাহাদের পরিণতি কি হইবে বর্তমানে কিছু বলা সঠিক হইবে না।

www.pathagar.com

ডনকুইকজট যখন বাতাসের প্রতি ঘুষি মারিতেছিল তখন যদি কেহ কহিত, ওহে ডনকুইকজট, তুমি ভুল করিতেছ। তখন ডনকুইকজট কি উহা শ্রবণ করিত? নতুন চাঁদিতে যাহারা দিকবিদিক হারাইয়া ফেলিয়াছেন, রঙ্গীন চশমা ছাড়াও যাহারা পৃথিবীকে রঙ্গীন দেখিতেছেন, তাহাদিগকে ভুল দেখাইয়া দেওয়া হইবে চরম ভুল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ষষ্ঠ উপদেশে বলা হইয়াছে, যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ অকর্তব্য, ইহার বিন্দু বিসর্গও মানিতে রাজী নহি।

যাহার যে বিষয়ে অধিকার নাই সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাই বর্তমানে অনেকের কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে তাহারা উচিত মনে করিতেছে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যত বেশী বৈপরিত্য কাজ সমাধা করিয়া থাকে তাহার মূল্য সমাজে শনৈ শনৈ বৃদ্ধি পাইতেছে।

মেধাবান ব্যক্তিরা আদাবনে লুকাইতেছে, অপর দিকে গাধা মার্কা লোকজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগাইয়া যাইতেছে। বিভিন্ন অনধিকারচর্চা একটি জাতীয় অধিকার হিসাবে যেন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চর্চা নাই, অনধিকার চর্চা আছে।

খেলাধুলা ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। বিভিন্ন কিছুর ব্যাপারে আইন রহিয়াছে। অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি থাকিলেও অনধিকার চর্চার বিরুদ্ধে কোন আইন আছে কিনা জানা নাই। থাকিলেও উহা প্রয়োগ করা সংগত হইবে না। কারণ আমরা সকলে এ অনধিকার চর্চা করিতে দারুণ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

কোচিং সেন্টার ও কিন্ডার গার্টেনসমূহ অনধিকার চর্চার মরকজ (কেন্দ্র) বলিলে রাগ করিবার বিশেষ কিছু নাই। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ, কিন্তু শিশুপাঠ ও শিশুদের ঠকাইবার জন্য বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি তৈয়ারী নিষিদ্ধ নহে। ইহাও লেখকের একেবারে অনধিকার চর্চা।

অনধিকার চর্চা একটি দীর্ঘ আলাপসাপেক্ষ আলোচনা। পরবর্তীতে ইহা লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বঙ্কিমচন্দ্র কাহারও অনুকরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু নকল করিতে নিষেধ করেন নাই। বহু লেখক পরের লেখা এমন কি থিসিস পর্যন্ত চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াও বহাল তবিয়তে বিরাজ করিয়াছেন এবং করিতেছেন বলিয়া নিন্দুকেরা বলিয়াছেন। তাই গুরুজনদের হিতোপদেশ আর গায়ে লাগাইতে ইচ্ছা পোষণ করিতেছি না।

কমলাকান্ত যেমন বিদায় চাহিয়াছিল, অনিদ্রা ও নিন্দা রোগে আক্রান্ত অধম ও অসময়ে আগত লেখকও ক্ষমা চাহিতেছি।

www.pathagar.com

গরিবের তকমা

শ্রী, শ্রীযুক্ত, বাবু, মিস্টার, জনাব ইত্যাদি আমাদের নামের সহিত দীর্ঘদিন জড়াইয়া রহিয়াছে এবং ঝগড়া ফ্যাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের সমাজ বিবর্তনের নামের আদ্য সন্মানসূচক শব্দসমূহ গবেষণার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শব্দসমূহ হইতেছে শ্রী, শ্রীযুক্ত, বাবু, মহাশয়, মওলানা, মৌলভী, হজরত, পণ্ডিত, জনাব, মিস্টার, মাস্টার ইত্যাদি। অপরদিকে অর্জিত পদের মধ্যে রহিয়াছে ডক্টর, ডাক্তার, ব্রিগেডিয়ার, মেজর, মেজর জেনারেল, কর্নেল, লেঃ কর্নেল, প্রফেসর, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, প্রিন্সিপ্যাল, নওয়াব, স্যার, খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর, নাইট, হাবিলদার, চৌকিদার ইত্যাদি। এর সহিত যোগ করা হইয়া থাকে মাননীয়, মান্যবর, মহাত্মন ইত্যাদি।

হজ্ব করিবার পর হাজীও পদবী হিসাবে যুক্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন একটি দলিলে দেখা যায় যে মথুরেশ মহম্মদ খানের কথা উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি শ্রী/শ্রীযুক্ত না লিখিয়া শ্রীমৎ খান লিখিয়াছেন।

শ্রীমৎ খান মহম্মদ স্তদনুজো / মধ্যাহ্ন চন্ডদ্ধতি / বৈরিপ্রৌঢ়ি, ঘনান্ধকারশমনো / গাম্ভীর্য ধৈর্য্যোন্নতিঃ ইত্যাদি।

অর্থাৎ তার অনুজ শ্রী মহম্মদ খান হইতেছেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতন প্রচণ্ড এবং শত্রুবর্গরূপ ঘনান্ধকারে শমনস্বরূপ। গাম্ভীর্যে ও ধৈর্য্যে তিনি উন্নত।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষের দিকে খুব বেশী শ্রী যুক্ত করিয়া স্বাক্ষর করেন নাই।

শরৎচন্দ্র নামের পূর্বে শ্রী লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বইয়ের বাজার যখন রমরমা অবস্থা তখন আর এক শ্রী শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। তখন তিনি নিজের সাহিত্যে শ্রী বজায় রাখিবার জন্য নিজের শ্রী বাদ দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বইতেও শ্রী নাই। বৃটিশ আমলে সমাজসেবামূলক কাজের জন্য রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর,

www.pathagar.com

নওয়াব, স্যার, নাইট ইত্যাদি খেতাব দেওয়া হইত। লাকসামের ফয়জুন্নেছা নামে জমিদার পত্নীকে নওয়াব উপাধি দেওয়া হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকে এই পদবী সমূহ বৃটিশের চামচাগিরির নগদ ফসল।

পাকিস্তান আমলে সিতারায়ে ইমতিয়াজ, সিতারায়ে খেদমত, তমঘায়ে ইমতিয়াজ, তমঘায়ে খিদমত উপাধি দেওয়া হইত। তবে ইহা নামের পরে লেখা হইত।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় অনেক দেশপ্রেমিক ব্যক্তি বৃটিশদের দেওয়া খেতাব বর্জন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বৃটিশদের দেওয়া নাইট খেতাব বিসর্জন দিয়াছিলেন। উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশের অনেক দেশপ্রেমিক নেতা পাকিস্তানীদের দেওয়া 'তকমা' বর্জন করিয়াছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে বীর শ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম, বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। ইহা হইল সরকারী খেতাব। জনগণও অনেক সময় নেতা নেত্রীদের নানা পদবীতে ভূষিত করেন। যেমন শেরে বাংলা, বঙ্গবন্ধু, মজলুম জননেতা, দেশনেত্রী, জননেত্রী, শহীদ জননী, অগ্নিকন্যা ইত্যাদি। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের ক্ষেত্রে পদবী দেওয়া হইয়া থাকে যেমনঃ পল্লীকবি, বিদ্রোহী কবি ও বিশ্বকবি, শিল্পাচার্য ইত্যাদি।

আজকাল বাংলাদেশ সরকার অন্য কিছুতে কার্পণ্য প্রদর্শন না করিলেও 'পদবী' দানে দারুণ কার্পণ্য করিতেছেন।

অর্জিত পদবীসমূহ পেশার সহিত জড়িত। এই পদবীসমূহ বিসর্জন দেওয়া হয় নাই। বরং পেশা হইতে অবসর গ্রহণের পর বেসামরিক পদবীসমূহ পদে অবস্থান না করিয়া বহাল তবিয়তে রাজকীয় মেজাজে অবস্থান করিয়া থাকে। যেমন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসর ইত্যাদি। অবশ্যই ইহা বংশপরম্পরা নহে। 'কাজী' অর্জিত পদবী হইলেও কাজী না হইয়া বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ বলিয়াছিলেন, কাজীপুত্র ও বংশধরগণ যদি কাজী লিখিতে পারে তবে আমার বংশধরগণের প্রিন্সিপাল লিখিতে দোষ কোথায়? অবশ্য তাহার বংশে অন্য কেহ প্রিন্সিপ্যাল পদবী ব্যবহার করেন নাই। সামরিক পদবী সমূহ ব্র্যাকেটে (অবঃ) লিখিয়া ধরিয়া রাখা হয় যেমন মেজর (অবঃ), কর্নেল (অবঃ) ইত্যাদি। বেসামরিক পদবীসমূহ লিখিলে দোষ না থাকিলেও উহা লিখিতে দেখা যায় না। কিন্তু তাহাদিগকে চাকুরীর পরে সম্বোধন করা হইয়া থাকে 'দারোগা' সাহেব, ইন্সপেক্টর সাহেব বলিয়া। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ নামের পূর্বে চেয়ারম্যান না লিখিলেও তাহারা সম্বোধিত হয় 'চেয়ারম্যান' সাহেব রূপে। অর্জিত পদের পদ সামরিক বেসামরিক যাহাই হউক না কেন ইহার পক্ষে বিপক্ষে কোন তর্ক নাই। ইহাতে হিন্দু-মুসলমান গন্ধও কেহ আবিষ্কার করেন না।

www.pathagar.com

কিন্তু শ্রী, শ্রীযুক্ত, মিস্টার, জনাব ইত্যাদি লইয়া বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে জনাব, হজরত, মওলানা, মৌলভী লিখিলে আপত্তি নাই। হজরত শব্দের অর্থ হইল মাননীয়। ইহা যদি কোন হিন্দুর নামের পূর্বে লিখা হয় তবে আর রেহাই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

একজন হিন্দুর নামের পূর্বে মৌলভী লেখা হইয়াছিল। তিনি হইলেন কোরান শরীফের বাংলা অনুবাদক ভাই গিরিশ চন্দ্র।

বৃটিশদের আগমনের পর এই দেশে শ্রী, শ্রীযুক্ত, জনাব, মৌলভী হঠাইয়া মিস্টার সংক্ষেপে মিঃ লেখা শুরু হইল। ইহাতে হিন্দু মুসলমানের কোন আপত্তি উত্থাপিত হইল না, তাহাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে বিশেষ কোন আঁচ পড়িল না। মিস্টার যোগ হইবার পর শরীর ও মন তরতাজা বিলাতি বিলাতি বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। বৃটিশ আগমনের পর শ্রী, শ্রীযুক্ত লেখা লইয়া বাংলাদেশে অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। বৃটিশদের আগমনের পরে এবং পাকিস্তান আমলের পূর্বে মুসলমানদের নামের পূর্বে শ্রী, শ্রীযুক্ত লেখা হইত। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের সময় শ্রী এর মধ্যে বিশ্রী গন্ধ খুঁজিয়া শ্রী, শ্রীযুক্ত মুসলমানদের বাড়ী ছাড়া হইল।

হিন্দুদের মধ্যে অনেকে শ্রী যেমন বিসর্জন দিয়াছেন অপর দিকে ডবল শ্রী লেখার নামও বিরল নহে। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় শ্রী শ্রী কুমার লিখিতেন।

পাকিস্তান হইবার পর 'জনাব' লেখা শুরু হইয়াছে। ইহার সহিত আর একটি অশ্লীল শব্দ 'জনাবা' চোরাপথে মহিলাদের পূর্বে কে বা কাহারা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। 'জনাবা' শব্দটির অর্থ অশ্লীল বলিয়া তরজমা প্রকাশ হইতে বিরত রহিলাম।

আজকাল আমন্ত্রণলিপিতে জনাব, বাবু, মহাশয়ের পরিবর্তে সৌম্য, সুধী, সুজনেষু ইত্যাদি লিখা হইতেছে।

রেডিও, টেলিভিশন, প্যান্ট-শার্ট, কোরমা, পোলাও, বিরিয়ানী ইত্যাদি শব্দে হিন্দু মুসলমান নাই। এমন কি চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, ছিনতাই, লুটপাট, ভণ্ডামী, বাঁদরামী, লোক ঠকানো, ভেজাল মিশানো, মিথ্যা বলা, ঘুষ নেওয়া ইত্যাদিতে হিন্দু মুসলমানের কোন ফারাক নাই।

কিন্তু শ্রী, শ্রীযুক্ত, জনাব লিখিতেই হিন্দু মুসলমানী গন্ধ ভস ভসাইয়া উতরাইয়া উঠে। শ্রী, শ্রীযুক্ত, মিস্টার, বাবু, জনাব ইত্যাদি লইয়া মাথাব্যথা হইল প্রবীণ শহুরে ভদ্রলোকদের। তাহারা এই বিভেদকে উসকাইয়া দিয়াছিল। গ্রামের সামন্ত, আধা

www.pathagar.com

সামন্তগণ পদবী লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন। বৃহত্তর সমাজের চাষা-ভূষা, শ্রমজীবী তথা সর্বহারা মানুষেরা মোগল আমল, বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল, এমনকি বাংলাদেশ আমলে মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা শত শতাব্দী ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আসিতেছে। দুঃখের যন্ত্রণায়, চোখের জলে কপোল ভিজাইতেছে, আর অপর দিকে মেহনতি মানুষের শ্রমকে যাহারা বিনা বাধায় নিত্য ভোগ করিতেছে তাহারাই শ্রী হইবেন না জনাব হইবেন ইহা লইয়া মাতিয়া রহিয়াছেন।

কৃষক রামাকৈবর্ত শ্রী বা শ্রীযুক্ত লিখিবার এবং জেলে রহিম শেখ জনাব লিখিবার কোন প্রত্যাশা কোন দিন করে নাই এবং আগামী দিনেও করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কৃষক রামা বা জেলে রহিম শ্রী বা জনাব লিখিবার প্রত্যাশা না করিলেও ভোট ব্যবস্থা চালু হইবার পর গণতন্ত্রের কল্যাণে নিরক্ষর নিরন্ন রামার নামের পূর্বে বাবু/শ্রী এবং রহিমের নামের পূর্বে নির্বাচন প্রার্থীর ভোটার কার্ডে জনাব লেখা হইয়াছে। তাহাদের প্রতি আদাব ও সালাম জানানো হইয়া থাকে। ইহা নিরক্ষর জনগণের প্রতি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নহে বলিলে কি ভুল বলা হইবে? দ্রব্যমূল্য যেমন কোনক্রমেই কমে না পদবীও তেমনি কমিতে রাজী নহে।

ইংরেজরা কুকুরের নাম জন, ডন, পল ইত্যাদিও রাখেন। এই নাম মনুষ্য সন্তানেরও হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালীরা ভুলক্রমেও কোন কুকুরের নামে মনুষ্য নামবাচক শব্দ যোগ করে নাই। ইহা বাঙালীর আত্মসচেতনতার বড় পরিচয়।

শেক্সপিয়র বলিয়াছেন, নামে কি আসে যায়। গোলাপকে যে নামে ডাকা হউক না কেন গোলাপ গোলাপই। আমরা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা হিন্দু হই আর মুসলমান হই গরিব হই, আর ধনী হই, সন্তানের নামকরণে আমরা সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি।

বৌদ্ধ সন্তানগণ সন্যাস গ্রহণের সময় পৈত্রিক নাম বিসর্জন দিয়া নতুন নাম গ্রহণ করেন। লেখকরা অনেকে কলমী নাম নিয়া থাকেন। উর্দু কবিরা নতুন নাম গ্রহণ করেন অথবা জন্মস্থানের নামের সাথে জুড়িয়া দেন যেমন জোশ মলিহাবাদী। আমাদের দেশেও আছে–যেমন মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, যশোরী, জালালাবাদী ইত্যাদি। ইদানিং যাহারা টাকা পয়সা কামাই করিয়াছেন তাঁহারা নামের সাথে নতুন লেজ জুড়িতে কার্পণ্য করিতেছেন না।

আগেকার দিনে চট্টগ্রামের অনেকে নামের সাথে মিয়া লিখিয়া গর্ববোধ করিতেন। মিয়ার বেটারা এখন মিয়া বা 'মিঞা' লেখাকে সেকেলে বলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। মিঞা নামে নতুন মিয়ারা ধন্য হইতে রাজী নহেন, সহজে চৌধুরী

www.pathagar.com

লিখিয়া অহংকার বোধ করিতেছেন, চৌধুরী এখন জাতীয় খেতাবে পরিণত হইয়াছে। একটি ট্যাক্স ধার্য করিয়া চৌধুরী খেতাব বিক্রি করিলে সরকারের ভাল রাজস্ব আদায় হইবে। স্বনামধন্য কলামিস্ট ও বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম ছাত্রনেতার নাম ফেরদৌস আহমদ কোরাইশী। এই কোরাইশী পদবী কোরাইশ বংশ হইতে নহে। আলাপ প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম যে তাহার পিতা স্বীয় বংশের পূর্ব পুরুষদের নামের সাথে মিল রাখিয়া তাহার সন্তানদের নামকরণ করিয়াছেন। জনাব ফেরদৌস আহমদ কোরাইশীর ভাইদের একজনের নামের শেষে তাই যোগ হইয়াছে আজগরী, অপর দুইজনের নামের সাথে রহিয়াছে যথাক্রমে হানাফী ও সিদ্দিকী।

নোয়াখালীর লোকজন চান্স পাইলে মজুমদার না হইলেও পাটোয়ারী লেখা শুরু করিয়া দেয়। কোন কোন মজুমদার ফ্যাশন করিয়া মাজমাদারও লিখিয়া থাকেন।

চৌকিদার, তরফদার ও দফাদার ইত্যাদি অর্জিত পদবী। বরিশালের লোকজনের সম্পর্কে রসিকতা করিয়া বলা হইয়া থাকে–

মোগো বাড়ী বরিশাল
মোর চাচা চৌকিদার
মোরে চেনো।

বাংলাদেশে এমনি বহু পদবী বিরাজ করিতেছে। এইগুলো ভদ্রলোকদের আত্ম পরিচয়ের ব্যাপার। মিঞা, ভুঁইয়া সহজে লেখা হয় না।

আমাদের দেশে ডবল পদবীর ব্যবহার নাই। কিন্তু পাকিস্তানে ইহার রেওয়াজ রহিয়াছে যেমন খান আবদুল কাইয়ুম খান। তাই পাকিস্তান আমলে এই দেশে ঠাট্টা করিয়া কহিত আগায় খান পাছায় খান খান আবদুল কাইয়ুম খান।

কেহ হিন্দু হইতে মুসলমান হইলে পূর্বে খাঁ যোগ হইত, এখন তাহারা খান লিখিয়া তৃপ্তি বোধ করেন এবং তাহারা বংশপরম্পরা খান লিখিয়া থাকেন। তাহারা পাঠানী খান নহেন, তাহারা বাঙালী সবজী খান।

পূর্বে বলিয়াছি এই দেশের বৃহত্তর মানুষেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আজন্ম ক্ষুধা নিবারণ করিতে সংগ্রাম করিতেছে। তাহাদের কোন পদবী বা লেজ নাই; তাহাদের পরিচয় হইল গরীব চাষা, তাঁতি, জেলে, মুটে, ফেরিওয়ালা, তেলি, মুচি, মাঝি, ডোম, হাঁড়ি, দিন মজুর, কামলা, রিকশাওয়ালা, বড়জোর ড্রাইভার, হেলপার ইত্যাদি।

অভাবের সংসারে ইহাদের জন্ম। অভাব ইহাদের নিত্য সহচর, ক্ষুধা ইহাদের জন্মের চির সাথী। তাহারা তাহাদের সন্তানদের কোন পদবী বা লেজ উপহার দিয়া যাইতে পারে না। যা দিয়া যায় উহার নাম 'দারিদ্র্য'।

www.pathagar.com

ফাঁকিবাজী ধোঁকাবাজী = বুদ্ধিজীবী

যাহারা মদ্যপান করে তাহারা মদখোর, যাহারা সুদ খায় তাহারা সুদখোর। এই খোর প্রত্যয় যোগ হইয়া হারামখোর, গাঁজাখোর, ঘুষখোর, আফিমখোর শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা নিরামিষ বা আমিষ ভোজন করে তাহাদিগকে নিরামিষখোর বা আমিষখোর না বলিয়া নিরামিষ ভোজী ও আমিষ ভোজী বলা হয়।

জীবিকা আহরণের ক্ষেত্রে শ্রমজীবী, মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী, যাহারা চাকুরি করেন অর্থাৎ নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে অপরের কাজ করেন তাহারা চাকরিজীবী, চাকুরীজীবী নহেন।

যাহারা সুদ দ্বারা জীবন নির্বাহ করে তাহাদিগকে কুসীদজীবী বলা হয়। তবে বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা কি হইবে? অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত সম্প্রতি বাংলা একাডেমী হইতে প্রকাশিত বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানমতে বুদ্ধিজীবী

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ হইতেছে সমাজ, সংস্কৃতি সচেতন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে দক্ষ সুশিক্ষিত মানুষ যাহারা বুদ্ধি বলে বা বুদ্ধির কাজ দিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

বুদ্ধিজীবীগণ যে শুধু বুদ্ধি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন উহা নহে, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া বুদ্ধির গোড়ায় ধুম্রজাল বিস্তার করিয়াও জীবিকা আহরণ করিয়া থাকেন।

বুদ্ধিজীবীগণ বুদ্ধি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ছাড়াও ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে দ্বিধাবোধ করেন না।

বুদ্ধিজীবীগণকে বুদ্ধির ঢেঁকির মত অপরের চাপে বিশেষ করিয়া ক্ষমতার চাপে উঠা-নামা করিয়া অবশেষে নির্বোধের পরিচয় প্রদান করিয়া কিয়ৎকাল চুপ থাকিতেও দেখা যায়।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নানান প্রকার ভেদ রহিয়াছে। বর্তমানে যেইসব বুদ্ধিজীবী ভালভাবে আখের গোছাইয়া শানশওকতের সহিত জীবন-যাপন করিতেছেন তাহারা হইলেন আসল এক নম্বর বুদ্ধিজীবী। আর যাহারা পারেন নাই তাহাদিগকে নির্বুদ্ধিজীবী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অথবা বুদ্ধুজীবীও বলা যায়।

আমাদের বুদ্ধিজীবীগণ দর্শনের আকর্ষণ হইতে দেশ ও জাতিকে বিমুক্ত রাখিয়া একটি চমৎকার দার্শনিক পটভূমিকা সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ কহিবেন, বর্তমান যুগ দর্শনের যুগ নহে, বর্তমান যুগ হইল ভক্ষণের যুগ।

দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা অবিরাম গতিতে চলিতেছে, এই চলার গতি একমাত্র মধ্যপ্রাচ্য হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত এলাকায় যেন স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে আসিয়া এই চিন্তা একেবারে নদীর ঘোলা পানিতে পরিণত হইয়াছে।

ঈশ্বর, বহির্জগত, আত্মা, মানুষ এই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াই দর্শন আলোচনা। এক এক সময়ের দর্শন চর্চা কোন একটি বিষয়ে প্রাধান্য পাইয়া থাকে। প্রাক সক্রেটিস যুগে প্রাধান্য পাইয়াছিল বিশ্বতত্ত্ব। প্লেটো, এরিস্টটলের যুগে মানুষ, মানুষের প্রজ্ঞা, আত্মার দর্শন হইয়াছিল প্রধান দার্শনিক বিবেচ্য বিষয়। মধ্যযুগে দর্শন চেতনার মূল ছিল ঈশ্বর ও আত্মা।

রেনেসাঁর আঘাতে স্থবির চিন্তা সম্বিত ফিরিয়া পায়–মানুষ মুক্ত চিন্তায় প্রয়াসী হয়। এরই সাথে সংযুক্ত হইয়াছে প্রকৃতি বিজ্ঞানের জ্ঞান। সৃষ্টি হইল মানবতা বোধ। এই বোধের প্রভাবে বস্তুর জগৎ মানুষ, জ্ঞানবিদ্যা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি আধুনিক দর্শনে স্থান পাইয়াছে।

www.pathagar.com

'কান্ট' হইলেন আধুনিক দর্শন চিন্তার অন্যতম পথিকৃৎ। এরই সহিত অন্যান্য নাম সমূহ হিউম, বার্কলে, উলফ, লাইবনিজ, দেকার্ড ইত্যাদির নাম জড়িত রহিয়াছে।

কথিত আছে যে, কান্ট যখন পুরানো চিন্তার মূলে আঘাত করিতেছিলেন তখন তাহার একমাত্র সাথী প্রিয় চাকর ল্যাম্প (Lampe) ছাতা বগলে কাঁদিতেছিল।

আমাদের দেশের দার্শনিক তথা বুদ্ধিজীবীগণের হাল অবস্থা দেখিয়া আমরা ছাতাবগলে নহে ছেঁড়া কাপড় পরিধান করিয়া কাঁদিতেছি। তবে এরই সহিত নতুন চৈতন্য উদিত হইয়াছে।

মুক্তিযুদ্ধে রক্তস্নান করিয়া বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দর্শন চিন্তা এখনো মুক্ত হইতে পারে নাই। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিতে বৃহস্পতি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহারা যে দর্শন দিয়াছে ইহার নাম ফাঁকিবাজী দর্শন। এই ফাঁকিবাজী দর্শন বা ধোঁকাবাজী দর্শনও একপ্রকার জীবন দর্শন। ফাঁকি ও ধোঁকা জীবন ও জগৎকে পরিচালিত করিতে পারে না এমন কথা কেহ জোর দিয়া বলিতে পারিবেন না।

আজিকার বিশ্বে এই ফাঁকিবাজী দর্শন, কান্ট, হেগেল প্রমুখের দর্শনের চাইতে উত্তম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ছোট ছোট দেশসমূহকে উন্নয়নের নামে বুড়া আংগুল প্রদর্শন করিয়া বাস্তবপক্ষে ফাঁকি ও ধোঁকা দিতেছে। তাহাদের দর্শনে ফাঁকি ও ধোঁকা নাই। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ইহা রহিয়াছে। তাই তাদের নব দর্শনের নাম হইল ফাঁকি দর্শন-ধোঁকা কর্ম।

আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফাঁকি ও ধোঁকা দেখিতে পাইতেছি। ফাঁকিবাজ ও ধোঁকাবাজ আমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। ফাঁকি ও ধোঁকাবাজীতে উচ্চ শিক্ষিতের ভূমিকা অত্যন্ত বেশী। নিরক্ষর নিরন্ন মানুষ ফাঁকি ও ধোঁকা কাহাকে বলে জানে না। ফাঁকি ও ধোঁকা দিবার জন্য 'বুদ্ধির' অত্যন্ত প্রয়োজন। বুদ্ধির ঢেঁকিরা কখনো ফাঁকি বা ধোঁকা দিতে পারে না। যাহাদের বুদ্ধিতে বৃহস্পতি আসন গাঁড়িয়াছে তাহারা ফাঁকি ও ধোঁকাগিরিতে চরম সার্থকতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভাষায় যেমন তৎসম, তৎভব দেশী ও বিদেশী শব্দ রহিয়াছে, বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে তেমনি, দেশী-বিদেশী, অর্ধদেশী, নগ্নদেশী, হালকাদেশী বুদ্ধিজীবী রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ওজনী, ঔষশী, প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল; বুদ্ধিজীবী

www.pathagar.com

রহিয়াছেন। ইদানিং মার্কামারা বুদ্ধিজীবী বলিয়া আর এক প্রকার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গজাইয়া উঠিয়াছে।

নব গজাইয়া উঠা বুদ্ধিজীবীগণ কি কহিতেছে, কেন কহিতেছে এবং কাহাদের জন্য কহিতেছে উহা তাহারা নিজেরা কি বুঝিতেছে? তাহারা যাহা বুঝিতেছে উহার নাম হইল নগদ দানাপানি।

বাংলাদেশে নব গজাইয়া ওঠা বুদ্ধিজীবীগণ ফাঁকিবাজী ও ধোঁকাবাজী দর্শনকে আরো বিকশিত করিতে পারিলে তাহারা আরো চড়া দামে অবশ্য বিক্রয় হইবে। বড় দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমানে তাহারা বড় সস্তা দামে বিক্রি হইতেছে।

মীরজাফর বিগত আড়াইশ বৎসর যাবৎ ধরিয়া এক ঘৃণিত চরিত্র ছিল। সম্প্রতি এক গবেষক (অবশ্যই তিনি তার আত্মীয়) তাহাকে বাংলার ইতিহাসে সিংহ পুরুষে রূপান্তরের চেষ্টা করিতেছেন।

আলেকজান্ডার তাই সত্যই কহিয়াছিলেন, 'সেলুকাস, বড়ই বিচিত্র এই দেশ।'

মীরজাফর যদি আড়াইশ বৎসর পর দেশপ্রেমিক হইয়া যান তবে আমাদের বুদ্ধিজীবীগণ বুদ্ধি বিক্রয় করিয়া যদি আখের গুছাইতে থাকেন তবে আপত্তি থাকিবার কথা নহে। 'ঠকচাচা' কাহিনী আমাদের সাহিত্যে বহু পূর্বে অংকিত হইয়াছে। নবযুগের বুদ্ধিজীবীগণ স্বয়ং 'ঠকচাচার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন ইহা চিন্তা করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে।

এই দেশে বুদ্ধিজীবীগণ এই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শুধু বিবৃতি ঝাড়িয়া বসিয়া ছিলেন না। এদেশের বুদ্ধিজীবীরা কলম ও বিবৃতি ছাড়িয়া বন্দুক কাঁধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। শব্দের বুলেট না ছাড়িয়া তাহারা আগ্নেয় বুলেট নিক্ষেপে নিয়োজিত ছিলেন। লক্ষ শহীদের রক্তের সহিত নিজেদের রক্ত এক সাথে মিশাইয়া দিয়াছিলেন।

১৯৭১'র পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস হইল ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাস। তাহাদের কর্ম ছিল গোলামীর জিঞ্জির ভাঙ্গার ইতিহাস।

আজিকার বুদ্ধিজীবীর ইতিহাস কি? বিদেশী N.G.O-র দলিল দেখিলে ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে।

□ ৪ঠা মার্চ '৯৪

www.pathagar.com

থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে

উনিশশ চুরানব্বই সনের থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর। ঢাকায় ছিলাম। সৌভাগ্য হউক আর দুর্ভাগ্য হউক এবারও থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর ঢাকায় ছিলাম।

সিদ্ধান্ত নিয়াছিলাম এগারটার পর 'থার্টি ফার্স্ট' ডিসেম্বর দেখিবার জন্য ঢাকার রাস্তায় বাহির হইব।

বন্ধুরা কহিল, ওহে বুরবক, এই বয়েসে তোমার রোমান্স উথলাইয়া উঠিল কেন?

ঃ আমাদের তরুণ-তরুণীগণ কোন পথে উহা দেখিবার বাসনা জাগিয়াছে।

বন্ধু কহিল, ককটেইলের ঠ্যালায় তোমার বাসনা নহে তোমার পৈত্রিক হস্তপদ অক্ষত থাকিবে না।

পুরাতন বন্ধু ভাল, নতুন লেপ ভাল, ইহার বিপরীত কার্য করিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। বন্ধুর হিতোপদেশ মনে করিয়া পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিহার করিয়া সেগুন বাগিচার একটি হোটেলের কামরায় দিনের পত্রিকাসমূহ উল্টাইতে লাগিলাম।

থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর বিদায় লইতে শুরু করিয়াছে, রাত বারটা বাজিবার পূর্ব হইতে পটকা-ককটেইলের আওয়াজ শুরু হইল, ঘড়ির কাঁটা যত বারটার দিকে ধাবিত হইতেছে আওয়াজ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

www.pathagar.com

সেদিন রাত্রে ঢাকায় কি কাণ্ড ঘটিয়াছে গত দুই দিবস বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উহার কাহিনীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

বাঙালীরা নতুন কিছুকে গ্রহণ করিতে কখনো দ্বিধা করে না। বাংলার মাটি ফুল, ফল, বৃক্ষগুল্মকে আপন বুকে জন্ম দিয়াছে। বাংলাভাষা বিদেশী শব্দকে আপন করিয়া নিয়াছে এবং নিতেছে।

আমাদের খাদ্যে-বাদ্যে বসনে সম্ভাষণে রন্ধনে রঙ্গনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হইয়াছে। আমাদের নয়ন নতুন দৃশ্য অবলোকনে আগ্রহী, কর্ণ নতুন সুরের প্রত্যাশী, দেশ নতুন নতুন বস্ত্রের পানে চাহিয়া থাকে, আমাদের বসন নতুন স্বাদ গ্রহণে উতলা হইয়া উঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব্য বাঙ্গালী তরুণরা একদা বিদেশী অনুকরণে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, বিদেশী সব কিছু অনুকরণের প্রবণতা সেদিন আর এদিনের অনেক তফাৎ।

স্যার সৈয়দ আহমদ পোষাকে ছিলেন একজন মৌলভী। পরণে শেরোয়ানী, লম্বা চাপ দাড়ি, মাথায় তুর্কী টুপি, অথচ মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন আধুনিক শিক্ষার একজন ধারক, বাহক, পরিচালক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বসন ছিল একজন সাধারণ ব্রাহ্মণের। অথচ তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন একজন যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষ।

স্যার সৈয়দ আহমদ এবং বিদ্যাসাগর আচরণে আধুনিক ছিলেন না তাঁহারা আধুনিক ছিলেন সৃষ্টি ও সাধনায়। তাহাদের অনুসারীরা তেমনি সৃষ্টি সাধনা আন্দোলনে ব্যপৃত ছিল।

মন না রাঙাইয়া শুধু বসন রাঙাইলে যেমন বৈরাগী হওয়া যায় না তেমনি বাইরের আচরণে মাতলামী প্রদর্শনীতে আধুনিক হওয়া সম্ভব নহে।

আমাদের তরুণরা আধুনিক হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা কি সত্যিকার অর্থে আধুনিক বা অন্য দেশের বর্জ্য পদার্থ জড়ানো চলমান লাশ? ইহার গবেষণা হওয়া উচিৎ।

এই তরুণগণ কি নতুন পৃথিবীর অধিবাসী? না নতুন অপরাধী? যদি তাহারা অধিবাসী না হইয়া থাকে অথবা তাহারা যদি অপরাধী হইয়া থাকে ইহার জন্য দায়ী কাহারা?

আমাদের ঘরের সকল দরজা জানালা বন্ধ রাখিয়া আমাদের সন্তানদেরকে নিষেধের 'কারফিউ' জারী করিয়া কি তাহাদের জীবন্ত সবল রাখিতে পারিব? এত বাধা বন্ধনের মধ্য দিয়া কি তাহাদিগকে ইতিবাচক সৃষ্টিশীল তরুণে রূপান্তরিত করা

www.pathagar.com

সম্ভব হইবে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু পূর্বে সন্তানদের ধরিয়া রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেনঃ

পূণ্যে পাপে, দুঃখে সুখে নতুন উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহতি বঙ্গভূমি তব গৃহ ক্রোড়ে
চির শিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে
দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।

এরপর তিনি আরো কহিয়াছেনঃ

শীর্ণ শান্ত সব সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহ ছাড়া লক্ষীছাড়া করে।

তরুণদের এত বড় 'লাইসেন্স' আর কেহ দেন নাই। এই লাইসেন্স লইতে আমাদের তরুণরা এখন আগ্রহী না।

অতীতে আমরা বিদেশীদের ভাল কিছু গ্রহণ করিয়াছি, মন্দ পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন 'নতুন' এলিট হইবার বাসনায় নিজেরা মন্দদ্রব্যকে গায়ে মাখিতেছি এবং এর সাথে মগজে 'নতুন' চিন্তা, নতুন ধ্যান ধারণার নতুন যুক্তি ও প্রযুক্তি চিন্তাকে বিদায় জানাইতেছি।

আমাদের তরুণরা থার্টি ফার্ষ্ট ডিসেম্বরে, যাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিলেন সে বিদেশীরা কি করে তাহা কি এ অন্ধ নির্বোধগণ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছে? সে দেশের তরুণরা কি পরীক্ষা হলে নকলের উৎসব করে? সে দেশের তরুণ কী দেশের সংস্কৃতিকে অন্যদেশে রপ্তানী করে? কর্মকে ঘৃণা করে না। 'জানা' কে অবজ্ঞা করে না।

আমরা তাহাদের ভাল দিকগুলিকে না লইয়া 'ইতর সংস্কৃতিকে' বড় করিয়া ধরিতেছি।

কেহ কেহ কহিবেন, একরাত্রির ফূর্তি, ইহা লইয়া এত মাথাব্যথা কেন? ইহা এক রাত্রির ফূর্তি নহে, তিনশত চৌষট্টি দিন ধরিয়া ইতর চিন্তার বহিঃপ্রকাশ হইল এই থার্টি ফার্ষ্ট ডিসেম্বর সংস্কৃতি।

আমাদের তরুণগণ এখন চক্রান্তের শিকার। তাহাদের মনের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা এবং আত্মোন্নতির স্লো পয়জন ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

www.pathagar.com

একদিকে ডান হাতে অস্ত্র আর বাম হাতে ফেনসিডিল আর অপরদিকে আত্মোন্নতির শ্লোগান, পরীক্ষার হলে নকলের হিড়িক, সর্বক্ষেত্রে মস্তান আর চাঁদাবাজের দৌরাত্ম, সাহসহীন বুদ্ধিজীবীদের পলায়ন মনোবৃত্তি। পাওয়ার এলিটদের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন, রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি আজ তরুণদের পঙ্গু-বিকলাঙ্গ করিয়া দিতেছে। ষাট দশকে আমাদের জানার আগ্রহ বাসনা থাকিলেও উপাত্তের অভাব ছিল। বর্তমানে জানার সামগ্রীর অভাব নাই। তরুণদের কাজ হইল তাহারা জানিবে এবং জানিবে। তাহাদের সম্মুখে এই জানার সামগ্রীর অভাব নাই, অথচ তাহারা তৃষ্ণার্ত বোকা, ইহারা প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনার শিকার।

১৯৪৭ হইতে '৭১ পর্যন্ত বাঙালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই সময়কালে বিভিন্ন দশকে বিভিন্ন প্রেরণা আসিয়া সে দিনের তরুণদিগকে ইতিবাচক ও সৃষ্টিশীল করিয়াছিল। আমরা এই তরুণদের কি দিয়াছি? এই প্রশ্ন কি আসিবে না?

'থার্টি ফার্স্ট' ডিসেম্বর সংস্কৃতিতে কতিপয় তরুণ এবং কতিপয় ব্যক্তি যে আচরণ করিয়াছে ইহাকে ছোট হিসাবে না দেখিয়া ইহাকে একটি বড় আকারের রোগ হিসাবে চিহ্নিত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। আমরা রোগকে ঘৃণা না করিয়া প্রায়শঃ রোগীকে ঘৃণা করিয়া থাকি।

'থার্টি ফার্স্ট' ডিসেম্বরে যে রোগীরা ইতর সংস্কৃতির মাতলামী করিয়াছে ইহা এক প্রকার রোগ, এই রোগের নাম 'বিকৃতি'। এই বিকৃতি এইখানে বা একরাত্রে শেষ হইবে না, ইহা 'তরুণদের' আরো নিঃশেষ করিবে।

আমাদের তরুণরা মেধাবান। অন্য দেশের তরুণ এই দেশে আসিয়া এই দেশের ভাষা শিখিতে কয়েক বছর কাটাইয়া দেয়। এই দেশের রন্ধন খাইলে তাহাদের শরীর মোচড় দিয়া উঠে। অথচ আমাদের তরুণগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিচরণ করিতেছে। অল্পদিনে সে দেশের ভাষা শিখিয়া ফেলিতেছে। সে দেশের খাদ্য গিলিয়া খাইতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না। এমন মেধাবান তরুণদের মগজে গোবর ঢালিয়া শরীরে 'বিদেশী' আতর মাখাইতে প্রলুব্ধ করিতেছি।

একজন স্যার সৈয়দ আহমদ, একজন বিদ্যাসাগর, একজন ডঃ শহীদুল্লাহর নতুন আবির্ভাব কি হইবে না। যাঁহারা আসিয়া যুক্তি ও প্রযুক্তির জোয়ারে এই তরুণদের মানসিক ময়লা ধুইয়া দিতে পারেন? বিদেশের 'বর্জ্য' কি আমাদের তরুণদের দেহ হইতে উপড়াইয়া লওয়া যায় না?

চলমান 'লাশ' কে সবল ইতিবাচক সৃষ্টিশীল বেগবান তরুণে পরিণত করিতে হইলে সাহসী মানুষের আবির্ভাব কামনা করি।

❐ ৫ই জানুয়ারী '৯৬

www.pathagar.com

ভূতের মুখে রাম নাম ...

এক হতভাগ্য একদা জানিতে পারিল যে বটবৃক্ষের নীচে 'রাম' নাম লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে 'ভাগ্য' তাহার হাতের মুঠায় আগমন করিতে বিলম্ব করিবে না।

ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় সে একদা বটবৃক্ষের নীচে আসিয়া শয়ন করিল। তখন সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল। সে মনে মনে প্রার্থনা করিল, হে রাম, আমার জীবনে আজ আর কোন আশা প্রত্যাশা নাই। আমার এখন একমাত্র প্রত্যাশা হইতেছে 'ঘোড়ায় চড়া'। হে রাম, তুমি দয়াপরবশ হইয়া আমাকে একটি ঘোড়া দান কর। ঘোড়ায় চড়িয়া মৃত্যুবরণ করিলে আমি নিজে ধন্য বলিয়া মনে করিব।

লোকটি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তাহার নিকট এক ব্যক্তি এক বস্তা টাকা আনিয়া রাখিয়াছে এবং কহিতেছে 'বৎস' ঘুমাইয়া আর থাকিও না, তোমার দুঃখের রজনী সমাপ্ত হইয়াছে। তোমার জন্য সুখের সদন নির্মিত হইয়াছে। রাজসুখ ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।

'হে বৎস, তুমি ঘোড়া চাহিয়াছিলে। ঘোড়া তোমার পদপ্রান্তে আসিয়াছে। তুমি এই এক বস্তা টাকা ও ঘোড়া লইয়া নিজ বাসভূমে রওনা হও। বৎস ঘুমাইও না, ঘুমাইও না ... নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠ। দেখ-দেখ কত সম্পদ, কত ...।

www.pathagar.com

লোকটি চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখিল। একটি ঘোটকী দাঁড়াইয়া আছে। এই মাত্র এই ঘোটকী একটি সুন্দর বৎস প্রসব করিয়াছে। ঘোটকীর পার্শ্বে এক দারোগা দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। খাকী পোশাক, হাফপ্যান্ট, বুটজুতা, মাথায় শোলার টুপি, হাতে একটি নাতিদীর্ঘ লাঠি। পাশে একটি বস্তাও পড়িয়া রহিয়াছে।

দারোগা ঃ (লাঠির গুতা মারিয়া কহিল) এই বেটা, তুই চোর না সাধু?

লোক ঃ ধর্মাবতার, আমি সাধুও নহি চোরও নহি। আমি অতি সাধারণ গৃহস্থজন।

দারোগা ঃ তুমি কি গডফাদার?

লোক ঃ ধর্মাবতার, অমি 'গড' চিনি 'ফাদার'ও চিনি কিন্তু গডফাদার কাহাকে বলে চিনি না।

দারোগা ঃ বাংলাদেশে চলো, তোমাকে আমি 'গডফাদার' দেখাইব। তুমি গডফাদার দেখিবে।

লোক ঃ ধর্মাবতার উহা দেখিতে কেমন ---।

দারোগা ঃ বিলকুল আমাদের মত। হাত আছে, পা আছে, মাথা আছে আর ------ হাতে রিভলবার আছে --------।

লোক ঃ কি সর্বনাশ।

দারোগা ঃ তাহারা মানুষের রক্ত দিয়া টাকা চিবাইয়া খায়।

লোক ঃ দোহাই দারোগা বাবু, আমি বাংলাদেশ যাইব না ---গডফাদারও দেখিতে চাহি না।

দারোগা ঃ তবে শালা! আমার এই ঘোড়ার বাচ্চা ঘাড়ে তুলিয়া আর অন্যহাতে এই বোচকাটা নাও।

লোক ঃ (মনে মনে) হায় রাম, তুই উল্টা বুঝিলি। আমি ঘোড়ায় চড়িতে চাহিলাম আর তুই আমার উপর ঘোড়া চড়াইয়া দিলি ----- হায় হায় --- উল্টা বুঝিলি রাম।

স্বপ্ন দেখিতে যাইয়া ওই লোকটি উল্টা ফল লাভ করিয়াছিল। রাম শুধু উল্টা বুঝে নাই ----রহিম শেখ ও রামা কৈবর্তগণ যুগ যুগ ধরিয়া উল্টা স্বপ্ন দেখিতেছে এবং উল্টা স্বপ্ন দেখানো হইতেছে।

বাংলাদেশে দুইটি শব্দ আজকাল সকলেই জানে– একটি হইল N.G.O আর একটি হইলো N.O.C আবার একটি শব্দ এরই সহিত যুক্ত হইল। উহা হইল

www.pathagar.com

"গডফাদার"। বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত গডফাদার শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে বাধ্য হইলেন। 'গডফাদারের ' মর্মবাণী অন্য সময় হায়াত থাকিলে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। (DV-99 তেমন ক্ষতিকর নহে) N. G. O গণের দেখানো স্বপ্নের কথা অল্পবিস্তর প্রকাশ করিতে চাহি।

বাংলাদেশে ধর্মকর্ম সাহিত্য সংস্কৃতি এমন কি রাজনীতি পর্যন্ত N.G.O নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ইহাদের মুখে নানারকম সুর ও শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। একটি শব্দ তাহারা উচ্চারণ করে না। উহা হইল 'সমাজতন্ত্র। N.G.O রা সমাজতন্ত্র শব্দটিতে অত্যন্ত ভয় পাইয়া থাকে। তাহারা এখনো মনে করে 'সমাজতন্ত্র' এক দিবস আগমন করিবে, 'ধনবাদী' দৈত্যকে সমাজতন্ত্র গিলিয়া খাইবে। সাম্প্রতিককালের জনৈক হিন্দী কবি কহিতেছেন-

ফিরভি ম্যায় কহদুঁ
পুঁজি সে জুড়া হুয়া হৃদয়
বদল নেহি সকতা
পুঁজি পটিকা সমাজ
চল নহি সকতা।

আমি পুনরায় বলব পুঁজিপতির হৃদয় কখনো পরিবর্তন হয় না। পুঁজিবাদী সমাজ কখনো টিকতে পারে না।

পুঁজিবাদী দৈত্য নতুন কৌশল নিয়া গরীবকে শোষণ করিতে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সমূহের আধিপত্য বিস্তারে নব্য উপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে N.G.O নামক নতুন সড়ক সৃষ্টি হইতেছে। এই নতুন দৈত্যের স্বরূপ এখনো ধরা পড়ে নাই।

এই N.G.O দের মুরব্বীবৃন্দ বাংলাদেশের জন্য বড় বড় দেশে নকল শো রুম তৈয়ার করে। এই শো রুমে দেখানো হয় 'দুর্ভিক্ষের দৃশ্য'। আর্তনাদ করা মানুষের দৃশ্য। দুঃখে দৈন্যে মানুষের আহাজারী করার করুণ চিত্র। এই দৃশ্য দেখাইয়া ইহারা বিদেশ হইতে কোটি কোটি ডলার চাঁদা সংগ্রহ করে, আর ইহাদের এজেন্টগণ সাহায্য আর দানের তামাশা দেখাইয়া মোটা অংক নিজেরা ভোগ করে। ইহাকে বলে, উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

আমি জোর দিয়া কহিব N.G.O বৃন্দ বাংলাদেশের আর্তের সেবা করে না। ইহারা আগামীতে যেন আরো আর্তনাদ শুরু হইতে পারে উহারই রিহার্সেল দিয়া যাইতেছে। তাহারা ঢন ঢন সাহায্য ও ঢং ঢং তামাশা করিয়া থাকে। আর আমরা শুনিতে থাকি 'টন টন' সাহায্য।

www.pathagar.com

শত দুঃখ দারিদ্র ও দৈন্যের মাঝেও আমাদের দেশের কৃষকরা প্রতিনিয়ত কৃষি বিপ্লবের কাজ করিয়া যাইতেছে। এই কৃষককুল যদি উৎপাদন না করিত তবে লাদেশে বহু পূর্বে দুর্ভিক্ষ শুরু হইত। 'কৃষি বিপ্লবে' এই N.G.O বাবাজীদের র্নি' নাই। 'আধুনিক কৃষি' ও কৃষি উৎপাদনের কোন শব্দ তাহাদের মুখ হইতে সৃত হইবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিতে চাহি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে এক বড় মাপের N.G.O লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে গবেষণা পরিচালনা করিতেছে এই দেশের মানুষ মলত্যাগ করিয়া কি করে? তাহারা মলত্যাগ করিয়া সাবান/মাটি/ছাই দিয়া তাহা ধৌত করে?

হায়! N,G.O ভ্রাতৃবৃন্দ, বাংলার হিন্দু-মুসলমান মলমূত্র ত্যাগকে অশৌচ/অপবিত্র মনে করে এবং যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা মলত্যাগ করিয়া সাবান না হলেও অন্ততঃ মাটি দিয়া হাত পরিস্কার করে। ইহার জন্য দেশব্যাপী 'জরীপের' প্রয়োজন কি? ইহাকে 'নাই কাজ ভেরেন্ডা ভাজ' বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

হে N.G.O ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা জানিয়া রাখুন, এই সেই বাংলাদেশ যেখানে পাখীর বিষ্ঠা হইতে বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করে, চল্লিশ দিন পানি জমিয়া থাকিলে মৎস্য উৎপাদিত হয়। ১৫ দিনে সবজীর উৎপাদন হয়। সেই দেশে মানুষ 'ভুখায়' মরিবে না। এই দেশে এখনো ৪টি হাঁসের ডিম বেচিয়া এক কেজি চাউল জোগাড় করিতে পারে।

অস্থিতিশীল রাজনীতি আর গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আমাদের এ কপাল না ভাঙ্গিলে N.G.O দের রং তামাশা আমাদের দেখিতে হইত না। N.G.O দের সর্বনাশা কর্মকাণ্ড বাঙালীদের সৃষ্টিশীলতার বিরুদ্ধে বড় আকারের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। N.G.O দের কাজ কারবার তাই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। যদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তবে আমাদের স্বপ্ন বারবার উল্টিয়া যাইবে। রামাকৈবর্ত ও রহিম শেখ আগামী শতকেও দুঃখের জোয়াল বহন করিয়া চলিতে থাকিবে। দুঃখের পাঁচালী শেষ হইবে না।

❐ ৩১শে অক্টোবর '৯৭

www.pathagar.com

ঘুষে ঘুষ খাইয়া ফেলিয়াছে

ঘুষ শব্দটি উচ্চারিত হইবার সাথে সাথে অনেকেই হুঁশ হারাইয়া ফেলেন। আবার অনেক বেহুঁশ মানুষ কোরামীনের মত ঘুষ শব্দে হুঁশ ফিরিয়া পান।

সুদ এক সময় মুসলমান সমাজে নিন্দার ব্যাপার ছিল, মুসলমান সুদীকে সমাজে কখনো ভাল চোখে দেখা হইত না।

বাংলাদেশের প্রবীণ কথাশিল্পী শাহেদ আলীর একটি গল্পে আছে, এক মহিলা তিন স্বামী ত্যাগ করিয়া ৪র্থ স্বামীর সহিত বাসর ঘরে (স্বামীর সহিত) শয়ন করিয়াছে, হঠাৎ সে মহিলা ওয়াক ওয়াক করিয়া বমি করিতে শুরু করিল। স্বামীটি নতুন স্ত্রীকে সোহাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তাহার কি হইয়াছে।

ইহার উত্তরে মহিলাটি কহিলঃ

সুদ খাইও, আরো ভালো কইর‍্যা খাইও, সুদ খাইয়া মুখটারে টাট্টি বানাইয়া রাখছ।

সুদখোরের মুখে বাঙালী রমণী সেদিন মনুষ্য বিষ্ঠার গন্ধ খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

আগের দিনে মুসলমান সমাজে ধারণা ছিল যে তিনজন সুদখোরের নাম কোন কাগজে লিখিয়া আম গাছে আঁটিয়া দিলে আমে পোকা ধরিবে না।

সুদ এখন নিয়মতান্ত্রিক হইয়াছে। সুদ যখন নিয়মতান্ত্রিক হইল নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্যাংকে স্থায়ী আমানত রাখিয়া কিছু 'ফল' লাভ করিতে শুরু করিল। তেমনি সময়ে ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে সুদের হার হঠাৎ কমাইয়া দেওয়া হইল।

www.pathagar.com

একদা জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য কত প্রচার করা হইত। এখন 'সঞ্চয়' প্রচার তেমন দেখা যায় না।

এখন যে ঘৃণ্যতম কাজটি অনিয়ম দুর্নীতি অনৈতিক হওয়া সত্বেও সকল কিছুর 'তাজ' হইয়া শোভাবর্ধন করিতেছে উহার নাম হইল 'ঘুষ'।

'ঘুষ' এখন অনিয়মের নিয়ম। সকল ক্ষেত্রে অবশ্য ঘুষের ব্যবস্থা নাই, কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে ঘুষ-এর বিচরণ রহিয়াছে সেই সেই ক্ষেত্রে ঘুষ না দেওয়া অপরাধ। ঘুষ গ্রহণ না করা যেন আরো বড় অপরাধ, সেই সেই ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী অপরাধী নহেন, বরং ঘুষ না দিলে ও গ্রহণ না করিলেই অপরাধী ও প্রবঞ্চিত।

'ঘুষ' বহুপ্রকার রহিয়াছে–জাতীয়, বিজাতীয়। 'ঘুষের' ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। ঘুষ প্রদানকারী হইতে ঘুষ গ্রহণকারীদের সব চাইতে বেশী সর্বনাশ হইয়াছে।

নগদ অর্থই শুধু ঘুষ নহে। ঘুষ বহু প্রকারের হইয়া থাকে। ঘুষ কখনো সাকী, কখনো সুরা, কখনো রাজ্য, কখনো ক্ষমতা।

মিশরীয় সুন্দরী ক্লিওপেট্রাও ছিল জুলিয়াস সিজারের জন্য একটি 'ঘুষ'। জুলিয়াস সিজার মিশর হতে আগত সেনাপতিকে কহিল, কি আনিয়াছ? তখন তাহার সেনাপতি লাল কার্পেটে মোড়া বান্ডিলটি দরবারে খুলিল। দেখা গেল সেই কার্পেটে রহিয়াছে নীল আঁখির নীল নদের কন্যা ক্লিওপেট্রা।

কথিত আছে যে ফরাসীরা মিশরে ঢুকিয়াছিল মদ ঘুষ দিয়া। তখনকার মিশর সম্রাট মদ্যপান করিতেন না। তাহাকে মদের ঘুষ দিয়া বেহুঁশ করিয়া শেষ পর্যন্ত সুয়েজ খাল খননের অনুমতি লাভ করিয়াছিল।

আর বৃটিশরা শেয়ার কিনিবার নাম করিয়া ফরাসী কোম্পানীকে ঘুষ দিয়া মিশরে প্রবেশ করিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইউরোপীয় ডাক্তার "ঔষধ" ঘুষ লইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার আদায় করিয়াছিল।

ঘুষের পাল্লায় পড়িয়া বাংলা-বিহার–উড়িষ্যার সর্বনাশ হইয়াছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নবাব সিরাজদৌল্লাহর অমাত্যদের মধ্যে 'ঘুষ' দিয়া সকলকে বেহুঁশ করিয়া তোলে এবং এই ঘুষের জোরে তাহারা বাংলা মুল্লুক দখল করে।

মির্জাফর ছাড়া আরো অনেক ভারতবর্ষের 'ঘুষের' রোগ বিস্তারকারীরা ভারতের ছোট ছোট রাজাদেরকে বশীভূত করিয়া ভারতবর্ষকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে।

www.pathagar.com

ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে কথিত 'বফোর্সের' ঘুষ কেলেংকারীর কাহিনীতে জড়ানো হইয়াছিল, প্রমাণ না হইলেও 'ঘুষের' গন্ধে তিনি প্রায় দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

জাপানের অনেক বড় বড় মন্ত্রী ঘুষ নেওয়ার অপরাধে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মার্কিন মুল্লুকে কোন রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রী ঘুষ খাইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাহারা ঘুষ প্রদানে সেরা দেশ, তাহারা সেরা ঘুষ বেপারী।

দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশে যাহারা ইহাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারাও ইহাদের ঘুষের জোরে নাচে। তাহারা প্রকাশ্য যে ঘুষ প্রদান করে উহার নাম সাহায্য বা দান, আর অপ্রকাশ্যে যাহা দেয় উহার নাম 'গুপ্তচর বৃত্তি'। তাহাদের CIA র কাজ হইল 'ঘুষ' দিয়া বিভিন্ন দেশকে বেহুঁশ করিয়া রাখা।

তবে তাহাদের ঘুষে সততা রহিয়াছে। ঘুষ প্রদান করিয়া কাজ হাসিল হইলে তাহারা তাহাদের 'ঘুষ' কাহিনী ফাঁস করিতে দ্বিধাবোধ করে না। তাহারা হইল কলিযুগের সত্যবাদী মিথ্যুক।

পাকিস্তান আমলে 'ফ্রাঙ্কলিন' ও বি, এন, আর নামে দুইটি প্রতিষ্ঠান ছিল। BNR পরবর্তীতে পাকিস্তান ষ্টাডিজ নাম গ্রহণ করে।

এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি ছিল মার্কিনী সাহায্যে এবং অপরটি পাক-সরকারের।

প্রথমটির কাজ ছিল বাঙ্গালী নামী দামী মানুষের মধ্যে ঘুষ বিতরণ করিয়া তাহাদের মাধ্যমে মার্কিন মুল্লুকের কিতাব অনুবাদ করা। তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের বহু প্রতিভা এই মার্কিনী 'ঘুষের' জালে আবদ্ধ হইয়াছিল।

বাঙ্গালী সংস্কৃতি ধ্বংসের পাঁয়তারা করিবার জন্য B.N.R এর শক্তি ছিল প্রচণ্ড। B.N.R ফ্রাঙ্কলিনের কায়দায় পুস্তক অনুবাদ ছাড়াও সেমিনার সিম্পোজিয়ামের নামে বুদ্ধিজীবীদের নগদ ঘুষ প্রদান করিত এবং বিদেশযাত্রার ব্যবস্থা করিত। মনে হইতেছে গাছ-মাছ-বাঁশ-হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগল ছাড়া সকলে ঘুষের জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে।

এক শাস্ত্রের ন্যায় অনুমান বুঝাইতে শিক্ষক মহাশয়গণ উদাহরণ দেন, 'সকল মানুষ মরণশীল' আর এখন উপমা হইবে, 'সকল মানুষ ঘুষখোর'।

www.pathagar.com

পূর্বে বলা হইত, 'জন্মিলে মরিতে হইবে' এখন বলিতে হইবে, 'বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ঘুষ খাইতে হইবে।' ঘুষহীন জীবন আজ প্রচঞ্চনার সামিল।

কৃষক কোথায় কাহাকে ঘুষ দিবে, মাঠের ধান, বনের গাছ, পুকুরের মাছে 'ঘুষের' কোন প্রয়োজন নাই। তাই তাহারা 'ঘুষ' প্রদান হইতে বিরত রহিয়াছে। গাছ-বাঁশ তথা মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তু গাছপালা-পশুপাখী যদি 'ঘুষ' খাইত তবে আমরা এবার সেই ক্ষেত্রে এই ঘুষ অবশ্য চালু করিতে দ্বিধাবোধ করিতাম না। 'ঘুষ' একমাত্র মনুষ্যগণের জন্য নির্ধারিত বলিয়া মনুষ্য হইল একমাত্র ঘুষ ভক্ষণকারী প্রাণী।

'ঘুষ ভক্ষণকারী' কোন মানুষ বর্তমানে হেয় নীচু বা চরিত্রহীন 'বদমাইশ' হিসাবে আখ্যায়িত হইতেছে না। 'ঘুষ' গ্রহণকারী জামাইয়ের আদর পান। ঘুষ গ্রহণকারী পিতার 'কন্যা'র জন্য 'জামাতার' অভাব রহিয়াছে বলিয়া উদাহরণ নাই।

তোমার অট্টালিকা–

কার খুনে রাঙা? ঠুলি খুলে দেখ প্রতি ইটে আছে লিখা।

নজরুল ইসলাম আজ বাঁচিয়া থাকিলে কখনই এই কবিতার চরণ ওইভাবে লিখিতেন না।

তিনি লিখিতেন,

তোমরা অট্টালিকা,

ঘুষে রাঙা,

ঠুলি খুলে দেখ প্রতি ইটে আছে লিখা।

'ঘুষ' গ্রহণ প্রদান এবং 'ঘুষের' বাহাদুরী প্রদর্শন বর্তমানে এক নব সংস্কৃতির রূপ ধারণ করিয়াছে।

'ঘুষ' আজ শক্তিতে, মুক্তিতে, ভক্তিতে স্থান লাভ করিয়াছে। 'ঘুষ' আরাম-আনন্দ ও আভিজাত্যের প্রতীক। 'ঘুষ' ভীতি নাশক ও প্রীতি বর্ধক মহৌষধ।

ঘুষের প্রকাশ্য বিরোধীদের জন্য অপ্রকাশ্য ঘুসি প্রস্তুত রহিয়াছে।

বহু অফিসে লেখা থাকে, 'ইহা ধূমপান মুক্ত এলাকা', ইহা 'ঘুষ মুক্ত এলাকা' লেখা কবে হইবে? ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। 'ঘুষ দানের' বিরুদ্ধে কি কোন আয়োজন নাই? না, তাহা ঘুষে খাইয়া ফেলিয়াছে?

❐ ২ রা সেপ্টেম্বর '৯৪

www.pathagar.com

তুমি বুঝলা কৈ

একদা এক মহিলা তাহার মৃত স্বামীর জন্য স্বাভাবিক কান্নার চেয়ে অধিকতর জোরে জোরে কান্না করিতেছিল। তাহার কান্নার মধ্যে বারবার ভাসিয়া আসিতে লাগিল, উহুরে ... উহুরে ... আমার কি হবেরে ....।

পাড়াপড়শী জানিত যে সে মহিলার স্বামী জীবিত অবস্থায় এই মহিলাকে নানানভাবে নির্যাতন করিতে কসুর করে নাই। এই স্বামী তাহার সম্পদ ছিল না, ছিল এক মহাআপদ। এই আপদ বিদায় হইয়াছে তাহা ত ভাল হইবার কথা। লোক দেখানো শোক দেখাইলেই ত চলিত। এমন স্বামী ভক্তি সে এলাকার মুরব্বীগণ কখনো দেখে নাই। লোকজন এমন শোকের হেতু খুঁজিয়া পাইল না।

এমন সময় এক বৃদ্ধ আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল এবং কহিল, বাচা, এমন করিয়া কাঁদিও না, মুর্দার দিলে কষ্ট লাগিবে।

ক্রন্দনরত মহিলা কান্না থামাইয়া লাফ দিয়া উঠিয়া কহিল, কে কহিতেছে আমি ওই বেটার জন্য শোকে কান্না করিতেছি। আমি কাঁদিতেছি সিন্দুকের চাবির জন্য। বেটা মরিবার পূর্বে চাবি কোথায় রাখিয়াছে উহা বলিয়া যায় নাই। এই বলিয়া মহিলাটি পুনরায় দ্বিগুণ কান্না শুরু করিল ... উহুরে ... আমি কোথায় যাব রে ... কি খাইয়া বাঁচিবরে ....। চাবিহারা মহিলা যেমন করিয়া মৃত স্বামীর শয্যার পাশে বসিয়া কাঁদিয়াছিল, জাতিসংঘও বিভিন্ন সময়ে এমনভাবে কান্নার অভিনয় করিয়া থাকে। এই অভিনয়ের নাম বিশ্ব দিবস উদযাপন। জাতি সংঘের আসল মুরব্বীবৃন্দ দেখেন যে তাহাদের স্বার্থ কোথায় ক্ষুণ্ন হইতেছে বা হইবে। এরই সহিত তাহারা নজর দিয়া থাকেন বিশ্ব ব্যাংক আই, এম, এফ, এরই সহিত বিশ্ববাজার।

অতীতে বুর্জোয়াদের হাতে বর্তমানের মত এত প্রযুক্তি ছিল না। এ প্রযুক্তির অধিকারী বুর্জোয়া এবং তাহাদের আসল মালিকরা জাতিসংঘকে নিজেদের পকেটসংঘে পরিণত করিয়াছে।

www.pathagar.com

এই শতকে মানব সভ্যতার চরম উৎকর্ষ হইয়াছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মহাকাশ জয় এই শতাব্দীতেই হইয়াছে। এরই সাথে দেখা যাইবে–এই শতাব্দীতে যত মানুষ মরিয়াছে, যত মানুষ উদ্বাস্তু হইয়াছে, অন্য কোন শতাব্দী বা কয়েক শত শতাব্দী মিলিয়াও এত মানুষ মরে নাই, এত মানুষ উদ্বাস্তু হয় নাই।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ মানুষের আর এক পরিচয় হইতেছে আমি উদ্বাস্তু বা রিফিউজী।

সেই ত বেশী দিন পূর্বের কথা নহে মাত্র ২৫ বৎসর পূর্বে আমরা এক কোটি লোক উদ্বাস্তু হইয়াছিলাম। আমাদের অপরাধ ছিল আমরা স্বাধীনতা চাহিতেছে।

হে শান্তির উদগাতা
হে সভ্যতার সৈনিক
হে গণতন্ত্রের দিশারী
হে সাম্যের পতাকাবাহী
হে মানুষ হে সভ্যতা
হে মানবতা হে রাজনীতি
হে শিক্ষা হে বিজ্ঞান
হে প্রযুক্তি
শোনো শোনো শোনো
তোমরা আমাকে চিরকালের
উদ্বাস্তু করে রেখেছ–
আমি এখন আফগানিস্তানে;
আফগানিস্তানে এবং আফগানিস্তানে।

– ফজল শাহাব উদ্দিন।

হে জাতিসংঘ, আফগানিস্তানের মানুষ আর কতকাল ধরিয়া রক্ত ঝরাইবে, আর কত উদ্বাস্তু হইবে? ওই দেশে কি বারবার বাচ্চা সাক্কুর জন্ম হইবে? না আপনারাই বাচ্চা সাক্কু পুষিবেন?

জাতিসংঘের দপ্তর হইতে আশ্রিত নজিবদৌল্লাহ এবং তাহার ভাইকে ছিনাইয়া লইয়া গেল এবং ফাঁসি দিয়া প্রকাশ্যে রাস্তায় লাশ টাঙ্গাইয়া পৈশাচিক আনন্দ প্রকাশ করা হইল। ... জাতিসংঘ ওই মহিলার মত নকল কান্না করিল ... তাহাদের কর্তৃত্ব চলিয়া যাইতেছে এ ভয়ে একটি দুঃখ প্রকাশ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

শুধু আফগানিস্তান নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের রক্ত ঝরিতেছে এবং মানুষ উদ্বাস্তু হইতেছে। জাতি সংঘের ত্রাণ নামক বাতাসা দিয়া কি এই উদ্বাস্তুগণ আবার মানুষ নামে পরিচিত হইতে পারিবে?

www.pathagar.com

জাতিসংঘ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিবস উদযাপন করিয়া থাকে। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশসমূহ ঘটা করিয়া এই দিবসসমূহ উদযাপন করে। আমাদের দেশেও আমরা এই দিবসসমূহ উদযাপন করিয়া থাকি। এই দিবসসমূহের মধ্যে রহিয়াছে বসতি দিবস, পরিবেশ দিবস, মানব দিবস, পুষ্টি দিবস, সাদা ছড়ি দিবস, খাদ্য দিবস, জনসংখ্যা দিবস, আবহাওয়া দিবস ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দিবসসমূহের পূর্বে বিশ্ব যোগ হইয়া থাকে। জাতিসংঘের নটের গুরুদের নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া বিশ্ব উদ্বাস্তু ও বিশ্ব শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস ও বিশ্ব শোক দিবস বর্তমানে অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

উদ্বাস্তু দিবসের শ্লোগান হইবে উদ্বাস্তু বন্ধ করা নহে ... উদ্বাস্তু হইলে করণীয় কি। এ সম্পর্কে ছোট ছোট জাতি গোষ্ঠীতে বিবদমান মানুষের মধ্যে জ্ঞান দান করা। মান ও মালের দিকে না তাকাইলেও জান কি ভাবে বাঁচিবে ইহার প্রতি নজর দেওয়া শিখাইতে হইবে। এবং তাহারা কহিবে, আমরা মানুষ নই উদ্বাস্তু/রিফিউজী/ আমরা মোহাজের।

বিশ্ব শোক দিবস হইবে কাহাদের জন্য? প্রথমত বিশ্ব শোক দিবস হইবে ওই সব ব্যক্তিদের জন্য, যাহারা মানব হত্যাযজ্ঞের নায়ক ছিলেন যেমন মুসোলিনী, হিটলার, এহিয়া প্রমুখ।

কারণ এই সব মহাহত্যাকারীকে সকলে ঘৃণা করিতেছে, তাহাদের জন্য কেহই শোক প্রকাশ করিতেছে না। অতএব জাতিসংঘের উচিৎ ইহাদের জন্য বিশ্বশোক দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা করা। শোকে পড়িয়া একদা বাল্মীকি শ্লোক গাথা রচনা করিয়াছিলেন। জাতিসংঘ দুই মহাযুদ্ধের মহাকান্নার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শোকের উপর যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম সে প্রতিষ্ঠান শোক ভুলিয়া যাওয়া মহা অন্যায়।

ব্যাধ যদি পাখী না মারিত তবে মৈথুনরত পাখীর শোক কবি বাল্মীকি দেখিতে পাইতেন না। দুই বিশ্বযুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ নিহত না হইলে জাতিসংঘও গঠিত হইত না। অতএব জাতিসংঘের উচিত বিশ্ব শোক দিবস উদযাপন করা।

এই শোক দিবসের অর্থ যোগান দিবে বিশ্বব্যাংক ও আই, এম, এফ। বিশ্ব মোড়লগণ অনুন্নত দেশের জাতীয় পুঁজি বিকাশের জন্য যে গভীর ষড়যন্ত্র করিতেছে সে ষড়যন্ত্রে পড়িয়া অনুন্নত দেশের মানুষ শোকে এতই পাথর হইয়া পড়িবে যে তাহাদের আর কান্নার সময় আসিবে না।

জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বশোক দিবস পালন না করিলেও বিভিন্ন সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া চাবি হারা মহিলার মত শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহারা অনুন্নত দেশকে কাঁদাইতেছে তাহারা কি কখনো কাঁদিবে না?

❐ ২৫শে অক্টোবর '৯৬

www.pathagar.com

যে পড়ে সে মরে

একদা ঢাকার জনৈক অধিবাসী তাহার সন্তানকে ডাকিয়া কহিল, আরে তোর কেতাবে কি লেখছে একটু বড় কইর‍্যা পড় দেখি।

ছাত্র পড়িতে লাগিল, 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল/ কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।

পিতাঃ হ, সাচ্চা কথা তোর কেতাবে লিখছে। বুঝবার পারছ কি লেখছে?

পুত্রঃ না বাপজান

পিতাঃ ত হুন। কেতাবে আমার পেয়ারা লোকজনের নাম লিখছে 'রব' ওই ত আমাগো দাদা আবদুর রব, 'কানন' আর 'কুসুম' তর খালার নাম, মানে আমার শালী। ওই 'কলি' তর মায়ের নাম, আসল নাম ছিল কলিমা বেগম। আমি হালায় আদর কইর‍্যা ডাকতাম 'কলি' কইয়্যা। অহন পোলাপান বড় হইছে দেইখ্যা গেদানীর মা কইরা ডাক পাড়ি। আর একটু পড়। পুত্র ঃ 'রাখাল' গরুর 'পাল' লয়ে যায় মাঠে।

পিতাঃ সাব্বাস ওই যে শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের 'রাখাল' আর ঘড়ির দোকানের পাল বাবুর কথাভি লেখা আছে। আর একটু মোচড়াইয়া পড় দেখি আমার নাম আছে কি না।

পুত্র পুরা কবিতাটি পিতাকে পাঠ করিয়া শুনাইল এবং পিতা-পুত্র দেখিল যে কোথাও পিতার নাম নাই।

ইহা দেখিয়া পিতা রাগান্বিত হইল। উপবেশন ত্যাগ করিয়া হুংকার প্রদান করত কহিল, 'আবে পড়া ছাইড়্যা দেয়–যে পাতায় পোলার বাপের নাম নাই হে পড়া দিয়া কোন লাভ নাই, আইয়া পড়। বাপ বেটায় একসাথে কাম করি। বাপের নাম যে কেতাবে নাই হে পড়া আমি পোলারে পড়ামু না।

'শিক্ষা অভিশাপ না আশীর্বাদ' 'শিক্ষাই মুক্তি না ক্ষতি' এই আলোচনায় প্রবেশ করিবার পূর্বে শিক্ষা ভীতি প্রসঙ্গে দ্বিতীয় গল্পটি হইলঃ

শহুরে জনৈক বর্ণাঢ্য সমাজসেবী, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির বাসায় এক গরীবের ছেলে কাজ করিত।

www.pathagar.com

এই সজ্জন ব্যক্তি নিরক্ষরতা বিরোধী আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি প্রচার করিতেন যে Each one Teach One। আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়। তিনি নিরক্ষরতা বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে 'একজন একজনকে শেখাও, পাঠদান দাও' এই নীতিকে নিজ বাসভূমে চালু করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাসার চাকরকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার মানসে নিজের সন্তানের গৃহশিক্ষকের নিকট সেই ছেলেটির লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিলেন।

বাসার চাকরটি প্রতিদিন ঘরের কাজ সারিয়া সন্ধ্যায় সুবোধ বালকের মত লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। ছেলেটির পিতার নিকট এই সংবাদ পৌছিলে ছেলেটির পিতা দ্রুত শহরে আগমন করিল।

ছেলের পিতা গৃহস্বামীকে কহিল, হুজুর আমার পুত্রকে আর আপনার বাসায় রাখিব না।

গৃহকর্তাঃ কেন–তাহার বেতন কি কম?

ছেলের পিতাঃ না হুজুর।

গৃহকর্তাঃ তাহার উপর কি কোন অহেতুক কাজ দিতেছি–না অত্যাচার করিতেছি?

ছেলের পিতাঃ না হুজুর।

গৃহকর্তা ঃ তবে––?

ছেলের পিতা মাথা চুলকাইয়া কহিল, আমাকে কষ্ট দিতেছেন এবং আমার ওপর অত্যাচার করিতেছেন–আমার ওপর অহেতুক বোঝা চাপাইয়া দিতেছেন।

গৃহকর্তাঃ কোথায় কখন তোমার ওপর অত্যাচার করিলাম–খুলিয়া কহ, নির্ভয়ে তুমি তোমার বক্তব্য প্রকাশ কর।

একটু ভরসা পাইয়া ছেলের পিতা কহিল, হুজুর আপনি আমার সন্তানকে লেখাপড়া করাইতেছেন ইহা বড় অন্যায়। দিনমজুরের সন্তান লেখাপড়া শিখিলে 'ফুলবাবু' হইয়া চলিবে আর কোন কাজ করিবে না। শুনিতেছি টিক মার্কা পরীক্ষায় ম্যাট্রিক পাশ সহজে মিলে। এই ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করিলে কলেজে পড়িতে চাহিবে। কলেজে পড়িলে কি তাহার চলিবে? ধরিয়া লইলাম সে আই. এ বি. এ পাশ করিল। ইহার পর সে কি করিবে? তাহার ভাগ্যে কি চাকুরী জুটিবে? লেখাপড়া জানা মানুষ আজকাল কাজ করে না। গরীব মানুষ কাজ না করিলে কি খাইব, আমাদিগকে কে খাওয়াইবে।

আমাদেরকে লেখাপড়া করার উপদেশ দেওয়া আমাদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা। লেখাপড়া শিখিলেই আমার ছেলে সকল প্রকার কাজ করা বন্ধ করিয়া দিবে। অতএব লেখাপড়া করার মত কাজে আমার ছেলেকে এইখানে রাখিব না।

www.pathagar.com

এই কাহিনীর পর আমার হুঁশ হইল, এতদিন ধরিয়া জানিতাম শিক্ষাই মুক্তি, শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষা আশীর্বাদ। গ্রাম্য নিরক্ষর মানুষের নিকট হইতে শিখিলাম শিক্ষা মুক্তি বা শক্তি নহে, শিক্ষা অভিশাপ, শিক্ষা যন্ত্রণা, শিক্ষা বেদনা, শিক্ষা কর্ম বিদ্বেষী প্রেরণা, শিক্ষা বেকার সৃষ্টির অপপ্রয়াস।

শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী করে? মহৎ করে?

কোথায়? 'বিনয়' কি পদার্থ? মহৎ মানে কি? এই অমূল্য পদার্থ কোথায় পাইবে?

গ্রীক দার্শনিক ডাইয়োজনিজ দিনের বেলায় হারিকেন জ্বালাইয়া আলোর অন্বেষণ করিতেন। 'বিনয়' সন্ধ্যাকালে হারাইয়া যাওয়া গরুর মত খুঁজিতে হইতেছে।

হুজুর, লেখাপড়া শিখিয়া আমার সন্তান কি করিবে? ঘোড়ার ঘাস কাটিবে? বৃটিশ আমলে বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঘোড়া কেন, খচ্চর গাধার ঘাস কাটারও মূল্য ছিল। ঘোড়ার ঘাস নহে, গোড়ার 'লোম' কাটিলে টু পাইস ইনকাম হইত। শাক-সব্জী যাহা সার দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে উহাতে যেমন প্রাচীনকালের স্বাদ নাই, সার এবং স্যারদের মূল্য বাড়িলেও শিক্ষিত নব্য সন্তানদের মূল্য নাই বলিলে চলে। শিক্ষা একটি মহাযন্ত্রণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষিত হইলে লোকে কাজ করিতে চাহিবে না এবং যাহারা শিক্ষার ঠেলায় 'চাকুরী নামক' আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপ হস্তগত করিবে উহারা সে প্রদীপে 'ঘুষের' ঘষা লাগাইয়া মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবে।

আরব্য রজনীর আলাউদ্দীন প্রদীপে ঘষা দিলে মনোবাঞ্ছা পূরণ করিত, কিন্তু অপরের সর্বনাশ সাধন করিত না।

এখন আরব্য সহস্র রজনী নাই, এখন রহিয়াছে সহস্র দুঃখের রজনী। এই রজনীর কাহিনীতে শিক্ষা এক প্রকার অভিশাপ। শিক্ষা একটি দুরারোগ্য রোগ, একটি যন্ত্রণা।

একদা একটি প্রেমের গান শুনিয়াছিলাম, গানের কলি হইলঃ শিশুকাল ছিল ভাল/যৌবন কেন এলরে। আমার সন্তান অশিক্ষিত ছিল ভালই ছিল/শিক্ষা কেন এলরে।

এত প্যাঁচ, এত ঠেলাঠেলি, এত রক্ত হানাহানি সব শিক্ষার কুফল।

অশিক্ষিত লোক না খাইয়া মরে, কিন্তু ঠেলাঠেলি করিয়া প্রাণ বিসর্জন দেয় না।

লেখাপড়ার প্রয়োজন কি?

দেশদরদীগণ কহিবেন, শিক্ষা হইল মানব সম্পদ উন্নয়ন। বেশীর ভাগ দ্রব্য যখন বিদেশ হইতে আসিতেছে তখন মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজন কোথায়? এই দেশের মানব সন্তানদের উপদেশ প্রদানের জন্য ধীর মস্তিষ্কের মানুষের

www.pathagar.com

প্রয়োজন। মানুষ চালাইবার মানুষের জন্য প্রয়োজন চিকন গোবিন্দভোগ চাউলের। এই গোবিন্দভোগ চাউলের চাষের জন্য গোবরের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের মগজ গোবর দিয়া গোবিন্দভোগ চাউল উৎপাদন সম্ভব নহে। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে 'খাটি দেশী' উৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ, কাটারীভোগ, কালোজিরা ইত্যাদি চাউল উৎপন্ন হইবে না। গোবর হইল ইহার একমাত্র উৎকৃষ্ট সার।

গরু আমাদের দেশে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে আগমন করিতেছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বিদেশ হইতে আসা 'গরুবৃন্দ' বাঙলাদেশে গোবর ত্যাগ করিবার পূর্বে ওই গরুবৃন্দ মনুষ্য উদরে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত কসাইদের হাতে হালাল হইয়া যায়।

তাই দেখিবেন অচিরে আমাদেরকে এই দেশে গোবর আমদানী করিয়া আমাদের গোবিন্দভোগ/কাটারীভোগ চাউলের হৃত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু দেশী গোবরের গৌরব আনিতে পারিব না। আমাদের গোবরের গর্ব গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে।

হে পাঠক! আপনারা দয়া করিয়া বলুন গোবর আনিতে লেখাপড়ার কি কোন প্রয়োজন আছে?

'ঘুষ' খাইতে লেখাপড়ার প্রয়োজন আছে, কিন্তু 'ঘুষি' লাগাইতে লেখাপড়ার কোন প্রয়োজন নাই।

মাঠ, পাঠ ও পাট আমাদিগকে বড়ই নিরাশ করিয়াছে। সবুজ পাট মণ্ড হইয়া মস্ত বড় কাজের কাজী হইবে বলিয়া বাদ্য শুনিতেছি। অবুঝমন সবুজ পাটের মাজেজা এখনো বুঝিতে পারে নাই বলিয়া সবুজ পাটের বাদ্যে পাট চাষীর ভাঙ্গা ভাগ্য কতখানি জোড়া লাগিবে ইহা বলিতে পারিতেছি না।

আমাদের দেশের নানান সমস্যা সমাধানের জন্য কত প্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হইয়াছে। প্রস্তাব করা যাইতে পারে, পাঠকে লাটে উঠাইয়া দেওয়া হউক। অর্থাৎ লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দেখা হউক ইহাতে উৎপাদন বাড়ে, না কমে।

তর্কশাস্ত্রে পদের হ্রাস বৃদ্ধি বলিয়া একটি সূত্র আছে।

সেই সূত্রটি হইলঃ

জাত্যর্থ বাড়িলে ব্যক্তর্থ কমিবে
ব্যক্তর্থ বাড়িলে জাত্যর্থ কমিবে
জাত্যর্থ কমিলে ব্যক্তর্থ বাড়িবে
ব্যক্তর্থ কমিলে জাত্যর্থ বাড়িবে

সেই সূত্রের আলোকে বলিতেছি–লেখাপড়া কমিলে উৎপাদন বাড়িবে। উৎপাদন কমিলে লেখাপড়া বাড়িবে।

❐ ১১ই নভেম্বর '৯৪

www.pathagar.com

আই সুগার ইউ

সুকুমার রায় পৃথিবীতে অদ্ভুত প্রাণীর কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। তাই তিনি 'খিচুড়ি' নামক ছড়ায় প্রথমে লিখিলেন ঃ

হাস ছিল সজারু (ব্যাকরণ মানি না) /হয়ে গেল হাসজারু কেমনে তা জানি না।

উদ্ভট সন্ধির নিয়মে তিনি বকের পশ্চাতে কচ্ছপ যোগ করিয়া বকচ্ছপ, মোকারু, গিরগিটিয়া, হরিণের শিংওয়ালা সিংহ হরিণ হাতি+তিমি = হাতিমি ইত্যাদি প্রাণীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

সুকুমার রায়ের মত হাসির রাজার আজকাল আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থানরত মহারথিদের কর্মকাণ্ড দেখিলে হাসির উদ্রেক হইয়া যায় না।

সম্প্রতি বাংলাদেশে এক প্রকার পণ্ডিত আবিষ্কার করিলেন, আমাদের শিক্ষা অধঃপতনে যাইবার প্রধান কারণ হইতেছে আমরা ইংরেজী বিষয়ে বড়ই দুর্বল। শুধু উহা নহে, ইংরেজী বিদ্যা রপ্ত করিলে ভাগ্যলক্ষ্মী পাউন্ড-স্টার্লিংয়ের বস্তা বোঝাই করিয়া বাংলাদেশে পাঠাইয়া দিতে সমর্থ হইবে।

কায়দা করিয়া একটু হাসিতে কাশিতে পারিলে যেমন অভিনেতা হওয়া যায়, দুই চারিটি গদ্য/গদা প্রকাশিত হইলে যেমন কবি হওয়া যায়, একটু বুদ্ধি খাটাইয়া বুদ্ধি

www.pathagar.com

বেচিলে বুদ্ধিজীবী হওয়া যায়। উঁচু স্থানে বিশেষ করিয়া ঢাকায় উঁচু স্থান পাওয়া কোন আঁতেল যদি কায়দা করিয়া 'নতুন' সমস্যার কথা তুলিয়া ধরেন তখন উহা হইয়া যায় এক নম্বরী সমস্যা।

প্রথম শ্রেণী হইতে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী পড়াইয়া আমরা যেখানে 'ফেল' মারিয়াছি সেই ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী ক্লাশে দুই বৎসরে ইংরেজী শিখাইয়া আমাদের সন্তানদের নতুন দিগন্ত দেখাইবার এক বাহাদুরী 'সিলেবাস' ও ইংরেজী শিক্ষা পদ্ধতি চালু করিয়াছে।

ডিগ্রী ক্লাশে পূর্বেও ইংরেজী ছিল তবে উহা ছিল অতিরিক্ত। পাশ না করিলেও চলিত। ৪০ নম্বরের উর্ধ্বে পাইলে সেই নম্বর যোগ হইত।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যে ইংরেজী বিষয় চালু করিয়াছে, ইহা হইল অতিরিক্ত বাধ্যতামূলক বিষয়। এ বিষয়ে অবশ্যই ৩৩ নম্বর পাইতে হইবে। কিন্তু যদি এই বিষয়ে ৩৩ নম্বর হইতে বেশী পাওয়া যায় তবে অনুর্ধ্ব ১০ নম্বর যোগ হইবে। ৪৩ নম্বর পাইলেও ১০ নম্বর এবং ৫৩ নম্বর পাইলেও ১০ নম্বর যোগ হইবে। ঘি ও তেল একই দরে বিক্রি হইবে। ইহাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আবিষ্কৃত হাঁসজারু সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে।

ইংরেজীর জনৈক অধ্যাপক মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই ডিগ্রী ক্লাশের ইংরেজী কি বাধ্যতামূলক না অতিরিক্ত। তিনি কহিলেন, ইহা বাধ্যতামূলক। পুনরায় কহিলাম, ইহা যদি বাধ্যতামূলক হয় তবে আমাদের ডিগ্রী ক্লাসে কি ১১০০ নম্বর হইবে? তিনি কহিলেন, ১১০০ নম্বরের পরীক্ষা, তবে ইহা 'খিচুড়ি'; বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত নির্দেশ পরিষ্কার নহে।

আমাদের স্কুলে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্যের অপদার্থ সন্তান বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য পড়াশুনায় ছিল আস্ত গবেট। কিন্তু বিভিন্ন ভাষা বিশেষ করিয়া ইংরেজীকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আসর সরগরম করিয়া রাখিত। সে কহিত, আমি তোমাকে চিনি, আমার মামা কেরানীগিরি করেন ... এর ইংরেজী কি জানিস? কহিলাম, না। সে কহিল, আমি তোমাকে চিনি 'আই সুগার ইউ', আমার মামা কেরানীগিরি করে–মাই ডবল মাদার হু কুইন মাউনটেইন ডাস ..। প্রথম শ্রেণী হইতে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজীর বইয়ে সাঁতার কাটিয়া 'আই সুগার ইউ মার্কা' ইংরেজী শিখিলাম (সকলে নহে)। ইহার জন্য দায়ী কে? পড়া-পড়ুয়া-শিক্ষক না সিলেবাস?

ইংরেজী বিদেশী ভাষা। ইহাকে এই দেশে কিভাবে সহজে স্বল্পতম সময়ে শিখানো যায় ইহার উপর কি কোন ব্যবস্থা আছে? এক কথায় উহার উত্তর হইবে, নাই। ডিগ্রী ক্লাশে দুই বৎসরের সিলেবাস হইলেও মোট ক্লাশের সংখ্যা দুই বৎসরে ৪০ দিনের উপরে হইবে না। ১২ বৎসরে যে ছাত্র 'আই সুগার ইউ' মার্কা ইংরেজী

www.pathagar.com

শিখিয়াছে সে কি এই ৪০ দিনে ইংরেজী শিখিয়া পাউন্ড ষ্টার্লিং আনিতে সমর্থ হইবে?

সকলকে ইংরেজী শিখিতে হইবে এবং না শিখিলে শিক্ষা 'বম্বপটাশ' হইয়া যাইবে এই আবিষ্কার কোথা হইতে আসিল? চীন, জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে সকলে ইংরেজী শিখিয়া কি 'বাঘ' হইয়াছে?

বাজার অর্থনীতির জন্য হাজার উদাহরণ আনিতেছি। এই অর্থনীতি বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। এই শিক্ষার জন্য কতটুকু ইংরেজী কত সময়ে কিভাবে শিখাইব ইহার ব্যবস্থা না করিয়া পুনরায় 'ইংরেজীর ভূত্' সকলের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার কোন যুক্তি নাই।

আরো মজার বিষয় হইল, বি,এস-সি ক্লাশে বাংলা ও ইংরেজী চালু করা হইয়াছে। বিজ্ঞান শিক্ষার যুগে আজকাল বিভিন্ন কলেজে বি,এস-সি ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা খুবই কম। শুধু উহা নহে চট্টগ্রামে বি এস-সি কলেজের সংখ্যা হাতে গণনা করা যায়। বি এস-সি ক্লাশে এই ইংরেজী বাংলা বিষয় চালু হওয়াতে ইহা হইয়াছে। 'উচ্চমাধ্যমিক মার্কা স্নাতক বিজ্ঞান' ক্লাশ অর্থাৎ ইহাও এক প্রকার 'হাঁসজারু' বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

শতকরা ৭০ ভাগ মানুষকে নিরক্ষর রাখিয়া উপরদিকে ইংরেজী টোপর চাপাইয়া 'পাকা ছাত্র' বানাইবার এ প্রয়াস অবশেষে 'টিক মার্কা' পরীক্ষার মত অসার হইয়া পড়িবে।

ডিগ্রী ক্লাশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়াছে ইহার নম্বর ব্যবস্থা সম্পর্কে ভীতিময় ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রীতিময় ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য ইহার একটি ব্যাখ্যা দিলে পরীক্ষার্থীরা একটু খুশী হইতে পারিত। পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্নে লেখা থাকিত সুন্দর হাতের লিখার জন্য অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়া হইবে (কখনো কখনো ৫ নম্বর।)

একদা ধর্ম বিষয়ের জনৈক শিক্ষক একজন ছাত্রকে ১০০ নম্বরের মধ্যে ১১০ নম্বর প্রদান করিলেন। শিক্ষক মহোদয়ের এহেন কাণ্ড দেখিয়া প্রধান শিক্ষক সেই শিক্ষক মহোদয়কে তলব করিলেন।

প্রধান শিক্ষক ঃ আপনি এই খাতায় ১১০ নম্বর দিলেন কেন?

শিক্ষক কহিলেন, ১০ নম্বর হাতে রাখিব কেন উহা পুরাপুরি দিয়া দিলাম।

ডিগ্রী ক্লাশের ইংরেজী বিষয়টি কি ঠিক করুন। ইহা হয় বাধ্যতামূলক না হইলে অতিরিক্ত বিষয় করুন। 'হাঁসজারু মার্কা' বিষয় করিলে অনূর্ধ্ব ১০ নম্বর যোগ করিতে যাইয়া ধর্ম বিষয়ের শিক্ষকের মত ক্ষেত্র বিষয়ে ১১০ মার্কা নম্বর ফর্দ তৈয়ার হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

❐ ১২ই এপ্রিল, ১৯৯৬

www.pathagar.com

ব্যাকরণ ও ব্রহ্মদৈত্য

(এক)

আমরা অন্য কিছুকে ভয় না করিলেও ব্যাকরণকে ভয় করি। ব্যাকরণ ভীতি লইয়া আমাদের দেশে বহু গল্প প্রচলিত আছে। একদা জনৈক বৈয়াকরণ পণ্ডিত নৌকাযোগে নদী পার হইতেছিলেন। তিনি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে মাঝি, তুমি কতটুকু লেখাপড়া শিখিয়াছ? মাঝি রসিকতা করিয়া কহিলঃ পণ্ডিত মহাশয়, আমি ৭ ক্লাশের জন্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারি নাই। উক্ত পণ্ডিতের ব্যাকরণের জ্ঞান থাকিলেও কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। তিনি মাঝির রসিকতা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মাঝির সহিত ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্র লইয়া আলোচনা শুরু করিলেন। তিনি কহিলেন, ধ্বনিতত্ত্ব সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত উচিত। নহিলে তোমরা সর্বদাই ভুল করিয়া বসিবা।

www.pathagar.com

যেমন–'ক' স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি আর 'খ' হইল স্বল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনি। 'গ' মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি, 'ঘ' মহাপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি। এই ঘোষ-অঘোষ, স্বল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ বুঝিতে না পারিলে কি অসুবিধা হইবে জান?

মাঝি কহিল, না মহাশয়।

তখন পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, এই ধ্বনিজ্ঞান না থাকিলে 'কবর' 'খবর' হইবে, খবর কবর হইবে, খোঁড়া খোড়া হইবে। এই রূপ কহিয়া পণ্ডিত মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

মাঝি কহিল, মহাশয় আমি ধ্বনি বিজ্ঞান ব্যাকরণ বুঝিতেছি না, বুঝিতে পারিব না এবং বুঝিতেও চাহি না।

ইহা শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি কহিলেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিলাম যে, ব্যাকরণ না জানা ও না বুঝার জন্য তোমার জীবনের দশ আনাই বৃথা। এমন সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেল, ঝড় আরম্ভ হইল। নৌকা দুলিতে লাগিল। নদীর বড় বড় ঢেউ নৌকার সহিত আছাড় খাইয়া ভাঙ্গিতে লাগিল।

মাঝি কহিল, পণ্ডিত মহাশয়, আপনি কি সাঁতার জানেন? পণ্ডিত কহিলেন, না, সাঁতার জানি না।

তখন মাঝি এক গাল হাসিয়া কহিল, তাহা হইলে আপনার জীবনের ষোল আনাই বৃথা।

(দুই)

ব্যাকরণ সম্পর্কে আর একটি কাহিনী হইল, জনৈক বৈয়াকরণ কহিলেন যে, ব্যাকরণ জানা থাকিলে বাঘের ভয় নাই বরং বাঘ উল্টা মনুষ্যকে ভয় করিবে। 'বাঘ' শব্দটি কিভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে উহা সঠিকভাবে জানিতে হইবে। তিনি আরো কহিলেন, ব্যাকরণ সম্যকভাবে জানিলে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট মানুষকে কাবু করিতে পারিবে না। যম ভূত মানুষের ভয়ে দূরে পলায়ন করিবে। তিনি কহিলেন, বাঘ হইল বি পূর্বক আ পূর্বক 'ঘ্রা' ধাতুর 'ক'।

পণ্ডিতের এহেন ধাতু বিশ্লেষণ কাহারো মনঃপুত হইল না। কেহই তাহার তত্ত্ব মানিতে রাজী হইল না। পণ্ডিত মহাশয় তাহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। জোরে জোরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন–বাঘ হইল 'বি' পূর্বক 'আ' পূর্বক ঘ্রা ধাতু–।

www.pathagar.com

এই ব্যাকরণ তত্ত্ব লইয়া পণ্ডিতবর যখন জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন এক প্রকাণ্ড বাঘ বিকট চিৎকার করিয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। বাঘ যতই তাহার দিকে আগাইতেছিল, তিনিও ততই আরো জোরে জোরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন–বি পূর্বক–। বাঘ পণ্ডিতের ব্যাকরণতত্ত্ব বুঝিতে আদৌ উৎসাহী ছিল না। তাই তাহার উচ্চারণের প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করিল না। বাঘ স্বভাববশতই ব্রাহ্মণকে গিলিয়া খাইল।

(তিন)

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। সেই উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তরে কাননঘেরা বাড়ীর এক অতিশয় বদনাম ছিল। কেহই সেই বাড়ীর ভিতরে যাইয়া প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিত না। উহার কারণ সেই বাড়ীতে এক ব্রহ্ম দৈত্য বাস করিত। সেই দৈত্য ছিল ভয়ংকর। তাহাকে দেখিবামাত্র মানুষের দাঁতকপাটি লাগিয়া যাইত। সেই দৈত্যের কাজ ছিল একটিঃ সে পানিনির ব্যাকরণ হইতে ওজনী ওজনী ব্যাকরণের শব্দযোগে মানুষকে প্রশ্ন করিত। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই ভূতকে কেমন করিয়া ওই হানাবাড়ী হইতে তাড়াইবেন উহা লইয়া ভাবিত হইলেন। এমন সময় ডাক পড়িল সভাকবি কালিদাসের।

রাজা কহিলেনঃ ওহে কবিবর, আমাদের হানাবাড়ী হইতে ব্যাকরণের ভূতকে আপনি কি তাড়াইতে পারিবেন?

কবি কালিদাস আধুনিক মস্তানের মত বুকে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, বিলক্ষণ পারিব।

কালিদাস যে সময় সেই বাড়ীতে গমন করেন, সেই সময়টা ছিল প্রাবৃট যামিনী অর্থাৎ বর্ষাকালের অমাবস্যার রাত। ঘোর অমাবস্যার রাত্রে খাঁটি খড়মের চটাং চটাং বিকট আওয়াজ তুলিয়া সেই ব্যাকরণভূত কবি কালিদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কবি কালিদাস ছিলেন অকুতোভয়। ব্যাকরণভূত পানিনির ব্যাকরণ হইতে কঠিন কঠিন প্রশ্নবাক্য কালিদাসের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কালিদাস দৈত্যের সেই প্রশ্নের উত্তর তাড়াতাড়ি প্রদান করিয়া ব্যাকরণের সেই ভূতকে পরাজিত করিলেন। ব্যাকরণের সেই ব্রহ্মদৈত্য কালিদাসের নিকট হারিয়া গিয়া আর উজ্জয়িনী নগরীতে প্রবেশ করে নাই। কথিত আছে যে, সেই ভূত পালাইয়া যাওয়ার ফলশ্রুতি হইল কালিদাসের কালজয়ী কবিতার প্রকাশ। ব্যাকরণভূতের অনুপস্থিতির জন্য কালিদাস 'মেঘদূতে'র মত কাব্য রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

(চার)

আমরা আমাদের দেশে কালিদাসের মত এমন কোন সাহসী মানুষের দেখা পাইলাম না যিনি আমাদের সাহিত্যে বিরাজমান ব্যাকরণের কানা ভূতকে সাহসের সহিত দাঁড়াইয়া তাড়াইয়া দিতে পারেন। আমরা ভূতকে তাড়াইতে পারিলাম না বরং ব্যাকরণ পণ্ডিতের দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া সকলে দারুণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছি। অথচ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি বাংলা ভাষা এখন কবির শুধু কবিতা নহে বা দেওয়ালে টাঙ্গানো কোন বিমূর্ত ছবিও নহে। ইহা বর্তমানে শিক্ষা ও কর্মের ভাষা। ইহা আমাদের জাতীয় ভাষা। বাংলা ২০ কোটি মানুষের মাতৃভাষা। অন্যান্য দেশের মানুষের এই ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলাম। এই ভাষা আমাদের ১২ কোটি মানুষের জাতীয় ভাষা।

বাংলাদেশের সম্মান ও গৌরবের প্রতীক সামরিক বাহিনী। এই সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও কুচকাওয়াজের ভাষা হইল বাংলা। এই বাংলা শব্দ লইয়া আমাদের সাহসী জোয়ানগণ যখন বুক ফুলাইয়া আগাইয়া যায়, তখন আমাদের বুকও ফুলিয়া উঠে। আমাদের এই মাতৃভাষা বাংলা যখন আগাইয়া যাইতেছে, তখন ব্যাকরণ পণ্ডিতদের ভয়ের কারণে শিক্ষার্থীরা নুনা-অনুনা বাংলা ভাষার খিচুড়ি খাইয়া কোন প্রকারে প্রাণধারণ করিয়া আসিতেছে।

যেমন, খাঁটি গরুর দুধ, রহিমা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। আমাদের নিকট খাঁটি দুধের পরিবর্তে খাঁটি গরুর প্রয়োজন বেশী হইয়া পড়িল। অথচ খাঁটি দেশীয় গরু যত দুধ দিতে পারিবে, ভেজাল বা শংকর জাতীয় গরু তাহার অধিক দুধ দিতে সক্ষম। খাঁটি দেশীয় গরু অপেক্ষা ভেজাল বা শংকর গরুর মূল্য অনেক বেশী। অপরদিকে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সাবালিকা ও যুবতী, বিধবা, বিবাহিতা বা বেঁটে বালিকা পড়িতে কোন বাধা নাই। তবু উহা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় রহিয়া গিয়াছে। কোর্ট বিল্ডিং এর পাদদেশে নিউ মার্কেট নির্মিত। নিউ মার্কেটের নামকরণ করা হইল 'বিপনি বিতান'। বিপনি বিতান শব্দের অর্থ হইল দোকানের সারি। প্রথমে অনেকে এমন ওজনী শব্দটি মুখে আনিতে ভয় পাইতেন। এখন উহা সহজ হইয়া গিয়াছে এবং ইহাকে অনুকরণ করিতে গিয়া ওই শব্দ 'খিচুড়ি রূপ' গ্রহণ করিয়াছে। যেমন, 'সুলভ বিতান, 'সাগরিকা বিতান' 'শ্যামসুন্দর বিতান'ও হইয়াছে।

বাংলায় সমাস কয়টা হইবে ইহা এখনও ঠিক হয় নাই। কেহ বলিয়া থাকেন ছয়টি, কেহ পাঁচটি। আবার কেহবা বলেন চারিটি। সমাসের প্রকার লইয়া এইরূপ বাক-বিতণ্ডা চলিতেছে। অথচ সমাস আমাদের শব্দ তৈয়ারীর এক বিরাট কারখানা। কিন্তু এই কারখানার আকার এখনও আমরা ঠিক করিতে পারি নাই।

www.pathagar.com

ডঃ শহীদুল্লাহ ও এনামুল হকের মত বৈয়াকরণদের ব্যাকরণ বিষয়ক পুস্তক কলেজ ছাত্রদের পাঠ্য তালিকায় থাকিলেও তাহাদের পুস্তকসমূহ বাজারে খুব বেশী পাওয়া যায় না। ছাত্রদের কথা বাদ দিলাম। অনেক শিক্ষকের বাড়ীতেও এই বই নাই। এই বই না থাকিবার কারণ হইল, এইসব বই হইতে পরীক্ষায় কালেভদ্রে কোন প্রশ্ন আসিয়া থাকে। পরীক্ষকগণ এই পণ্ডিতদের বাদ দিয়া হবু পণ্ডিতদের বাজারী কিতাব হইতে প্রশ্ন করিয়া থাকেন। যাহারা বাংলা ব্যাকরণ উন্মুক্ত বাজারের বন্যায় বাজারজাত করিয়াছেন, তাহাদের ঠেলাঠেলিতে বাংলা ব্যাকরণ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আমলের ব্যাকরণভূত হইয়া আমাদের কোমলমতি ছাত্রদের প্রতি মুখ খিঁচাইয়া বিকট দন্ত বিকশিত করিয়া ব্যাকরণের ভয় লাগাইতেছে। ফলে তাহারা ব্যাকরণের ভূত দর্শনে মূর্ছা যাইতেছে।

তাই অনেকে কহিতেছেন–বাংলা বড় শক্ত। আর এই সুযোগে ইংরেজী মাধ্যম, কিন্ডার গার্টেন স্কুলসমূহ উন্মুক্ত বাজারের মৌসুমে উজাড় করিয়া নিতেছেন অভিভাবকদের অর্থ।

বাংলা ব্যাকরণ কি নাই? উহা কি অবৈজ্ঞানিক? এই ব্যাকরণ কি আমাদের ভাষাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে? না, আমাদের ব্যাকরণ আমাদের চলার পথকে স্তব্ধ করিতে পারে নাই। ব্যাকরণ যে প্রয়োজন উহা বুঝিতে পারি নাই।

বাংলা কবিতার পয়ার একদা আমাদের প্রকাশকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত আসিয়া সেই পয়ারের বেড়ীকে ভাঙ্গিলেন। এই বন্ধন ছিন্ন করিবার মূলে ছিল মধুসূদনের সাহস ও শ্রম।

আমরা বাংলা ব্যাকরণের দোষ খুঁজিতেছি। কিন্তু ইহাকে 'সহজভাবে' বুঝাইয়া দাঁড় করাইতে কেহই আগাইয়া আসিতেছি না।

ব্যাকরণ শব্দের তথা ভাষার পোষ্টমর্টেম নহে, ভাষাকে একটি নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে প্রকাশের এক মহাশক্তি।

উজ্জয়িনী নগরীতে নহে, আমাদের বেতার, টেলিভিশনেও ব্রহ্মদৈত্য ভূত ঢুকিয়াছে। ইহাকে তাড়াইতে হইলে চাহি একজন কালিদাসকে। কবি কালিদাসের মত সাহসী পুরুষ না হইলে পানিনি ভুল হইবে। আর পাতঞ্জলী খোঁড়া হইয়া আমাদেরও খোঁড়া করিয়া রাখিবেন।

(গ্রন্থ সহায়ক ঃ অর্থ জানো, দেব)

– ২রা এপ্রিল ১৯৯৩ ইং

www.pathagar.com

তরুণরা কি স্বপ্ন দেখে?

একদা বাল্যকালে ষ্টিফেন্সন দেখিতে পাইলেন যে উনানের কেতলীর ঢাকুনী নাচিতেছে। তিনি তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, কেতলীর ঢাকুনী কে নাচাইতেছে? মাতা পুত্রকে কহিলেন, পড়, জানিতে পারিবে।

আমরা বাল্যকালে বড় বড় আওয়াজ করিয়া পড়িতাম। প্রাইমারী স্কুলেও নামতা দল বাঁধিয়া উচ্চারণ করিতাম।

চট্টগ্রামে ডঃ মুহম্মদ ইউনুস সম্বর্ধনা সভায় জানাইলেন যে তিনি বাল্যকালে জোরে জোরে পড়িতেন।

পাড়ায় পাড়ায় এখন পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়িলেও পড়ার আওয়াজ বাড়িতেছে না। পাড়ায় পাড়ায় এ আওয়াজ 'গেঁয়ো' ও সেকেলে হইয়া গিয়াছে। এখন ভিডিও ক্যাসেটের আওয়াজ হইল পাড়ায় ও ঘরের আভিজাত্যতা। যন্ত্র আমাদের নব জীবনের মন্ত্র না শিখাইয়া যন্ত্র এখন আমাদের যাতনা বৃদ্ধি করিতেছে।

www.pathagar.com

একদা জনৈক কিশোরকে পাড়ার এক মুরব্বী কহিল, ওহে তুমিত স্কুলের ছাত্র, তুমি আমাকে একটি পত্র লিখিয়া দাও। কিশোরটি কহিল, মুরব্বীজান, আমার পায়ে অসুখ। মুরব্বী কহিল, তুমি হস্তদ্বারা পত্র লিখিবে, পদের কিবা প্রয়োজন রহিয়াছে। কিশোর কহিল, মুরব্বীজান, আমার হস্তলেখা অপাঠ্য, যাহাকে পত্র দিবেন তাহার বাড়ীতে গমন করিয়া আমার দ্বারা লিখিত পত্র তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে।

টিক্ মার্কা পরীক্ষার জমানা আর বেশী দিন চলিলে কোন নিরক্ষর মুরব্বী যদি কহে, আমাকে একটি পত্র লিখিয়া দাও, উত্তরে টিক্ মার্কায় স্টার পাওয়া সন্তান কহিবে, মুরব্বী আপনি শিখুন আমি টিক্ মার্কা প্রদান করি!

আমাদের দেশের সন্তানগণ পাঠবিমুখ হইল কেন? বর্তমানে পাঠের জন্য যে সামগ্রী তথা বই পুস্তক পাওয়া যায় পূর্বে টাকা দিয়াও উহা পাওয়া যাইত না। একটি ইংরেজী অক্ষর না শিখিয়াও একজন মাঝারী সাইজের পণ্ডিত হইতে পারিবে, তবে পড়িতেছে না তেমন নহে। বৃহত্তর মানুষের সন্তানগণ এই সুযোগ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। যাহারা বিনা মূলধনে উপদেশ খয়রাত করিতেছেন তাহারাও প্রকৃতপক্ষে নতুন প্রজন্মকে প্রতারিত করিতেছেন। আগেকার দিনে সামন্তগণ যেমনি সাধারণ মানুষকে প্রতারিত প্রবঞ্চিত করিত, উঠতি ধনিক বণিকগণ নানানভাবে নূতন প্রজন্মকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করিতেছে।

'কেন' শব্দটির ভিতর দিয়া মানুষের চিন্তা বিকশিত হইয়াছে। আজিকার জীবনে যে ঐশ্বর্য আসিয়াছে উহা অসংখ্য 'কেন'র অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি। আপেল মাটিতে পড়ে কেন! এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে যাইয়া নিউটন মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিস্কার করিয়াছিলেন।

ঢিল ছুঁড়িলে পানি কাঁপে কেন? এর উত্তরে শব্দের তরঙ্গ আবিস্কৃত হইল, আবিস্কৃত হইল গ্রামাফোন, বেতার ইত্যাদি।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সূর্যকে প্রথমে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সৃষ্টিকর্তা ডুবে কেন? এর উত্তর খুঁজিতে গিয়া তিনি তাঁহার আরাধ্য সৃষ্টিকর্তার সন্ধান খুঁজিয়া পাইলেন। এই 'কেন' একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গিয়া বহু বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নব জীবনের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন অসংখ্য কেন'র ভিতর দিয়া আসিয়াছে। লাহোর প্রস্তাবের Two States এ S বাদ দেওয়া হইল কেন? তৎকালীন

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দু কেন চাপাইয়া দেওয়া হইল, যে উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলের মাতৃভাষা ছিল না? এই কেন'র ভিতর দিয়া আমাদের চেতনার উন্মেষ হইল–আমাদের নিজস্ব স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র চাই। রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনিলাম।

আজ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বর্তমানে আমাদের অনেক কেন আছে কিন্তু এর উত্তর নাই। কেন কৃষক ফসলের মূল্য পায় না? শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য কেন? বেকারের মিছিল কেন দীর্ঘতর হইতেছে? প্রত্যক্ষ উন্নয়ন পরিকল্পনা নাই কেন, বন্যার সহিত দুঃখের অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকিতে হইবে কেন? বন্যা কি এতই দুর্জ্ঞেয়? রোগে চিকিৎসা পাইব না কেন? বিজ্ঞানের মহা অগ্রগতির যুগে দুই মুঠো ভাত পাইব না কেন? বিচারের জন্য অর্থ ও দীর্ঘ সময় ব্যয় কেন? সাংসদ বৃন্দ বিনা শুল্কে গাড়ী আনিবে কেন? গুঁড়ো দুধ পচিয়া জমাট বাঁধিল কেন?

বাংলাদেশে বর্তমানে 'কেন' তালিকা প্রণয়ন করিলে একটি ছোট ডিকশনারী সৃষ্টি হইয়া যাইবে? তাই আমি কেন'র তালিকা বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জবাবদিহিতার কথা জোরে জোরে বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কেন'র জওয়াব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাকিস্তান আমলে দেখা গিয়াছে 'কেন'র উত্তর চাহিলে 'দুশমন' বনিয়া যাওয়া হইত।

পাক-আমলের সেই তিক্ত স্মৃতি এখনো রহিয়াছে বলিয়া অনেকে চোখ খুলিয়া মুখ বুঁজিয়া রহিয়াছেন।

পূর্বে লোকে সত্য কহিত, অপ্রিয় হইলেও সত্য বলিত। বর্তমানে সত্য বলিব, তবে অপ্রিয় সত্য বলিব না। সত্য বলিব, ডান বাম রাজপথ ও রাজভবনের দিকে নজর দিয়া বলিব।

আমাদের এহেন আত্ম প্রতারণা সংক্রামক রোগের মত আমাদের সন্তানদের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। এই সংক্রামক রোগ আগ্রাসী প্রজন্মকে সৃষ্টিশীল তরুণ হইতে বাধা প্রদান করিবে।

আমাদের কবি একদিন অহংকার করিয়া কহিয়াছিলেন, 'যৌবন যার যুদ্ধে যাবার সময় তার'। সেই অহংকারের দীপ্ত উচ্চারণ কি আমরা দেখিতে পারি? এর উত্তর হইবে 'না'।

www.pathagar.com

বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আগামীর তরুণদের সৃষ্টিশীল সত্ত্বাকে হত্যা করা হইতেছে। যাহাদের বিত্ত আছে তাহারা তাহাদের সন্তানদের বিদেশে প্রেরণ করিয়া সান্ত্বনা খুঁজিতেছে। কিন্তু সব তরুণকে কি বিদেশে পাঠানো সম্ভব হইবে? এর উত্তর হইবে 'না'। ছোটদের পাঠ্য পুস্তকে হাঁ ও না বা বর্তমানে সঠিক উত্তরের জন্য টিক মার্ক দেওয়ার রেওয়াজ হইয়াছে। এখন আমরা কোথায় টিক্ মার্ক দিব। সব প্রশ্ন এক, সব উত্তর এক হইয়া গিয়াছে।

মাছে-ভাতে বাঙ্গালীকে ডাল-ভাতের স্বপ্ন দেখানো হইতেছে। স্বপ্নের কথা বলিতে হইলে স্বপ্নের একটি কাহিনী বলিতে হয়।

একদা তিন ভিক্ষুক কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া এক বৃক্ষের নীচে উপবেশন করিল। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে তিনজন নিদ্রা যাইবে এবং নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার পর যে উত্তম স্বপ্নের কথা বলিবে সে-ই উক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিতে পারিবে। ঘুম হইতে জাগিয়া একজন কহিল, আমি ৪র্থ আসমানে গমন করিয়া অনেক পরীর সাথে গান গাহিয়াছি। দ্বিতীয় জন কহিল, আমি ৫ম আসমানে যাইয়া ফুলের বাগানে ফুল দেখিয়াছি। তৃতীয় জন কহিল, তোমরা যখন আসমানে আসমানে বিচরণ করিতেছিলা তখন এক দুষ্ট লোক আসিয়া আমাকে লাঠির আঘাত করিয়া কহিল, এই ব্যাটা এই খাবারগুলো খেয়ে ফেল। তা না হলে তোকে মেরে ফেলব।

দুই বন্ধু কহিল, তখন তুমি কি করিলে? তৃতীয় বন্ধু কহিল, আমি খাবারসমূহ খাইতে লাগিলাম।

দুই বন্ধু কহিল, আমাদের ডাকিলে না কেন? তৃতীয় জন কহিল, আমি ডাকিয়া ছিলাম, কিন্তু ৪র্থ ও ৫ম আসমানে সে আওয়াজ পৌঁছে নাই।

আমরা যাহারা উত্তম স্বপ্ন দেখিয়া খাদ্য খাইতে বাসনা করিয়াছি–আমাদের ভাগ্যে তেমনি আসমানে বিচরণ চলিতে পারে, কিন্তু খাদ্য ভক্ষণ সম্ভব হইবে না। মিথ্যুক সকল খাবার ছিনাইয়া লইবে।

মিথ্যা স্বপ্ন ও প্রলোভন যাহাতে নতুন প্রজন্মকে গিলিয়া খাইতে না পারে এর জন্য প্রয়োজন তাহাদের সঠিক 'কেন', তথা জীবন জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করা। আজ জীবন জিজ্ঞাসার বড়ই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা একটি বস্তুগত সত্ত্বা, এই সত্ত্বা জীবন জিজ্ঞাসার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

❐ ১০ ই সেপ্টেম্বর, '৯৩

www.pathagar.com

দেবদাসের নসিহত

বৃটিশরা ভারত জয় করিবার পর মহামুশকিলে পড়িয়া গেল। অভিজাত সিংহকে কেন মানুষ মানিতে রাজী হইতেছে না উহার জন্য তাহারা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল।

সরেজমিনে ইহার হেতু বাহির করিবার জন্য একটি কমিশন প্রেরণ করা হইল। কমিশনের সদস্যবৃন্দ ঘরে ঘরে গমন করিলেন। সঞ্চয় করিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া বৃটেনের রাজদরবারে প্রেরণ করিলেন।

রিপোর্টে বর্ণনা করা হইল যে সাহেবগণ গ্রামের অতি সাধারণ মানুষের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু যে গৃহের তৈজষপত্র যাহা তাহারা স্পর্শ করিত উহা তাহারা বাহিরে নিক্ষেপ করিত। এই ঘটনার উপসংহার করিতে যাইয়া কলিন কহিল, ইহারা বড়ই আত্মাভিমানী। ইংরেজদের স্পর্শ পর্যন্ত সহ্য করিতে রাজী নহে। অপর একটি দৃশ্য দেখিল (যাহা দেখিয়া তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল), সেই দৃশ্যটি হইতেছে–ইহারা ক্ষুধাকে নির্বিকারে সহ্য করিতে পারে। দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্য গুদাম, খাবার দোকানে কোন প্রকার হাঙ্গামা করে না। পৃথিবীর ইতিহাস ক্ষুধার হইলেও আমরা এই উপমহাদেশের মানুষগণ ক্ষুধা লইয়া মরিয়া যাইতে রাজী আছি, কিন্তু ক্ষুধা মুক্তির জন্য 'বড় ধরনের' কিছু করিতে রাজী নহি।

এই উপমহাদেশে পাকিস্তান ভারত ক্ষুধা মুক্তিতে আগাইয়া গেলেও আমরা এখনো বৃটিশ আমলের ক্ষুধা সহ্য করিয়া যাইতেছি। ক্ষুধার ঐতিহ্য বহাল রাখিয়াছি। যাহাদের চরম ক্ষুধা রহিয়াছে তাহাদের যন্ত্রণা থাকিলেও তাহাদের

www.pathagar.com

জাগিবার, জাগাইবার মন্ত্রণা নাই। যাহারা ছলে বলে ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছে তাহাদের ক্ষুধা শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শুধু ইহা নহে জৌলুসের বাহার দেখাইতে তাহারা নব নব যাত্রাপথ সৃষ্টি করিয়া থাকে। শাহজাহান বাদশার তাজমহল পত্নীপ্রেম হইতে বড় হইয়াছে তাহার জৌলুস বৃদ্ধির চেষ্টা। তিনি শুধু তাজমহল নহে দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাসও নির্মাণ করিতে কসুর করেন নাই।

দেওয়ানী খাসে লিখা ছিল–

আগর ফেরদৌস বরবৈয়ে জমিনাস্ত
হামিনাস্ত, হামিনাস্ত, হামিনাস্ত।

পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে তবে উহা এইখানে, এইখানে, এইখানে।

তাহার ময়ুর সিংহাসন কম জৌলুসের কাজ কারবার নহে।

পৃথিবীর অন্যতম ধনী হইলেন আগা খান। বর্তমান আগা খানের দাদা ঠাকুর সম্পদশালী ছিলেন। কথিত আছে তিনি তাহার সম্পদের জৌলুস দেখাইতে বহু ঘটনা করিয়াছেন এবং ইহা লইয়া বহু গল্প কাহিনীও প্রচলিত আছে। একদা তিনি বিলাতে টেলিগ্রাম অফিসে যাইয়া কহিলেন– মাস্টার সাহেব, এই ডিকশনারীটা আমি টেলিগ্রাম করিব। পোস্ট মাস্টার হতচকিত হইলেন। এতবড় ডিকশনারী টেলিগ্রাম করিতে ৩ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আগা খান কহিলেন– কুছপরোয়া নেই।

আর একটি কাহিনী হইল–একদা তিনি ট্রেন ভ্রমণ করিতেছিলেন। ট্রেনের শিকল অযথা টানিলে ২০০ টাকা জরিমানা। কতটুকু যাইয়া ট্রেনের শিকল টানা শুরু করিলেন, গার্ড আসিয়া জরিমানা করিল। তিনি কহিলেন–এই বস্তার মধ্যে রুপার টাকা রহিয়াছে গুণিয়া নাও। এইভাবে অনেকবার শিকল টানিলেন, প্রতিবারই একই উত্তর আসিল। অবশেষে গার্ড বিরক্ত হইয়া পড়িল। এই দুইটি সংবাদ যখন বৃটেনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল তখন আগা খানের অর্থমহিমা ছড়াইয়া পড়িল। ইহা সত্য কি মিথ্যা সেই বিচার কেহ করিতে আসিবে না, তবে ইহা আদৌ সত্য কিনা সন্দেহ আছে।

কিন্তু আমাদের দেশের নব্য শাহজাহান বাদশা ও আগা খানগণ সম্পদের জৌলুস দেখাইতে এখন কার্পণ্য প্রদর্শন করিতে রাজী নহে।

চট্টগ্রামের অধিবাসীগণ মেজবান করিয়া জৌলুস দেখাইয়া থাকে, ইহা নতুন কিছু নহে। অতীতে লাইট প্যান্ডেল বয় বেয়ারা দিয়া মেজবান না করিলেও মাটির সানকীতে যে মেজবানী হইত উহা কম জৌলুসের ব্যাপার ছিল না।

এখন জৌলুসটা হইয়াছে অন্য প্রকারের। এই জৌলুস হয় নতুন মাত্রায় এবং নতুন ঢঙ্গে। নতুন ঢঙ্গটি হইতেছে আরো চাই, আরো খাই, আরো দেখাই। এই

www.pathagar.com

প্রদর্শনীতে যাদুকরগণ বেশীরভাগ আসনে ২ নম্বরী কাজ কারবার করিযা গোঁফে তা দিতে শুরু করিয়াছে। জৌলুস প্রদর্শন করিবার ক্ষেত্রে তাহারা ২ নম্বর নহে ১ নম্বরকে টেক্কা দিয়া যাইতেছে।

নিজের কামাই করা শাল হইলে মূল্যবান বলিয়া বাপের শাল দিয়া জুতার যত্ন নিয়া থাকে বলিয়া বাংলাদেশে গল্প কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে।

'সম্পদ' প্রদর্শনের অহেতুক পাগলামী কোথায় দাঁড়াইবে উহা ওই নির্বোধবৃন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। মানুষের মন বড়ই শক্ত। ইহা নরম হয় গরম হয়। যখন নরম হয় তখন কাদামাটির চাইতেও অনেক বেশী নরম হইয়া পড়ে। যখন শীতল হয় তখন বরফের চাইতে অধিক শীতল। আবার গরম হইয়া উঠিলে উহার তাপ হিরোসিমা নাগাসাকিতে পতিত এটম বোমার তেজ হইতে অধিক বেশী উত্তপ্ত হইয়া থাকে। চুলার উত্তাপ প্রয়োজনে লাগে কিন্তু আণবিক বোমার আগুন সবকিছুকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

বাংলাদেশের মানুষ কখনো নরম হয় কখনো গরম হয়। গরম কত প্রকার এবং কি কি ইহা বাংলার মানুষ বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শন করিয়াছে। মনে হইতেছে এদেশের মানুষের মনের উত্তাপকে দমন করাইবার জন্য ক্ষুধা নামক যন্ত্রণাকে লেলাইয়া দেওয়া হউক।

ক্ষুধা কথা কহিতে জানে না। কিন্তু ক্ষুধার কথা ধন সম্পদের প্রদর্শনে চাপিয়া থাকিতেছে না।

সম্প্রতি কয়েকটি নব্য ধনিকের বৈঠকখানায় যাইতে আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সে বৈঠকখানায় ভারত পাকিস্তানের দৈনিক পত্রিকা নহে বৃটেন ও আমেরিকার দৈনিক পত্রিকা দেখিতে পাইলাম। জানিতে পারিলাম একদিন পর একদিন এই বিদেশী পত্রিকা সমূহ এই দেশে আগমন করিয়া থাকে। এক একটি দৈনিক পত্রিকার দাম মাত্র ৬০/৬৫ টাকা। ইহা এমন কিছু নহে। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায় উহা লালন ফকির সব সাধনা করিয়াও বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া লালন কোন জাতের উহার পরিচয়ও চির রহস্যে রাখিয়া গিয়াছেন।

ধনের নব সম্রাটবৃন্দ নিজেরাই জানে না তাহাদের 'অর্থ ক্যামনে আসে যায়' তাহারা জাল বিছাইয়া রাখিয়াছে তাহাদের ভাগ্যের মাছ আকাশ হইতে বর্ষিত হইয়া তাহাদিগকে চির হরষিত রাখিয়াছে।

বিদেশী প্রচার মাধ্যম দেশে তরতাজা আসিবে উহা চমৎকার সংবাদ। বর্তমান সংবাদপত্রের গুরু হইলেন যাহারা তাহাদের পত্র পাঠ নিঃসন্দেহে মগজে চর্বি গজাইবার মত ঘটনা।

www.pathagar.com

বিদেশের জ্ঞান আহরণ করিয়া স্বদেশে আসিয়া এদেশিরা বিদেশীদের ঠাণ্ডা করিয়াছেন। বিলাতী ব্যারিস্টার গান্ধী, জিন্নাহ, বিলাতী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সুভাষ বোস, জে.এম. সেনগুপ্ত, সি আর দাশ, বিলাতী বি.সি.এল. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ তাঁহারা বিলাত হইতে 'মগজ' আনিয়া বিলাতীর বাপদাদার শ্রাদ্ধ করিয়া বিলাতীদের বিলাই বানাইয়া বিলাতে ফেরত পাঠাইতে বিলম্ব করেন নাই। বিদেশী দৈনিক পত্রিকার ড্রয়িংরুম হইতে কি কোন স্বদেশী কল্যাণবার্তা বহিয়া আনিবে?

ভুল করিয়া চুন খাইয়া মুখ পোড়াইয়াছি, তাই লক্ষ্মীপুরের এক নম্বর মহিষের দই দেখিয়া ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিতেছি। এই অধম নিবন্ধকারে কথায় বিদেশী দৈনিক বন্ধ হইবে না, এই নিবন্ধ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই।

ওই সব বৈঠকখানার সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গের নিকট এই নিবন্ধের কোন সহৃদয় পাঠক দয়া করিয়া করজোড়ে করা আমার এই মিনতি পাঠাইয়া দিলে বড়ই বাধিত হইব। এই অধমের মিনতি হইল–দয়া করিয়া ওই পত্রিকা ড্রইং রুমের শোভা বর্ধন না করিয়া এক আধটুকু পড়ুন এবং আমাদের দেশের কথা একবার ভাবুন।

বাংলার অমর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার দেবদাস উপন্যাসের সমাপ্তিতে লিখিয়াছিলেনঃ

তোমরা যে-কেহ এ কাহিনী পড়িবে হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবুও যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও, প্রার্থনা করিও আর যাহাই হোক যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌছে যেন একটি করুণাদ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারো একফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।

আমরা মরিব ক্ষুধার যন্ত্রণায়। তবে আপনারা মৃত্যুকালে একটু স্নেহের স্পর্শ প্রদান করিলে ধন্য হইব। ওই পত্রিকা রাখার ভড়ং না করিয়া একবার গভীরভাবে পত্রিকাগুলি পাঠ করিলে নিজে ধন্য হইবেন আমরা ধন্য হইব। আমাদের মৃত্যুকালে আমরা স্নেহের স্পর্শ পাইব। জীবনে মালা না পাইলে মরণে ফুল পাইবার বোকা আশা এখনো পোষণ করিতেছি। আশা নিজেই কুহকিনী, তাইত আশা ধন্য। এই 'ধন্যবাদ' লইয়া মরিতে বড়ই আশা করিতেছি। আশার মালা বারবার ছিঁড়িয়া গেলে উহা ঘঁটিতে কার্পণ্য করিব না।

❐ ৮ই এপ্রিল '৯৪

www.pathagar.com

প্রলাপ, সংলাপ ও ছাগলামী

আলাপ, প্রলাপ ও সংলাপ এই তিনটি শব্দের সহিত 'কথা' কথাটির যোগসূত্র থাকিলেও সংলাপের মর্যাদা আলাপ ও প্রলাপ হইতে বেশী।

আলাপ হইল শুধু কথাবার্তা, সম্ভাষণ, পরিচয়, জানাশোনা, কথন, বাচন, ভাষণ ইত্যাদি, যেমন–তিনি আলাপ করিতে চাহেন (কথা বলা অর্থে), তাহার সহিত আমার আলাপ আছে (পরিচয় অর্থে), তিনি আলাপ করিবেন ইত্যাদি। সঙ্গীতে আলাপ আছে কিন্তু সংলাপ বা প্রলাপ নাই।

প্রলাপ হইল অর্থহীন কথাবার্তা, মাথার দোষ থাকিলে যে কথা মুখ হইতে নিঃসৃত হয় উহাকে প্রলাপ বলে। জ্বরের ঘোরে এমনকি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াও মানুষ যে অর্থহীন কথা বলে উহাকে প্রলাপ বলে। প্রলাপের ঐতিহ্য আমাদের কম নহে।

www.pathagar.com

সাহিত্য, রাজনীতি, কূটনীতি, ব্যবসা বাণিজ্যে এমন কি প্রেম নিবেদনে সংলাপের বিরাট গুরুত্ব রহিয়াছে। যুদ্ধ ও শান্তিতে সংলাপের ভূমিকা আছে– প্রলাপের নহে।

নাটকের চরিত্রসমূহের পরস্পরের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় উহাকে সংলাপ (Dialogue) বলে।

নাটক প্রকৃতপক্ষে সংলাপে বিধৃত সাহিত্য। সংলাপের সংহতি অতিক্রম করিলে নাটক আর নাটক থাকে না। চরিত্র, ঘটনার বিন্যাস সংলাপের চক্র। ছোট গল্প, উপন্যাস এমন কি মহাকাব্য এবং গাথা কাব্যেও সংলাপ রহিয়াছে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনকাল হইতে সংলাপের এক বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে। আমাদের সাহিত্যে অতীতে নিজস্ব জাতি রাষ্ট্র চেতনার অভাব পরিলক্ষিত হইলেও সংলাপ সৃষ্টির বিরাট ঐতিহ্য রহিয়াছে। আমাদের সাহিত্যের আদি নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের সংলাপে শ্রীরাধার মর্মযাতনা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা আমাদের সাহিত্যে আদি সংলাপ।

বাংলার চিরায়ত লোকগাথাসমূহের মধ্যে সংলাপ এক অপূর্ব সৃষ্টি। এই গাথাসমূহকে সংলাপের ফুলমালা বলা যাইতে পারে। একটি গাথা হইতে সামান্য উদাহরণ দেওয়া হইল। মহুয়া পালায় মহুয়া নদের চাঁদের দেখা পাইয়া লজ্জা পাইল, সে কহিলঃ

তুমি ত ভিন দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সাথে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি।

(ইহা তসলিমার লজ্জা নহে।) ইহার উত্তরে নদের চাঁদ কহিলঃ

জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ।
কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা।
এই দেশে আসিবার আগে পূর্বে ছিলে কোথা॥

মহুয়া কহিলঃ

নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদর ভাই
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই।।
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি,

www.pathagar.com

নিজের আগুনে আমি নিজে পুইয়্যা মরি।।

নদের চাঁদ মহুয়াকে 'বিয়া' করিবার প্রস্তাব করিলে মহুয়া কহিল ঃ

লজ্জা নাইরে নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।।

উত্তরে নদের চাঁদ কহিল ঃ

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথা পাব দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।

শুধু এ গাথায় নহে, বিশ্বের চিরন্তন সাহিত্যের সংলাপসমূহ পাঠককে এখনো উদ্বেলিত করিয়া থাকে। সংলাপ আনন্দ ও বেদনার প্রকাশ।

সংলাপে অনেককে প্রেমে উতলা করিয়াছে, আবার সংলাপ মৃত্যুকেও উপহার দিয়াছে।

সিরাজঃ তুমি মোহাম্মদী বেগ?

ঃ হাঁ, আমি মোহাম্মদী বেগ --।

এই একটি সংলাপেই সিরাজের জীবন শেষ হইয়াছিল।

সংলাপের সহিত রহিয়াছে প্রেম-বিচ্ছেদ-মৃত্যু-যুদ্ধ ও শান্তি।

রাজনীতি বিজ্ঞানের গুরু প্লেটোর 'সংলাপ' রাজনীতির আদি গ্রন্থ।

সংলাপ অহংবর্জিত হইয়া সৃষ্টির প্রেরণায় নিবেদিত হইলে সংলাপ হয় নবযাত্রার পাথেয়। আর সংলাপ যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় তবে উহা হয় সংহারের ভিত্তি। সংলাপ একদিকে প্রীতিময়, অপরদিকে ভীতিময়ও বটে।

'সংলাপে' না আসিবার কারণে পৃথিবীতে বহু রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং আগামীতেও ঘটিবে। আফগানিস্তান, রক্তাক্ত বসনিয়া, কাশ্মীর, শ্রীলংকার তামিল বিদ্রোহ, ইরান-ইরাকের যুদ্ধ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অপরদিকে ফিলিস্তিনীরা দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া যাহা অর্জন করিতে পারে নাই 'সংলাপে' উহা সহজে অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতে অবস্থানরত আমাদের উপ-জাতি ভাইদের ফেরত আনিতে 'হুমকি হইতে' সংলাপ অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়াছে।

www.pathagar.com

'কথার' নাম 'লতা', কথার কোন শেষ নাই। কথার অর্থ কত প্রকার হইতে পারে এখনো সকল অভিধান ইহার পুরা হিসাব দিতে পারে নাই। সম্প্রতি বাংলা একাডেমী হইতে প্রকাশিত এবং ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে, 'কথা'র অর্থ প্রকাশ করিতে (পাইকা ১০ হইতেও ছোট টাইপে মুদ্রিত) প্রায় দেড় পৃষ্ঠা ব্যয় হইয়াছে, কথার যেমন শেষ নাই কথার অর্থেরও শেষ নাই।

জীবনের শেষ আছে, কথার শেষ নাই। কিন্তু কথায় বলে, কথা দিয়া বাকীতে চিড়া পাওয়া গেলেও 'কথায়' চিড়া ভিজিবে না। চিড়া ভিজাইতে হইলে পানি লাগিবে।

আমাদের দেশ ছোট হইলে কি হইবে জনসংখ্যা ও জনসমস্যা অত্যন্ত বেশী?

আমাদের জীবনের সমস্যা এবং সমস্যার সৃষ্ট হতাশাকে দূরীভূত করিতে হইলে কথার হাত বাহির করিতে দেওয়া আর সমীচিন হইবে না। কথাকে লতার মত না টানিয়া সংলাপের মধ্যে জাতীয় সংহতি আনয়ন করিতে হইবে।

একদা তিনজন লোক নামাজ পড়িতেছিল। একজন কি ভাবিয়া কথা কহিয়া বসিল। দ্বিতীয় জন কহিল, ওহে, নামাজের সময় কথা কহিলে নামাজ ভঙ্গ হয়। তৃতীয় জন কহিল, তোমার নামাজও ভঙ্গ হইয়াছে। এইভাবে তৃতীয় জনের নামাজও ভঙ্গ হইল।

কথা কহিতে গেলে বিপদ আছে ইহা আমরা ঠেকিয়া শিখি।

আমাদের দেশে সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে কথার হাত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। চুপ থাকিবার সময়ে চুপ থাকিবার কথাও জোরে বলিয়া চুপ চুপ শব্দে অনেক কিছু চুপসিয়া যাইবে।

একদা এক ছাগলের বড় সখ হইল সুপারী গাছের মাথায় আরোহণ করিবার জন্য। সে সম্মুখের দুই পা তুলিয়া মনের খেদে লাথি মারিয়া যাইত। সুপারী গাছের মাথায় উঠা কি ছাগলের পক্ষে সম্ভব? ছাগল তবুও আশা ছাড়িল না।

একদা ঝড়ে সুপারী ভূতলে পতিত হইল। আর ছাগল মনের খুশীতে পতিত সুপারি গাছের মাথায় যাইয়া পা তুলিয়া নাচিতে লাগিল। যাহারা কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই করিয়া ক্ষমতায় যাইতে পারিবে না তাহারা যখন বিশাল কথা কহে তখন তাহাদের রাজনীতির নাম ছাগলামী। যাহারা ছাগলামী রাজনীতিতে আদর্শবান

www.pathagar.com

তাহারা সংলাপকে সংহত দৃষ্টিতে না দেখিয়া সংহারের দৃষ্টিতে দেখিলে আপদও নাই। এবং ইহার পরিণতি কি হইবে উহা তাহারা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না। দুই ছাড়া তিন হইলে সংলাপ ভঙ্গ আলাপ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। নিজের মুরোদ নাই অপরের গরম হাড়িতে যাহারা খৈ ভাজিতে চাহে তাহাদিগের রাজনীতিকে ছাগল রাজনীতি বলে। ছাগলামী বাংলাদেশে নহে, সকল দেশে রহিয়াছে।

দুইখানা বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ বুঝিয়াছিল যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কোন মূল্য নাই। নিজেদের বাঁচার তাগিদে যুদ্ধের শত্রুরা পর্যন্ত সংলাপে বসিল। তাহাদের এই সংলাপের নাম, ইউরোপীয় সাধারণ বাজার। যুদ্ধের পর সংলাপেই তাহাদের শত্রুতা অনেকাংশে বিনষ্ট হইল।

আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ছেলের হাতের মোয়া নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে আমরা বেশী বড় হই নাই। সংসদীয় গণতন্ত্রই বাংলাদেশের মুক্তি ও শক্তি—ইহা নতুন করিয়া বলিবার অবকাশ নাই।

নিরপেক্ষ নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের গ্যারান্টি ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্র বাঁচিতে পারে না।

আমরা সেই পাকিস্তান আমল হইতে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করিতেছি--। আর কত লড়াই করিব ---। বাঘের শক্তি থাকে বার বছর। আমরাত বাঘ নহি, মানুষ। আমাদের শক্তি আর কত থাকিবে? জনগণের শক্তি অফুরন্ত, বিশাল ও ব্যাপক।

সংলাপ যেন প্রলাপ তথা অর্থহীন না হয় সে জন্য বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী তথা সকল দেশপ্রেমিককে আগাইয়া আসিতে হইবে।

বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপদার্পণ সংলাপেরই ফলশ্রুতি। সংলাপের মাধ্যমেই এর বিকাশ সম্ভব। কে আসিল—কাহারা আসিল এই তত্ত্ব তালাসীর কোন মূল্য নাই।

চাপাবাজ ও ধান্দাবাজ মতলববাজগণ সংলাপে সন্দেহ সৃষ্টি করিতে দ্বিধা করিবে। কারণ দেশে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে চাপাবাজ, ধান্দাবাজ, মতলববাজ ও মোড়লগিরির অপমৃত্যু ঘটিবে।

❐ ১৪ই অক্টোবর '৯৪

www.pathagar.com

গরীবজাদার সাম্রাজ্য

নওয়াবজাদা ও গরীবজাদা হইল ঢাকার আদি বাসিন্দা। ইদানিং মিনিষ্টারজাদা, সাংসদজাদা, অফিসারজাদা, মিডলিষ্টজাদা, ফিলিমষ্টারজাদা ও মস্তানজাদা প্রমুখের আগমনে ঢাকার লোকসংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

নওয়াবজাদা ও গরীবজাদাদের মতন অনান্যরা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে না। কারণ অন্যান্যরা সকলে এক বা দুই পুরুষের, কিন্তু নওয়াবজাদা ও গরীবজাদাগণের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের।

আগাম কিছু বলা সম্ভব না হইলেও অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বলা যাইতে পারে যে গরীবজাদাদের ঐতিহ্য ছাড়া অন্য সব ঐতিহ্য মস্তানজাদাগণ ভাংগচুর করিয়া ফেলিবে। ঢাকার নওয়াবজাদাগণ অত্যন্ত বিলাসী, পোলাও নয়ত বিরানী হইল তাহাদের সকালের নাস্তা। তাহাদের সেই খানদানী খাসলত এখনো ঢাকার অলিতে গলিতে দৃষ্ট হয়।

ইসলামপুরে সেভো পাহলোয়ানের মোরগ পোলাও বা নাজিরা বাজারের কাজী আলাউদ্দিন রোডের হাজী সাহেবের তেহারী এই ঐতিহ্যের স্মারক। অনেকে তাহাদের অনুকরণে সকাল সন্ধ্যায় মোরগ পোলাও ও তেহারী বিক্রি করিয়া থাকে।

নওয়াবজাদাদের জনৈক চাকরকে একজন জিজ্ঞাসা করিল, ওহে, অদ্য তুমি কি নাস্তা ভক্ষণ করিয়াছ?

গরীবজাদা হইলে কি হইবে। সে নওয়াবজাদার খানদানী নওকর। তাই কহিল, "ঠান্ডি পোলাও অউর কাবাবে বাইগন"। ইহার অর্থ হইল পান্তাভাত ও বেগুন ভাজা।

www.pathagar.com

নতুন নোট কাগজ যেমন পুরাতন টাকাকে ম্লান করিয়া দেয়, তেমনি ঢাকার পুরাতন নওয়াবজাদাগণও ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ঠিকানা খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল। নতুনের সয়লাব ঢাকার বুকে যতই আসুক না কেন গরীবজাদাগণ সদম্ভে রাস্তার সম্রাট হইয়া নওয়াবী আমলের খানাপিনার বেশক রেওয়াজ করিয়া যাইতেছে। ঢাকার বিভিন্ন রাস্তার পাশে গরীবজাদাদের খানদানী খানাপিনা এবং তাহাদের ইতালীয়া রেস্তুরাঁ (ইটের উপর যাহা স্থাপিত ও পরিচালিত) সমূহ দেখা যাইবে।

এই সমস্ত হোটেলে দুই ধরনের খানা পাওয়া যায় (এক) বড়লোকদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উচ্ছিষ্ট। এই উচ্ছিষ্টের মধ্যে থাকে পোলাও, বিরানী, গোস্তহীন চিবানো মুরগীর হাড্ডি, আণ্ডার টুকরা, সালাদের অংশ ইত্যাদি। ইহার নাম শাহী বিরানী। ইহা হাফ ও ফুল প্লেট হিসাবে বিক্রি হয়। আর এক প্রকারের তেহারী তাহারা প্রস্তুত করে। গরু ছাগলের উজরী, নাড়িভুড়ি ও ফেলিয়া দেওয়া গোস্তের সাদা চামড়া টুকরা টুকরা করিয়া উহা প্রস্তুত হয়।

গরীবজাদাগণ রাস্তায় ইটের উপর উপবেশন করতঃ মাছির সহিত লড়াই করিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত এ গরিবী তেহারী ভক্ষণ করিয়া থাকে।

নওয়াবজাদাদের খাদ্যের চাহিদা ও সরবরাহে ত্রুটি থাকিলে বা সংকট দেখা দিলেও গরীবজাদাদের এহেন খাদ্যের চাহিদা ও সরবরাহের কোন ঘাটতি বা সংকট অদ্যাবধি পরিদৃষ্ট হয় নাই। চাহিদা ও সরবরাহে বিঘ্ন ঘটিলে মানুষ বিদ্রোহ করিয়া থাকে। গরীবজাদাদের খানা-পিনায় চাহিদা ও সরবরাহে তেমন কোন ঘাটতি নাই বলিয়া তাহারা শান্তিপ্রিয় নাগরিকের মত নীরবে বংশ বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে।

চাহিদা ও সরবরাহের ঠেলা সামলাইতে না পারিয়া খোদ রাশিয়া ঢাকাইয়া বাকরখানীর মত টুকরা টুকরা হইয়া গেল।

ঢাকার এই গরীবজাদাগণ তাহাদের সাম্রাজ্য ও তাহাদের সমাজের স্থিতি অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য সরকারী, বিরোধী বা বিদেশী কাহারো নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য না লইয়া তাহারা তাহাদের চাহিদা ও সরবরাহের দাঁড়িপাল্লা ঠিক রাখিয়াছে।

চট্টগ্রাম কোনদিন রাজধানী ছিল না। তাই এখানে নওয়াব আলী, নওয়াব মিয়া নামে লোক থাকিলেও নওয়াবজাদা ছিল না। এখানে সওদাগরজাদা ও গরীবজাদাগণ দীর্ঘদিন ধরিয়া মহা সম্প্রীতিতে বসবাস করিতেছে। এই দুই শ্রেণীর বিকাশও দ্রুত বৃদ্ধি লাভ ঘটিতেছে। নব্য মস্তানজাদাগণ তাহাদের খুব কাবু করিতে পারিতেছে না।

www.pathagar.com

সওদাগরজাদাগণ সওদাগরি বুঝেন। বুঝেন বলিলে ভুল হইবে, তাহারা খুবই ভাল বুঝেন। তাহারা ঢাকাইয়া নওয়াবদের মত ফালতু বিলাসগিরির ধারে কাছে নাই। তাই চট্টগ্রামের শয়তানী বিলাসিতার বিশেষ কোন নিদর্শন গবেষণা করিয়াও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইবে।

সওদাগরদের প্রধান কর্তব্য হইল লাভ-লোকসান খুঁজিয়া চলা। এই উপমহাদেশের সেরা সওদাগর হইল মাড়োয়ারী সম্প্রদায়।

কথিত আছে ৬০ দশকে কলিকাতায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে সর্বত্র রবীন্দ্র, রবীন্দ্র বলিয়া এক মহাউৎসবের কলরোল পড়িয়া গেল।

জনৈক মাড়োয়ারী মনে করিল নিশ্চয় 'রবীন্দ্র' কোন নতুন সামগ্রী হইবে, যাহার খুবই চাহিদা রহিয়াছে। তিনি স্বীয় গদিতে আসিয়া তাহার অপর ব্যবসায়ীকে ফোন করিল, আরে ভাই ঝুমঝুমিওয়ালা, রবীন্দ্র কা ভাও ক্যাতনা অর্থাৎ ওহে ভাই ঝুমঝুমিওয়ালা রবীন্দ্রনাথের দাম কত?

ঝুমঝুমিওয়ালা অনেক তত্ত্ব তালাসী করিয়া তাহাকে জানাইল যে রবীন্দ্রনাথ কোন বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী নহে, উহা একজন "শায়েরের" নাম। ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য ছাড়া অন্য কিছুকে পাত্তা দিতে চট্টগ্রামের সওদাগরজাদাগণ প্রস্তুত নহে। ঢাকা শহর যেমন ঢাকার নওয়াবদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, চট্টগ্রামেও তেমন আলামত দেখা যাইতেছে। নতুন মিডলিষ্টরা আসিয়া অনেক কিছু দখল করিয়া লইয়াছে। কিন্তু চট্টগ্রামের গরীবজাদাদের কেহ হটাইতে পারে নাই। চট্টগ্রামে মাজারের সংখ্যা বেশী বলিয়া অত্র বন্দর শহরের গরীবজাদাগণ সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। চট্টগ্রামের গরীবজাদাগণ অত্যন্ত সাহসী সন্তান। চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ মস্তান ও চাঁদাবাজদের আক্রমণে যখন ভীত-সন্ত্রস্ত, তখন এই গরীবজাদাগণের কোন আতংক নাই।

চট্টগ্রামের কোন সমস্যা তাহাদিগকে টলাইতে পারে নাই। চট্টগ্রামের দুঃখ চাঙ্গাই খাল তাহাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে নাই। ঢাকার গরীবজাদাদের জন্য যেমন হোটেল সৃষ্টি হইয়াছে, চট্টগ্রামের গরীবজাদাদের জন্য তেমন কোন হোটেল তৈয়ার হয় নাই। তাহারা শহরের যত্রতত্র ফুটপাতে খালি যায়গায় সপরিবারে বিনা ওজরে বসবাস করিতেছে।

বাংলা ১২ই বৈশাখ আবদুল জব্বারের বলী খেলার সময় এই সব গরীবজাদাগণ তাহাদের থাকিবার যায়গা তিনদিনের জন্য ভাড়া দিয়াছিল।

এই গরীবজাদাদের নিরাপদ অবস্থান ও শান্তিময় দিন যাপন দেখিলে আমার ঈর্ষার সঞ্চার হয়। ইহাদের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে আনন্দ কলহাস্যে জীবন যাপনের চিত্র দেখিলে যে কোন নওয়াবজাদা বা সওদাগরজাদার মস্তক আপনা আপনি নত

www.pathagar.com

হইয়া যাইবে। তাহাদের কোন সমস্যা নাই। বৈদ্যুতিক ট্যাক্স, ওয়াসার বিল দিতে হয় না, মশা মাছি তাহাদের গৃহপালিত চির পরিচিত পতঙ্গ।

তাহাদের স্ত্রীগণের কোলে দেখিতে পাইবেন পুতুলের মত কি একটা ঝুলিতেছে। দু'খানা চিকন পা মাঝে মাঝে নড়াচড়া করে। হাড্ডির উপর চামড়া দিয়া ঢাকা মানব পুতলী। ইহারা কাঁদে না- কারণ কাঁদিবার মত শক্তি নিয়া ইহারা জন্ম গ্রহণ করে না, তবুও ইহারা বাঁচিয়া থাকে। ইহারা বড় হইয়া মা বাবা ডাক ডাকিবার পূর্বে 'ভাত' 'ভাত' বলিয়া কান্না করিয়া তাহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

পথের পাঁচালীর 'অপু' ও 'দুর্গা' দারিদ্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও দারিদ্র কি জিনিস বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাদের এ সন্তানগণ জন্মিবার পরই বুঝিয়াছে ভাত আর ক্ষুধা, ক্ষুধা আর ভাত– অন্য কোন সংলাপ তাহাদের সন্তানদের মুখে নাই।

তাহাদের স্ত্রীগণ পৌর পানির কলে ওয়াসার পাইপে মনের আনন্দে লোকচক্ষুকে অন্তরাল না করিয়া গোসল পর্ব সমাধা করিয়া থাকে। আবহমান বাঙ্গালীর রীতি অনুযায়ী ফুটপাত নিবাসেই এক মহিলা অপর মহিলার চুল পাট করে, উকুন বাছিয়া পরিষ্কার করে।

কাগজের বিড়ি বা অল্পদামের সিগেরেটে সুখ টান মারিয়া একে অপরকে অপার মমতায় প্রদান করে। তাহাদের কলিজা ছাঁকিয়া এই ধোঁয়া মনের আনন্দে নির্গত হইয়া আকাশ মার্গে ধাবিত হয়।

এই গরীবজাদাদের আস্তানায় জুয়া ও দেশী মদের আসর জুটে। চট্টগ্রামে সওদাগরজাদাদের নিশানা হয়ত একদিন ঘুচিয়া যাইবে, কিন্তু গরীবজাদাদের আস্তানা দিন দিন বিস্তৃত হইবে। তাহাদের সংখ্যা যেইভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, হয়ত তাহারা মেয়রের পদ দাবী করিতে পারে। তবে উহার কোন সম্ভাবনা নাই। গোলামের ইতিহাস আছে, গোলামের রাজ দরবার আরোহনের কাহিনী আছে। গরীবের কোন ইতিহাস নাই। গরীব কোনদিন এক হইতে পারে না, ইহা তত্ত্ব নহে বাস্তব।

আরো দেখা গিয়াছে যে অতীতে এই দেশে শ্রমিকরা ধর্মঘট করিত, বর্তমানে বিভিন্ন মালিক শ্রেণীও ধর্মঘট করে।

যা হউক, এক কথায় বলিতে হইবে গরীবজাদাদের কোন সমস্যা নাই। বর্তমান বিদ্যুত লোড শেডিং চট্টগ্রাম নগরকে নরকের যন্ত্রণা ভোগাইলেও গরীবজাদাগণ কিন্তু নির্মল আনন্দে রহিয়াছে। বিদ্যুতের অভাবে যখন টিভি বন্ধ হইয়া গেল তখন গরীবজাদাদের আস্তানা হইতে ভাসিয়া আসিল–

'দেখা হ্যায় পহেলীবার
সাজন কি আখোঁমে প্যায়ার'

www.pathagar.com

ছাগল ও মস্তান

ছাগল লইয়া যতই ছাগলামী অথবা পাগলামী করুক না কেন সম্প্রতি ভারতে ছাগল বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ছাগল এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করিতেছে বলিয়া ছাগলের বিরুদ্ধে যে অপবাদ রহিয়াছে তিনজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই সম্মেলনে ছাগল উহার হাস্য উদ্দীপক 'ম্যা' ধ্বনি সহকারে উপস্থিত হইতে না পারিলেও সম্মেলনের কর্তা ব্যক্তিদের রসনায় ছাগলের সুস্বাদু গোস্ত হয়ত উপস্থিত হইয়াছে। ঢাকার আদি বাসিন্দাগণ গরুর মাংস আর ছাগলের গোস্ত বলে। যেহেতু রাজধানীর কাজকারবার অতএব তাহাদের সম্মানের খাতিরে ছাগলের গোস্ত কথাটি ব্যবহার করা হইল।

ভারত কোষ ও সদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া মতে ছাগল হইল আর্ডিওদাকতিলা বর্ণের গো-গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, চতুষ্পদ রোমন্থক প্রাণী। ইহার জোড়া খুর, মাথায় শিং এবং সারা দেহ লোমে আবৃত। মর্দা ছাগলের চিবুকে একটু বাড়তি লোম থাকে।

ছাগলের আদি বাসস্থান নিয়া বিভিন্ন বিতর্ক রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ছাগলের আদি বাসস্থান গ্রীষ্মপ্রধান দেশে।

আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে ছাগলের আদি নিবাস চীনে। প্রায় এক কোটি বৎসর পূর্বে চীনে ছাগলের আবির্ভাব ঘটে। চীনে ছাগলের এক বিরাট প্রাচীন ভাস্কর্য রহিয়াছে।

জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল। ছাগলের আদি জন্মস্থান যে দেশের হোক না কেন, পারফরমেন্সের দিক দিয়া মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের কালো ছাগল বেশ

www.pathagar.com

সুনাম ক্রয় করিয়াছে। বাংলাদেশের সুচতুর কতিপয় আমলা মধ্যপ্রাচ্যের ধনকুবেরদের আকর্ষণ করিবার জন্য কালো ছাগলের কিছু মাংস লইয়া গিয়াছিলেন।

বাংলাদেশের কালো ছাগলের গোস্ত খাইয়া আরবী শেখেরা নাকি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে কালো ছাগলের ফার্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নাকি প্রস্তাব দিয়াছিলেন।

ছাগলের এই ফার্ম হইয়াছে কিনা নিবন্ধকারের জানা নাই। তবে উহা একটি উত্তম প্রস্তাব।

পৃথিবীর বহু ধর্মের নবীদের প্রিয়তম পশু হইতেছে ছাগল, নয়ত ইহার জ্ঞাতি ভাই ভেড়া।

মহাত্মা গান্ধীর সাথেও ছাগল থাকিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে তিনি যখন নোয়াখালীর রামগঞ্জে গিয়াছিলেন কতিপয় বে-রসিক তাহার দুধেল ছাগীটি খাইয়া ফেলিয়াছিল।

কবিরাজী শাস্ত্রে ছাগলের বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে। ছাগলাদ্য ঘৃত বহু রোগের উপশম করিয়া থাকে। কোন কোন কবিরাজ বলিয়া থাকেন যে বুড়া পাঁঠার গন্ধ যক্ষ্মা রোগ নাশিনী।

বাংলার কবি সাহিত্যিকগণ ছাগলকে সুনজরে দেখেন নাই। 'মহেশ' গল্পে গরুর উপর যেমন কালজয়ী ছোট গল্প আছে ছাগলের উপর তেমন গল্প নজরে পড়ে নাই।

সুকুমার রায় বোকা মানুষের উদাহরণ হিসাবে ছাগলের উপমা প্রদান করিয়াছেন।

তিনি ছাগলের 'ছাগ' আর মানুষের 'নুষ' লইয়া 'ছানুষের' কল্পনা করিয়াছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী কবি যিনি ছাগলের উপর ১২৫ লাইনের দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছেন। কবিতাটির নাম 'পাঁঠা'।

তিনি ভক্তিভাবে এ কবিতা পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

প্রতিদিন প্রাতে উঠি করে শুদ্ধ মন
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যে জন।।
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঠা পাঠা বলে
সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যাবে চলে।

পাঁঠা কবিতাটিতে প্রথমে বর্ণনা করিয়াছেন-

রসভরা রসময় রসের ছাগল
তোমার কারণে আমি হইয়াছি পাগল।

www.pathagar.com

তিনি এর বর্ণনায় বলিয়াছেন–

চাঁদমুখে চাপদাড়ি গালে নাই গোঁফ

শৃঙ্গ খাড়া, ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে খোপ।

তিনি পাঁঠার গন্ধ শুঁকিয়া স্বর্গের স্বাদ পান।

"হাতে হাতে স্বর্গ পায় বোকা গন্ধ শুঁকে।"

কবি ১২৫ লাইনে পাঁঠার বহু বিবরণ দিয়াছেন। এই রসময় ছাগলের নাম যে পাঁঠা রাখিয়াছে উহাতে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন–

এমন পাঁঠার নাম কে রেখেছে বোকা

নিজে সে বোকা নয় ঝাড় বংশে বোকা।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের পর ছাগলের প্রতি এমন দরদ আর দেখা যায় নাই। সম্প্রতি ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় প্রচুর ছাগল বিতরণ করা হইয়াছে। বিতরণকৃত ছাগ সন্তান সন্ততিগণ ভূধরে না মনুষ্য উদরে উহার কোন পরিসংখ্যান এখনো পাওয়া যায় নাই।

আবুল মনসুর আহমদ তাহার বিখ্যাত রম্য রচনা ফুডকনফারেন্সে খাদ্য সমস্যা সমাধানে আলোচনারত মন্ত্রীবর্গের খাদ্য ভক্ষণে এক সরস বিদ্রুপ চিত্র অংকন করিয়াছিলেন। বর্তমানে কেহ যদি অনুরূপ চিত্র অংকন করে তবে তাহার চৌদ্দগোষ্ঠী আর প্রকাশ্যে চলাফেরা করিতে পারিবে না। বলাবাহুল্য ওই স্তরের লেখক ও লেখনী নাই বলিলেও চলে।

আমাদের চট্টগ্রামে বলে– ছাগল পালে (পালন করে) পাগলে।

বাংলা পরীক্ষায় প্রায় সময় কারক বিভক্তি নির্ণয়ের জন্য প্রশ্ন আসে, 'ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে।'

ছাগল বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত প্রাণী হইলেও ইহার মাংস ভক্ষণে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই। ইহা এদেশের হিন্দু-মুসলমানের ভোজন ঐক্যের প্রতীক। জলপানি লইয়া বিতর্ক থাকিলেও 'ছাগ মাংস' ভক্ষণ করিবার ব্যাপারে কাহারো দ্বিমত নাই। মৌলবাদী বা অমৌলবাদী, প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল সকলের নিকট আজ পর্যন্ত ছাগ বিতর্ককে উর্ধ্বে রাখিয়া এক মহা সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

শহরের ছাগল উহার মাংসের স্বাদগুণে অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছে। গোস্তবিহীন দিবসে ছাগল চুপিসারে জবেহ হইয়া থাকে। গোস্তবিহীন দিবসে বাজারে গোস্ত না থাকিলেও হাঁড়িতে গোস্ত থাকিবে না– এমন কথা আইনে নাই এবং ওই দিবসে ছাগগোস্ত ভক্ষণ দোষণীয় নহে।

www.pathagar.com

একটি পিচ্ছিল বংশ দণ্ডে একটি বানর এক লাফে তিন ফুট উঠিয়া এক ফুট নীচে পুনরায় পতিত হয়। ১৫ ফুট বংশ দণ্ডে উঠিতে ওই বানরকে কয়টি লাফ দিতে হইবে, ইহা একটি পাটিগণিতের অংক।

এই অংকের সমাধান যাহা হউক না কেন ছাগগোস্তের দরে ইহার প্রভাব পড়ে বিশেষ করিয়া রমজান মাসে।

রমজান মাস অথবা অন্য মাসে যদি দৈবাৎ ছাগলের মাংসের দাম লম্ফ দান করে তবে নামিবার কালে বানরের অংকের মত ২ (দুই) ফুট থাকিয়া যায়। অর্থাৎ পূর্বের দাম হইতে বেশ উর্ধ্বে অবস্থান করে।

অতএব আমরা ছাগমাংসভোজীগণ আসন্ন আন্তর্জাতিক ছাগল বিষয়ক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিতেছি।

এই সম্মেলনে ছাগল বিদেশে রপ্তানী হইলে আমাদের আপত্তি নাই। কারণ চিংড়ি মাছের মাথার মত আমরা সস্তায় মাথা খাইতে পারিব।

অনেক দিন পূর্বে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ছাগলের নিকট আত্মীয় ভেড়া চাষের একটি প্রকল্প চালু হইয়াছিল। এক একটি ভেড়া গরুর বাচ্চার মত দেখিতে মনে হইত। ভেড়ার লোম হইতে কম্বল তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। সম্প্রতি উহা কেমন আছে জানা যাইতেছে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বাঙ্গালীরা শুরু করিতে জানে, শেষ করিতে জানে না।

উহা শুরু হইলে শেষ হইবে না– ধরিয়া নিলে সব বিতর্ক চুকিয়া যাইবে।

বাংলাদেশে আরো একটি ছাগল বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেওয়া যাইতে পারে। ছাগলই হয়ত এ দেশের অনেকের পাগলামী ছাগলামী বিনষ্ট করিয়া শুভবুদ্ধি বিকাশের সহায়তা করিতে পারিবে।

ছাগলকে অনুন্নত বিশ্বের গাভী বলিয়াও আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। ইহার অর্থ ছাগল দিয়া চাষ নহে। ইহা হইবে ছাগলের চাষ বা ছাগলের বংশ বৃদ্ধি। ছাগলের বংশ বৃদ্ধির জন্য ছাগলের শত্রু চিহ্নিত করিতে হইবে। একদা ছাগলের পরম শত্রু ছিল শিয়াল, এখন হইতেছে মস্তান। ছাগল চাষের পূর্বে মস্তানদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।

কারণ পূর্বে বলিত, 'ছাগলে কি না খায় পাগলে কি না বলে' এখন হইতেছে 'মস্তানে কি না খায় আর কি না কর্ম করে'–মস্তানের বংশ বৃদ্ধি বন্ধ করিতে না পারিলে ছাগবংশ বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া চাঁদাবাজীর শ্যেন দৃষ্টি হইতেও ছাগলকে রক্ষা করিতে হইবে।

www.pathagar.com

জিন্নাহ্, গান্ধী বনাম সালমান শাহ্!

'বাপ কা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া' কিছু হোক বা না হোক পুত্র কন্যাগণ বাপ দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠীর দুর্নামের ভাগী না হইলেও সুনাম ত্যাগ করিতে কখনো রাজী নহে। 'জাদা' শব্দের অর্থ হইল পুত্র। ইহা দিয়া বঙ্গ ভাষায় অনেক শব্দ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। যেমন নওয়াবজাদা, সাহেবজাদা, সৈয়দজাদা ও স্ত্রী লিঙ্গে নওয়াবজাদী, সৈয়দজাদী, গালি অর্থে 'হারামজাদা' 'হারামজাদী', বর্তমানে 'মস্তানজাদা' হইতে পারে।

ঋণখেলাপী হইয়া যাহারা সাম্প্রতিককালে খ্যাত হইয়াছেন তাহাদের সন্তানগণকেও 'খেলাপীজাদা' বলা যাইতে পারে। মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারদের সন্তানদিগকে মুক্তিযোদ্ধাজাদা ও রাজাকারজাদা বলা শোভনীয় নহে। তাহারা হইবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও রাজাকারের পুত। রংপুরে রাজাকারের পুত উচ্চারিত হইবে "আজাকারের পো"।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বর্তমানে নওয়াবজাদা নাই। সৈয়দজাদা ও পীর বংশের শাহজাদারা রহিয়াছেন। হারামজাদা থাকুক বা না থাকুক তথাপি ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয় গালি। তবে কখনো কখনো এই হারামজাদা গালিটা আদর অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। অতীতকালে বাংলাদেশে আচার বিচারে, সম্ভাষণে, আপ্যায়নে, চালচলনে, উপবেশনে একটি সভ্য আচরণ পরিলক্ষিত হইত।

একদা এক সৈয়দজাদা এক অপকর্ম করিয়া নিন্দিত হইয়া উঠিলেন। পাড়া পড়শি সৈয়দজাদার অপকর্মের বিচারার্থে এক গ্রাম্য শালিসের আয়োজন করিল। শালিসকারদের সম্মুখে সৈয়দজাদা নিজ অপকর্মের কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করিলেন। দোষ স্বীকার করিলে শাস্তি কম হইতে পারে কিন্তু শাস্তি সম্পূর্ণ মাফ হইতে পারে না। গ্রাম্য শালিসে অতীতে দোষী ব্যক্তিকে জুতা গলায় দিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো, জুতা দিয়া ঘা দেওয়া, লাঠিপেটা করা, বেত মারা, নাকে খত খাওয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি হইত। প্রাচীন সাহিত্যে মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, গাধার পিঠে চড়াইয়া গ্রাম হইতে বিতাড়ন করাই হইল চরম শাস্তি। সৈয়দজাদা অপরাধ করিয়াছেন সত্য। সৈয়দ বংশ অত্যন্ত পবিত্র। তাহাকে জুতা দিয়া মারাত দূরে থাকুক হাত ও পা দিয়া আঘাত করা দোষণীয় বলিয়া মনে হইল।

শালিসকারক সৈয়দজাদাকে মাথা দিয়া দশ বিশটি আঘাত করিতে নির্দেশ দিলেন। গ্রামের এক জোয়ান মরদকে এই ইজ্জতি শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য নিয়োগ করা হইল। গ্রাম্য জোয়ান মরদটি মস্তক হেলাইয়া যখন সৈয়দের শরীরে আঘাত করিতে লাগিল তখন সৈয়দজাদা চিৎকার করিয়া কহিলেন, আপনারা আমাকে লাঠি দিয়া, জুতা দিয়া আঘাত করুন কিন্তু মাথার আঘাত সহ্য করিতে পারিতেছি না।

বিনয়, ইজ্জত আবরু এক সময়ে বাংলাদেশের মানুষের বৈশিষ্ট্য ছিল। বিনয়, ইজ্জত ও আবরু লইয়া বাংলাদেশে লোকালয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। এই অনুকাহিনীসমূহ সংগৃহীত হইলে দেখা যাইবে বাংলার সংস্কৃতি কি, বাংলার মানুষের মানস ঐশ্বর্য কি?

কথিত আছে যে একদা দুই আলেম ট্রেনে উঠিতেছিল। কে আগে উঠিবে? যে আগে উঠিবে সে আদব জানে না, পরে উঠাই হইল আদবী কাজ। তাই একজন অপরজনকে কহিল, আপ উঠিয়ে। দুইজন এইভাবে 'আপ উঠিয়ে-আপ উঠিয়ে' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। আদব ছাড়িতে কেহই রাজী হইল না। আর আপ

www.pathagar.com

উঠিয়ে আপ উঠিয়ে সম্ভাষণের ও পাল্টা সম্ভাষণের ফাঁকে এক সময় রেলগাড়ী চলিয়া গেল।

নিজেকে ছোট করিয়া দেখা হইল 'বিনয়'। এই বিনয় ছিল বাংলাদেশের বড় ছোট সকল মানুষের বৈশিষ্ট্য। মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ডঃ শহীদুল্লাহ, ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রমুখ বড় মাপের মানুষকে দেখিয়াছি 'বিনয়ের আদর্শ' হিসাবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে বড় মাপের মানুষদের জীবনী প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই জীবনীসমূহ গতানুগতিক। যে 'সত্য' সমূহকে বড় করিয়া দেখিয়া তাহারা বড় হইয়াছে, 'আদর্শ' মানুষ হিসাবে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সব 'সত্য' আমরা উদঘাটন করিতে পারিতেছি না। সার্কাসের ক্লাউনের মত আমরা লোক রঞ্জনের ব্যবসা শুরু করিয়াছি।

গত ১৪/১৫ আগষ্ট ছিল এই উপমহাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য দিন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পণ্ডিতগণ এই দিনে নতুন কোন কিছু দিতে পারিলেন না। ঢাকার একটি দৈনিকে নির্মল সেন নতুন এক তথ্য দিয়া একটি নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। অন্য কোন পত্রিকায় বিশেষ কোন নিবন্ধ দেখিতে পাইলাম না।

গত এক পক্ষ ধরিয়া সালমান শাহ ও সামিরার কাহিনীতে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার কলাম ভরিয়া গিয়াছে। এই কাহিনী যদি আরো চলিতে থাকে তবে ভদ্রতা, বিনয়, শিষ্টাচার ইজ্জত আবরু কি দেশে অবস্থান করিতে পারিবে?

জিন্নাহ, গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, সুভাষ বোস, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ কি সালমান শাহের চেয়ে নিকৃষ্ট? ভারত বিভাগের এই নায়কদের কাহিনীগুলোর মধ্যে কি কোন তথ্য বা শিক্ষণীয় কিছু ছিল না? বিদেশি পত্র পত্রিকাসমূহ ভারত বিভাগের ৫০ বৎসর পূর্তির উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছে, আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বলিয়া যে সব পত্রিকা দাবী করেন এবং অহংকার করিয়া থাকেন তাহারা বিদেশী পত্রিকা হইতে 'কাটিং' মারিয়া গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করিয়াছেন। সরকারকে রক্ষা করা বা সরকার পতনের ইন্ধন জোগানো কি সংবাদপত্রের কাজ? উহা অন্য দেশের হইলে বাংলাদেশে সংবাদপত্র সমূহের ভূমিকা আরো কিছু হওয়া উচিৎ।

দেশের মানুষের মানসঐশ্বর্য যদি বৃদ্ধি না ঘটে তবে সরকার ভাল কাজ করিলেও টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়।

□ ২২শে আগষ্ট '৯৭

www.pathagar.com

চোরের মার বড় গলা

পৃথিবীর নর-নারী প্রেম করিয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে। মানুষের এই প্রেমকে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। রাজা বাদশারাও প্রেম করিয়া থাকে। তাহাদের অনেকের প্রেম ইতিহাসের ভস্মে মিশিয়া গিয়াছে। এক রাজা ও এক সম্রাটের প্রেমকাহিনী প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ হিসাবে রহিয়াছে। এক হইলেন বাদশা শাহজাহান আর একজন অষ্টম এডোয়ার্ড।

বাদশা শাহজাহান মমতাজ বেগমের প্রেমকে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিবার মানসে তাজমহল নির্মাণ করিয়াছিলেন আর অষ্টম এডোয়ার্ড প্রেমে 'অমর' হইবার মানসে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অষ্টম এডোয়ার্ড পঞ্চম জর্জের মৃত্যুর পর বৃটিশ সিংহাসনে আরোহন করিলেন। নতুন রাজা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে তালাকপ্রাপ্ত মহিলা লেডি সিমসনকে তিনি বিবাহ করিবেন।

www.pathagar.com

'গণতন্ত্রের' তীর্থস্থান বৃটিশ পার্লামেন্ট ইহাতে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। পার্লামেন্ট সদস্যগণ ক্ষিপ্ত হইয়া কহিলেন, না ইহা হইতে পারে না, রাজাকে যে কোন একটি পথ গ্রহণ করিতে হইবে। সিংহাসন, নয়ত লেডি সিমসন।

অবশেষে রাজার প্রেম জয়ী হইল। তিনি লেডি সিমসনের প্রেমে রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং নির্বাসন জীবন যাপন করিলেন।

'এ স্টোরী অব এ কিং' নামক একটি আত্মজীবনীতে তিনি এ কাহিনী বয়ান করিলেন। লেডি সিমসন এরই উত্তরে লিখিলেন "দি হার্ট হ্যাজ ইটস রিজন"। নিঃসন্তানরূপে এই প্রেমিক রাজা ও রাণী পরলোকে গমন করিয়াছেন।

শাহজাহান বাদশা তাজমহল গড়িলেন কিন্তু তিনি বিরাট কোন ত্যাগ স্বীকার করেন নাই। প্রেমের ইতিহাসে এতবড় ত্যাগ আর কেহ করে নাই বলিয়া ঐতিহাসিকগণ এতদিন অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরেজগণ কহিত, দেখ আমরা কেমন জাত। প্রেমের জন্য আমাদের রাজা দেশ ত্যাগ করিতে পারেন।

তাহাদের আর এক রাজা ফাঁসিতে ঝুলিয়াছিল। ফাঁসিতে ঝোলার কাহিনীকে নিয়া ইংরেজগণ গর্ববোধ করিয়া থাকে। কথিত আছে যে একটি অপরাধের জন্য বৃটেনের জনৈক রাজার ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল।

ফাঁসির মঞ্চে আরোহনের পূর্বে তাহার অন্তিম ইচ্ছা কি জানিতে চাহিলে তিনি কহিলেন, একটি কোট।

ইহাতে কারারক্ষী আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কোট কেন, এখনই ত আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হইবে। ইহার উত্তরে সে রাজা কহিলেন, এখন শীত পড়িতেছে। শীতে আমি কাঁপিতে থাকিলে লোকে কহিবে বৃটেনের রাজা মৃত্যুভয়ে কাঁপিতেছে। ইহা ইংরেজ জাতির কলংক হইবে। এই কাহিনী প্রকাশিত হইবার পর সকলে নিহত রাজাকে বাহবা দিতে লাগিল। অবশ্য সেই রাজাকে নিয়া আর ঘাঁটাঘাটি করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ঘাঁটাঘাটিতে ইংরেজগণ বড়ই ওস্তাদ। এই ঘাঁটাঘাঁটিতে তাহারা মাতলামী করিলেও তালে ঠিক থাকে, তাহাদের 'তাল' হইল সত্য কহিতে বা সত্য উদ্ধার করিতে আপন পিতাকে রেহাই প্রদান করিব না।"

যে প্রেমিক সম্রাট প্রেমের জন্য বৃটিশ সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন সম্প্রতি জানা যায় সেই প্রেমকাহিনীর 'গোমর' ফাঁস করিতে বৃটিশরা উঠিয়া পড়িয়া

www.pathagar.com

লাগিয়াছে। গবেষকদের মতে আদতে তিনি ছিলেন 'হিটলারের ভক্ত', তিনি ফ্যাসিবাদের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

তিনি লেডি সিমসন ও সিংহাসন একসাথে পাইবার বাসনা করিতেন। লেডি সিমসনকে লইয়া তিনি হিটলারের সাহায্যে বৃটিশ সিংহাসন পুনরায় দখল করিবার ফন্দি আঁটিতেছিলেন। অষ্টম এডোয়ার্ডের এ ফঁন্দি ফিকিরের কাহিনী বৃটেনের টি, ভি হইতেও প্রচার করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

অষ্টম এডোয়ার্ডের নাত বৌ বিবি 'ডায়না' ইতিহাস ঘাঁটিয়া সাতঘাটের পানি পান করিয়া বুঝিয়াছেন যে জীবনযন্ত্রণা যতই হউক, ধিক্কার আর কুৎসা যতই আসুক 'রাজমাতা' হইলে সকল কলংক মুছিয়া যাইবে। তাই 'ডায়না' নতুন করিয়া চিন্তা করিতেছেন বৃটেনে থাকিবার জন্য। কারণ তাহার দাদা ঠাকুরুন (অষ্টম এডোয়ার্ড) যে ভুল করিয়াছেন তিনি সে ভুলে পা দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন। তিনি ঘরপোড়া গরুর মত সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পাইতেছেন। অষ্টম এডোয়ার্ডের সত্য কাহিনী উদঘাটনের জন্য বৃটেনের বুদ্ধিজীবীদের প্রশংসা করিতেছি। তাহারা সত্য কথা কহিতে যুধিষ্ঠিরকে হার মানাইয়া থাকেন। মনে হইবে তাহারা বড়ই উদার ও মহৎ। কিন্তু পরের ধন চুরিতে আর বেইমানীতে ইহাদের মত দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না। ধন লুণ্ঠন আর বেইমানী ছিল তাহদের প্রধান অর্থকরী কাজ কারবার।

পৃথিবীর নানান দেশের সম্পদ লুট করিয়া তাহারা এখন সত্য ও ন্যায়ের উপাসক হইয়া উপদেশ খয়রাত করিতেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে তাহারা যে সম্পদ লুট করিয়া লইয়া গিয়াছেন তাহার একটি অংশ কি তাহারা ফেরত দিতে প্রস্তুত?

এই উপমহাদেশের মধ্যে লুটের প্রথম ক্ষেত্র হইল এ বাংলাদেশ। এ দেশ হইতে তাহারা যে অর্থ সম্পদ লইয়া গিয়াছেন উহার এক দশমাংশও যদি তাহারা ফেরত দেন তবে কহিব তোমরা গণতান্ত্রিক সুসভ্য সমাজ, সত্যের সাধক।

তোমাদের অতীত লুণ্ঠনের জন্য আমরা নিরক্ষর, অমার্জিত, আনকালচারড হইয়াছি। আমাদের সম্পদ তোমরা কি ফেরত দিবে? যদি দিতে না পার তবে পরের ধনে পোদ্দারী করা বাহাদুরী লইয়া উপদেশ দেওয়া বড়ই সহজ। অষ্টম এডোয়ার্ডের সত্য কাহিনী উদঘাটনে চমক থাকিতে পারে তবে কিন্তু লুটেরারা কি সাধু সন্ত হইতে পারিবে?

❐ ২৪শে নভেম্বর '৯৫

বিরস রচনা # ১৯৯

www.pathagar.com

শেষের সংলাপ

একদা বিমান হইতে নামিবার পর দেখিলাম এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আপাদমস্তক শ্বেত শুভ্র, চোখের ভ্রু পর্যন্ত শ্বেতবর্ণ। শ্বেতবস্ত্র পরিহিত।

বিমান যাত্রীর মধ্যে আমারই ছিল শ্বেত খদ্দরের পোষাক। ভদ্রলোক আমাকে ইশারা করিয়া আহবান করিলেন। তাঁহার আহবানে আমি সাড়া প্রদান করিলাম।

ঃ সালামু আলায়কুম।

ঃ ওয়ালায়কুম সালাম।

ঃ আমাকে চিনিতে পারিতেছেন?

ঃ না জনাব।

ঃ আমি শহীদ বরকতের বাবা।

ঃ ভাষা আন্দোলনের শহীদের বাবা?

ঃ জী। প্রতি বৎসর ইচ্ছা পোষণ করি যে বাংলাদেশে একবার গমন করি ---। ফেব্রুয়ারী মাস আগমন করিলে আমার মন বাংলাদেশে গমনের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। ১৯৫২ সনে আমার বরকত আসিবে বলিয়া ওর মা একদা মুড়ি-মুড়কী তৈয়ারী করিয়াছিল। বিন্নি ধানের খৈ ফুটাইয়াছিল। আর মাগুর মাছের ঝোল রাঁধিয়াছিল। জানো বাবা, আমার বরকত ঢাকা হইতে মায়ের কোলে আর আসিতে পারে নাই। ভাষার দাবীতে মায়ের বুলিকে রক্ষা করিতে সে ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী মিছিলে শরীক হইয়াছিল। সে মিছিলে গুলি চলিল। আমার বরকত মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বরকত মা'র কোলে আসিল না কিন্তু বাংলা মায়ের মাটির আঁচলে শেষ শয্যা গ্রহণ করিল। তোমরা সকলেই বলিতেছ, হয়ত ভবিষ্যতেও বলিবা (যদি পাকি-রোগাক্রান্ত মানুষেরা ক্ষমতায় না আসে), এই

www.pathagar.com

বরকত সালামের রক্তের পথ ধরিয়া বাঙালী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, বাংলাকে শত্রুমুক্ত করিয়াছিল। বাংলাদেশে আসিব আসিব বলিয়া মনে বহুদিন আশা করিয়াছিলাম। একবার আশা পূরণ করিতে আসিলাম। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি ক্ষমতায় আসিয়াছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদযাপন করিয়াছে। আমার বরকতের বাংলাদেশকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি। পরলোক হইতে ইহলোকে আগমন সহজ নহে। তবুও আসিয়াছি।

ঃ আপনি শুধু বরকতের বাবা নহেন। আপনি সকলের বাবা। তাই আপনাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করিব। চলুন বাবা, ঢাকা দেখিয়া আসি।

ঃ হাঁটিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।

ঃ আপনি হাঁটিয়া কেমনে যাইবেন। আপনি কতটুকু যাইবেন---?

ঃ আমি বাঙলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় --- তারপর আজিমপুর গোরস্থান পর্যন্ত ---।

ঢাকা দেখিবার জন্য একটি বেবী ভাড়া করিয়া লইলাম---- মহাখালী পৌঁছিলে বরকতের বাবা কহিলেন,

ঃ একটি রিকশা নাও---- বেবীতে করিয়া কিছু দেখিতে পাইতেছি না। ইহা কি সত্যই ঢাকা শহর?

ঃ হ্যাঁ, সত্যই ঢাকা শহর।

ঃ এত বড় বড়, এত উঁচু ইমারত উঠিয়াছে? রাস্তার পাশে ওই সুন্দর ভবনে বিপনী কেন্দ্রের ও রাস্তার সাইনগুলি লেখা পড় বাবা।

আমি পড়িতে লাগিলামঃ

সেন্ট্রাল প্লাজা, রদেভোঁ, সৌদিয়া, আমেরিকান এক্সপ্রেস, সেন্টার পয়েন্ট। রিক্সা চলিতে লাগিল আরো পড়িতে লাগিলাম–বার্জার, মর্টিন, গোল্ডলিফ, বোনানজা, সেনসিভ, টিটবিট, কনভেক্স, এলিগেন্ট, 'টাওয়ার' 'গোল্ডেন এপার্টমেন্ট' 'লাইসিয়াম'।

ঃ না না আর পড়িও না---। আমাদের দেশে কি আর নাম নাই? হে বৎস, একদা বাংলার নিরক্ষর পদানত বাঙালী, কি সুন্দর সুন্দর নাম রাখিয়াছিল। নদ-নদী, জনপথ, ফুল-ফল গাছ-গাছালি আর পাখ-পাখালীর নাম। এই ধর নদীর নাম— কি সুন্দর সুন্দর নদীর নাম।

ঃ বলুন না---

ঃ হ্যাঁ বলিতেছি বাবা--কর্ণফুলী, সুরমা, রূপসা, করতোয়া, কপোতাক্ষ, তিতাস, পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, মাতামুহুরী, শংখ, ধলেশ্বরী, মধুমতি, মায়নী,

www.pathagar.com

আড়িয়াল খাঁ, গোমতি, মহানন্দা---। কত সুন্দর জনপদের নাম 'নীলক্ষী, চট্টগ্রাম, 'পুবাইল' সোনাপুর, রংপুর, ভৈরব, 'প্রেমতলা' রূপগঞ্জ, সুনামগঞ্জ। আর দেখ বাবা, জনপদের নাম রাখিতে গিয়া বাঙালী কোথাও কোথাও বড় তামাশাও সৃষ্টি করিয়াছে। জন্তু-জানোয়ারের নামের সাথে রঙ মিশাইয়াছে--- 'ঘোড়ামরা,' 'ঘোড়াশাল' 'ছাগলনাইয়া' 'ভেড়ামারা' এই বলিয়া তিনি একটু হাসিয়া উঠিলেন। পরে কহিলেন, ওহে বৎস, একটু থাম। একটু পানি খাইব।

একটি দোকানে দাঁড়াইলাম। ঃ একটু পানি হইবে---?

দোকানী কহিল , 'মিনারেল ওয়াটার' আছে।

ঃ দোকানী কি কহিল?

ঃ মিনারেল ওয়াটার।

ঃ পানি নাই? একদা এই বাঙালী জল আর পানিতে ভাগ হইয়াছিল। ভাগ হইয়াছিল গোশত আর মাংসে, ঝোল আর সুরুয়ায় এখন আমরা এক হইয়াছি। বড় বড় শহরে 'জল' পানি নাই, গোস্ত-মাংস ঝোল সুরুয়ার বিভেদ নাই, 'এখানে জল-পানি' 'মিনারেল ওয়াটার' মাংস গোস্ত বিফ মটন চিকেন আর ঝোল সুরুয়া একত্রিত হইয়া সুপ হইয়াছে--- শুধু ভাতের থালায় সকলে এক হইতে পারি নাই। কিছু ফুলের নাম বল বাবা---

ঃ দেশী না বিদেশী?

ঃ আমাদের পুরাতন ফুলের নাম বল। নতুন ফুলের গন্ধ আমার মত প্রবীণ লোকের নাকে আসিবে না।

ঃ মাধবী, মালতি, সন্ধ্যাতারা, সূর্যমুখী, চাঁপা, রজনীগন্ধা, বেলি, দোপাটি, জবা, পলাশ।

ঃ ফলের নাম?

ঃ আম, জাম, নারিকেল, সুপারি, কাঁঠাল, কমলা, বেল, কামরাঙা, জামরুল।

ঃ পাখির নাম?

ঃ কোকিল, খঞ্জনা, ময়না, শালিক, ডাহুক, বউ কথা কও, বক, লক্ষ্মী, পেঁচা।

ঃ গাছের নাম?

ঃ সুন্দরী, গজারী, সেগুন, বট, গামারী, কেউরা, তাল, তমাল, শিমুল----।

ঃ এত সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে। নদ-নদীতে, জনপথে, পাখ-পাখালী, ফুলফল, গাছ গাছালিতে, তবুও তোমরা বিপণন দ্রব্য আর বিপনি কেন্দ্রের বাংলা নাম খুঁজিয়া পাইলা না। ওরে শত ধিক তোমাদের---।

ঃ আপনি কি অভিশাপ দিতেছেন?

www.pathagar.com

ঃ আমাকে অভিশাপ দিতে হইবে না। তোমরাই আপনা আপনি অভিশাপগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। মাটির শিকড়ের সহিত যে জাতির চিন্তাচেতনা, নাম-নামকরণ জড়িত থাকিবে না তাহাদিগকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গ্রাস করিয়া ফেলিবে। বিদেশীরা যতই উন্নত হোক জনপথ, উৎপাদিত সামগ্রী, বিপণন কেন্দ্রের নাম তাহারা তাহাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে রাখে। তাহারা নাম রাখে নিজের, নিজ বংশের।

আমরা যখন দোকানে পানির পরিবর্তে 'মিনারেল ওয়াটার' কিনিয়া খাইতেছিলাম তখন বেশ কয়েকটি মহিলা পুরুষ ও ছেলে মেয়ে দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা কিসের জন্য আসিল বুঝিতে পারিলাম না। ছেলে মেয়েগুলি কহিতেছে, 'মাম্মি' 'ডেডি' 'আংকেল' 'আন্টি'।

বরকতের বাবা হতবাক হইয়া গেলেন। কহিলেন, ওহে বৎস, ইহারা কি বাঙালী সন্তান? এই সন্তানগণ কি মা, বাবা, মাসি, পিসি, খালা, ফুফু, নানা, নানি, মামা, কাকা, চাচা, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছে? তাহারা কি ভুলিয়া যাইতেছে

মা কথাটি ছোট্ট অতি

তাহার চেয়ে নাইরে

মধুর এ ত্রিভুবনে নাইরে ----

আর একটু হাঁটিয়া আসিলাম ----

ঃ ওই ত বাংলা নাম, কি সুন্দর! কি সুন্দর! 'সোনারগাঁও'। চল না বাবা ওইখানে একটু বেড়াইয়া আসি .... সুন্দর দালানে একটি বাংলা নাম পাইলাম।

ঃ না, ওইখানে আমাদের যাইতে দিবে না। ওইখানে যারা যায় সব বড়লোক, বিদেশী আর বঙ্গবিদেশী।

সোনারগাঁও দেখিলাম না। কতদূর যাইতে দেখা গেল হাজার হাজার তরুণ নাচিতেছে, গাহিতেছে। বরকতের বাবা মনে করিলেন, ওটা একুশের একটি বড় অনুষ্ঠান .....। তিনি ওইখানে যাইতে ইচ্ছা পোষণ করিলেন।

ঃ উহা একুশের অনুষ্ঠান নহে ।

ঃ উহা কি?

ঃ উহা 'লাইফ' কনসার্ট ..... ওই যে ওখান হইতে শুনা যাইতেছে। Hell, Hell, Hell..... ।

কনসার্ট না দেখিয়া আমরা আগাইয়া গেলাম। একটি বিদ্যালয় হইতে কচিকণ্ঠে পড়ার মিষ্টি আওয়াজ কানে ভাসিয়া আসিল। বরকতের বাবা কহিল, ওই যে শিশুরা পড়িতেছে–

www.pathagar.com

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।

দুই একে দুই, দুই দু'গুণে চার

ঃ সুন্দর, সুন্দর, কি সুন্দর। আমরা আগাইয়া গেলাম। না আমরা ভুল শুনিয়াছি ওই স্কুলের শিশুরা পড়িতেছে-

হামটি ডামটি, সেট অন এ ওয়াল

হামটি ডামটি হেড এ গ্রেট ফল

তাহারা পড়িতেছে–

টু টুজা ফোর

টু থ্রি জা সিক্স .....

ঃ ওইখানে কি লিখা আছে পড়ত বাবা।

ঃ স্টার লিটল স্কুল/ এয়ারকন্ডিশন্ড।

ঃ বাঙালী শিশুরা বাংলা পড়িবে না, এ শিশুরা কি বড়ই দুর্বল। কাদামাটি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার আবহাওয়ায় এরা বড় না হইলে ইহারা কি দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিবে .....? এদেশের সকল সন্তান কি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্কুলে পড়ে?

ঃ না। ১৪ কোটির মধ্যে ২২ হাজার মানুষের সন্তানেই পড়ে। এরাই সব ভোগ করে। অন্ন আনন্দ শিক্ষা স্বাস্থ্য নিদান নিবাস, সব সব ইহাদের জন্য .....।

রাস্তার অপর পাশ দিয়া ভাসিয়া আসিতে লাগিলঃ

দেখা হ্যায় পহেলেবার

সাজনকো আঁখমে পেয়ার ..... ।

এইবার রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম। রাস্তার দুই পাশে বস্তির পর বস্তি।

ঃ এইগুলি কি?

ঃ বস্তি।

ঃ মানুষ থাকে এখানে?

ঃ মানুষ নয়, ইহারা বাঙালীও ----। বস্তির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। নোংরা, দুর্গন্ধে ভরা বস্তি।

ঃ হে বৎস, আমাদের কি ভ্রম হইতেছে?

ঃ না, ইহারা বাঙালী এবং মানুষ, এইখানে তাহারা বাস করে।

ঃ ইহারা কি পড়িতে জানে?

ঃ না--। ইহারা বাঙলা অক্ষর চিনে না ---। চিনিবে না ----।

www.pathagar.com

ঃ তোমরা আজ এত বৎসর পরও এই দুঃখিনী বর্ণমালাকে বাঙালীর হৃদয়ে পৌছাইতে পার নাই?

ঃ না।

যে বর্ণমালার জন্য আমার বরকত শহীদ হইয়াছিল, আমি তাহাকে কি জওয়াব দিব? বাঙালী পথের ধারে বস্তিতে থাকিবে, নোংরা দুর্গন্ধে রোগ জীবানুতে পশুর মত জীবন যাপন করিবে ---। এই দৃশ্য আমি আমার বরকতকে কি বলিয়া বর্ণনা করিব? হে বৎস, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।

বরকতের বাবা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বুকের উপর নিজে কিল মারিতে লাগিলেন। শ্বেত শুভ্র কাপড় ছিঁড়িয়া মনের উষ্মা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কহিলাম, 'হে বাবা, আপনি ১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারীতে আপনার সন্তান বরকতের জন্য কাঁদেন নাই ---। বরকত আমাদের চেতনার নাম, অহংকারের নাম। এজন্য কেন কাঁদিবেন? আপনি বরকতের পিতা, গর্বিত পিতা।

ইহা শ্রবণে বরকতের পিতা আরো রাগান্বিত হইলেনঃ তোমরা ভ্রষ্ট, কপট, মিথ্যাচারী। তোমরা আমার সন্তানের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছ--। বরকতেরা রক্ত দিয়াছিল পাঁচ তলা, আর গাছতলায় মানুষ থাকিবার জন্য নহে। সকল মানুষের সমান অধিকার রচিত হইবে, সকলে খাটিয়া খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে– এজন্য তাহারা রক্ত দিয়াছিল। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার–শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্ন আনন্দ নিদান নিবাসের অধিকার যত দিন দিতে না পারিবা ততদিন তোমরা সংগ্রাম যদি ক্ষান্ত কর তবে তোমরা বিশ্বাসঘাতক।

ঃ চলুন, বাঙলা একাডেমীতে--।

ঃ না, না, আর আমি আগাইব না। আমি বুঝিতে পারিয়াছি ভণ্ডে এই দেশ ভরিয়া গিয়াছে --।

এমন সময় কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হইল। ধর ধর রব উঠিল--।

ঃ বোমা, বোমা কেন বাবা?

ঃ হাইজাকার, হাইজাকার বাবা।

আরো কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হইল। বোমার ধোঁয়ায় সমস্ত রাস্তা অন্ধকার হইয়া পড়িল। বোমার আওয়াজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরকতের বাবা এই দৃশ্য দেখিয়া কহিলেন, আমি যাই বাবা, আমি যাই।

আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পাড়ার ছেলেরা গলা ফাটাইয়া গাহিয়া উঠিলঃ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি!

❐ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com